নাউম ইওরিশ

মৌমাছি ও মানুষ



নাউম ইওরিশ

মৌমাছি ও মানুষ

মৌমাছি ও মানুষ

Н. П. Иойриш

ПЧЕЛЫ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Издательство «Урожай» Киев

নাউম ইওরিশ

মৌমাছি ও মানুষ

মির প্রকাশন

মস্কো

অনুবাদ: মাহবুবুল হক

Ioyrish. N.

Bees and people

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-03-000314-2

সূচীপত্র

ভূমিকা

নোংরা আর বিষ দিয়ে নয়, আমরা বরং মৌচাক ভরে তুলি মধু দিয়ে, মোম দিয়ে। আর এভাবে মানব জাতিকে আমরা দেই মহত্তম দু'টি জিনিস — মিস্টতা আর আলো।

— জোনাথান সুইফ্‌ট। বইয়ের লড়াই

আমি যে এই বইটি লিখেছি তার কারণ, আমি চেয়েছি মৌমাছি নিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হয়েছে এবং মানুষের জীবনে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে আমার মতামত অন্যদের জানাতে। সাথে সাথে মৌমাছিরা যে বিপুল সুফল বয়ে আনে তা দেখানোও আমার উদ্দেশ্য। আমি আশাকরি, এর ফলে মানবজাতির এই সব ছোট্ট পাখাওয়ালা বন্ধু ও সহকারীদের প্রতি শুধু যে মমতা জানানো হবে তা নয়, এতে আরও বেশি করে মৌজাত সামগ্রীও পাওয়া যাবে। ফলনও হবে বেশি। এবং এর ফলে চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধক কাজে মৌমাছির খামারের বা মৌমাছিশালার ব্যবহারও ব্যাপকতর হবে।

মৌখামারের মনমাতানো কাজের দারুণ নান্দনিক সুখ, মধু ইত্যাদির ভোগ-ব্যবহার, মৌ-বিষ, রাজসিক-জেলি, পরাগ, মৌ-আঠা, মোম এবং পুরুষ মৌমাছির শূককীটের নির্যাস ইত্যাদির যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি মানুষের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সহায়ক উপাদানগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র।

মৌমাছিদের বাদ দিয়ে যাঁদের জীবন ছিল অকল্পনীয় — এমন ক'জন বিশিষ্ট লোক সম্পর্কে আমার বইটিতে কিছু কথা বলেছি। মনোগ্রাহী এই ছোট্ট প্রাণীগুলোর মধ্যে রয়েছে যাদুকরী মায়ার টান। তাই যাঁরাই এদের সম্পর্কে জানতে আসেন তাঁরাই সেই মায়ার টানে বাঁধা পড়ে যান। মৌমাছিদের জন্য জীবনভর নিবিড় বন্ধুত্ব তখন মনে না জেগে পারে না। এই মৌমাছিপ্রীতি প্রায়ই ছেলে পুলে নাতিপুতি পরম্পরায়ও চলতে থাকে। এমন অনেক মৌমাছি-পালক পরিবার আছেন যাঁরা এই পেশা উত্তরাধিকার সূত্রে বাপ-দাদাদের কাছ থেকে পেয়েছেন।

ভৌগলিকেরা হয়ত গর্ব করতে পারেন, মানচিত্রে এখন আর অচিহ্নিত ফাঁকা জায়গা রাখতে হয় না। কিন্তু মৌমাছিতত্ত্ববিদ (apidologist) অর্থাৎ যাঁরা মৌমাছি-পরিবারের জীবন, আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন, এ ধরনের গর্ব এখনও তাঁরা করতে পারেন না। কারণ, আরও দীর্ঘ সময় ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ছাড়া এ সংক্রান্ত অজানা দিকগুলো উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। ফুলে ফুলে এবং মৌচাকের অন্ধকারে মৌমাছির যে ক্রিয়াকলাপ তার রহস্য উন্মোচন করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সন্ধিৎসু মন নিয়ে চেষ্টা করে আসছে। কবি-লেখকরা মৌমাছির বন্দনা করে এসেছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালেই কেবল কৃষিতত্ত্ববিদ, উদ্যানতত্ত্ববিদ এবং মৌমাছিপালকরা দেখিয়েছেন যে, ফুল এবং মৌমাছির কোনটিই একে অন্যকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না; তাদের অস্তিত্ব পরস্পর সম্পৃক্ত।

মৌমাছিদের এখন আর শুধু মধু ইত্যাদি সামগ্রীর উৎপাদক হিসেবে দেখা হয় না। ফল-ফুলের বাগান ও তৃণভূমিতে পাখাওয়ালা পরাগ সংযোগী হিসেবেও এরা গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, মৌমাছিদের দিয়ে যে পরিমাণ মধু ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায় তার চেয়ে আট দশগুণ লাভজনক হচ্ছে এদের পরাগ-যোগের কাজ।

উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম সজ্জিত মৌখামারকে আজকাল শুধু মধু-মোম ইত্যাদি তৈরীর জীবন্ত কারখানা এবং পরাগযোগের অভিনব স্থান হিসেবে দেখা হয় না, বরং চমৎকার প্রাকৃতিক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবেও তা বিবেচিত হয়ে থাকে। স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার অতিরেক রোগে যাঁরা কষ্ট পান তাঁদের এবং অবসরভোগী বৃদ্ধ, অক্ষম লোক ও যুদ্ধাহত পঙ্গুদের জন্য মৌমাছিশালার কাজ শ্রেষ্ঠতম পেশাগত চিকিৎসার মত। কারণ কাজটা করা হয় বছরের সেরা মাসগুলোয়, খোলা জায়গায়, সেখানে তাঁদের ঘিরে থাকে উদ্ভাসিত বনানীর গালিচা, সুরভিত গাছ, যেখানে তাঁরা ফুসফুস ভরে নিতে পারেন ফুল, মধু, মোম এবং মৌ-আঠার গন্ধমাখা নির্মল তাজা বাতাস।

মৌ-খামারের এই অবাক করা কাজ মৌমাছি পালকের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন হিতকর (বিশেষ করে তাঁর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্য) তেমনি তাদের অনেকের অসুস্থতা ও রোগযাতনা ভুলিয়ে দিতেও তা সাহায্য করে।

আজকাল পরাগ সংযোগের জন্য মৌমাছি বসতি ছাড়া বড় ধরনের কোন কৃষি উদ্যোগ বা খামার যেমন হয় না, স্বাস্থ্যদায়ক মৌমাছিশালা না রেখে কোন স্বাস্থ্যোদ্ধার ভবনও তেমনি হতে পারে না। স্কুলগুলোতেও দেখা যায় অন্ততঃ কটা মৌচাক, জীববিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য যা চাইই চাই। কারণ, প্রকৃতি নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ওগুলো একেবারে জীবন্ত ল্যাবরেটরি। আশাকরি, এ দিক থেকে আমার বইটি মৌমাছি প্রেমিকদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং তাদের কাজকর্মের ভেতর দিয়ে বাড়বে মধু ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের কাজ। আনন্দ ও স্বাস্থ্যময় কাজ যেমন তারা পাবেন তেমনি বাড়বে ফল ও বীজের ফসল।

কাজের উপযোগী শারীরিক সামর্থ্য ও ভালো স্বাস্থ্যের জন্য এবং বৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকা ও বেশীদিন বাঁচার জন্য সঠিক ও যুক্তিযুক্ত খাবারের গুরুত্ব সবারই জানা আছে। ব্রাজিলের বিখ্যাত পুষ্টি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জ. দ. কাস্ত্রো মনে করেন যে, জীবাণুর হাত থেকে দেহাবয়বকে রক্ষার ক্ষেত্রে খাদ্যই হচ্ছে সবচেয়ে ফলপ্রসূ এন্টিবায়োটিক। তাঁর হিসাব মতে, বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিতভাবে অনাহারে থেকে যাচ্ছে আর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যাপ্ত আহার পাচ্ছেনা। তাই মৌমাছির যুক্তিসংগত ও ব্যাপক চাষ যে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপুল অবদান রাখতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভিটামিনযুক্ত ভেষজ মধু সংগ্রহের ত্বরিত পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাব এই পরিপ্রেক্ষিতেই এসেছে। মানুষের উদ্ভাবিত এই কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে যে কোন প্রজাতির মৌমাছিদের দিয়ে ও যে-কোন ধরনের মৌচাক থেকে বছরের যে-কোন সময়ে মধু সংগ্রহ করা চলে। এই পদ্ধতি মৌমাছি পালকদেরকে মৌমাছি পরিবারের সত্যিকারের নেতা ও গোষ্ঠীপ্রধান হবার সুযোগ এনে দিয়েছে।

মধু দিয়ে নানান খাবার ও তরল পানীয় তৈরীর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে একটি বিশেষ অধ্যায়ে।

এ বইটি মৌমাছিপালন বিষয়ে কোন পাঠ্যবই নয় কিংবা ভেষজ গবেষণা গ্রন্থ বা ঔষধিশালাও একে বলা যাবে না। বরং বইটি মৌমাছিদের নিয়ে কাজ করার আনন্দ এবং কীভাবে মৌখামার হয়ে উঠতে পারে প্রাকৃতিক আরোগ্য নিকেতন বা আমাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের সত্যিকারের উৎস, সে বিষয়ে সাদামাটা দু-চার কথা।

প্রথম অধ্যায়

যুগে যুগে মৌমাছি পালন

জোটবদ্ধ বসতিতে জটিল নিয়মকানুনে
চালিত হয়ে
অন্ধকার মৌচাকে তাদের উৎপাদন কাজ ক'রে
ছোট ছোট অদ্ভুত এই পতঙ্গগুলো সেই
সুপ্রাচীন কালেও
মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।
— মরিস মেটারলিঙ্ক

উদ্ভিদবিদরা দুই লক্ষেরও বেশী উচ্চতর উদ্ভিদ এবং এক লক্ষ বিশ হাজারেরও বেশী নিম্নতর উদ্ভিদ প্রজাতি শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। পক্ষীবিদরা দশ হাজার প্রজাতির পাখী সম্পর্কে জানেন আর প্রাণিবিদদের জানা আছে ছয় হাজার প্রজাতির স্তন্যপায়ীর কথা। কিন্তু পতঙ্গবিদরা বিভিন্ন প্রজাতির দশলক্ষেরও বেশী কীট-পতঙ্গের নাম উল্লেখ করেছেন। পতঙ্গজীবনের দিক থেকে প্রকৃতি অসাধারণ বৈচিত্র্যময়।

তবে অধিকাংশ কীটপতঙ্গই মানুষের ক্ষতি করে থাকে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন ছিট পোকা (aphid), বড়সড় পঙ্গপাল, সব ধরনের গুবরে পোকা, প্রজাপতি ও মথের শুঁয়ো পোকা আর অন্যান্য কীট-পতঙ্গ — এ সবই কৃষির জন্য মারাত্মক অনিষ্টকর (যদি না সময়মত প্রতিরোধী ব্যবস্থা নিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়)। অনেক কীটপতঙ্গ সংক্রামক রোগের জীবাণু বয়ে বেড়ায় এবং মানুষের খুব ক্ষতি করে। যেমন, ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহী অ্যানোফিলিস মশা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় ভূভাগগুলোতে লক্ষ লক্ষ লোকের শরীরে এই মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটায়। খোঁয়াড়ে, আস্তাবলে শরৎকালে এক জাতের মাছি (stomoxys calcitrans) পশুদের মধ্যে পৃষ্ঠব্রন রোগের জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে আর এক জাতের

মাছি (Musca domestica) টাইফয়েড জ্বর, আমাশয় ইত্যাদি রোগ ছড়ায়।

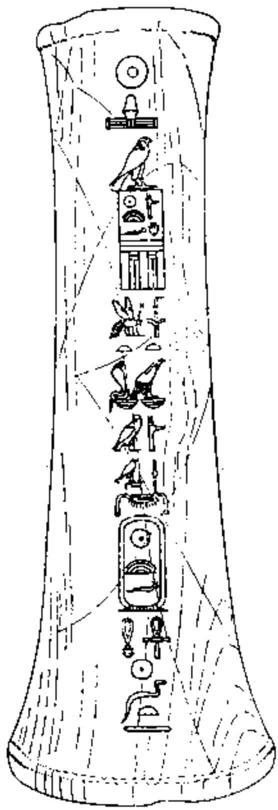
আবার অনেক কীটপতঙ্গ আছে যে-গুলো খুবই উপকারী। সবার সেরা হল মৌমাছি আর রেশমকীট। মৌমাছিরা যে মানুষের সত্যিকারের বন্ধু, তারা যে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনে, বিশেষ করে ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে আমাদের দারুণ ভাবে সাহায্য করে থাকে — তা সবারই জানা আছে। তৃতীয় গঠন পর্বে (tertiary period) অর্থাৎ আদিম মানুষের উদ্ভবের প্রায় পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মৌমাছির আবির্ভাব। প্রাচীন সংস্কৃতির যে-সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও টিকে আছে তাতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মধু অনুসন্ধানে আদিম মানুষ যে খুব তৎপর ছিল তার ইংগিত পাওয়া যায়। এ ধরনের সবচেয়ে প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে 'কুভ্যা দ্য লা আরানা' তে (ভ্যালেন্সিয়ার বাইকর্প এর কাছে) পাওয়া লাল রঙে আঁকা মধু সংগ্রহকারীদের একটি প্রস্তর চিত্র (চিত্র ১ দেখুন)।



চিত্র — ১: বাইক্রপ-এর কুভ্যা দ্য লা আরানা-র প্রস্তরচিত্রে বুনো মধু সংগ্রাহকের প্রতিচিত্র। W. K.-এর তৈরী মূলের অনুলিপির অনুসরণে (ওবের মেইয়ার-এর অনুসরণে)

'দুজন লোক সম্ভবতঃ হোগলা ঘাসে পাকানো লম্বা দড়ি বেয়ে পাহাড়ের খাড়া ঢালের একটি প্রাকৃতিক কোটর বরাবর উঠছে। কোটর-টিকে শিল্পী স্পষ্টতঃ বুনো মৌমাছিদের আবাস হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে আমরা যা দেখছি তা হল, লোক দুজনের একজন কোটর থেকে মধুকোষটি বের করে তা নীচে নামিয়ে আনার জন্য থলে বা ঝুড়িতে রাখতে ব্যস্ত। বিক্ষুব্ধ কিছু মৌমাছি অনাহূত আগন্তুকের চারপাশে গুঞ্জন করে করে উড়ছে। আর সেগুলোকে আঁকা হয়েছে লোকটার আকৃতির অনুপাতে বেশ বড় করে'।[1]

অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর তুলনায় মৌমাছি সেকালের সব লোকের



চিত্র — ২: ফারাওয়ের উপাধি উৎকীর্ণ মিশরীয় ক্ষোদিত ফলক

কাছে অসাধারণ মর্যাদা পেয়েছে। তা ছাড়া বহু পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা, গল্প, কুসংস্কার ও রূপকথার জন্ম দিয়েছে মৌমাছি। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরে আনত মাথা ও স্বল্পোত্থিত ডানাযুক্ত মৌমাছি ছিল দক্ষিণ মিশরের প্রতীক। প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মেনেস দুটো রাজ্যকে একত্রিত করলে নিম্ন মিশরের প্রতীক মৌমাছির সাথে উত্তর মিশরের প্রতীক জলতৃণ ফারাওয়ের উপাধির সাথে যুক্ত হয়। হেনরী ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর 'রাজপদ এবং দেবতারা' গ্রন্থে লিখেছেন, এই উপাধির আক্ষরিক অর্থ হল, 'জলতৃণ এবং মৌমাছির সেই তিনি', আর ব্যাখ্যা করলে তার অর্থ দাঁড়ায় 'উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের রাজা' (চিত্র ২ দেখুন)। ফারাওয়ের দুটো উপাধিফলকে মৌমাছির ছবি সুন্দরভাবে অংকিত হয়েছে। একটি হুরবেইত থেকে প্রাপ্ত চুনাপাথরের ফলকে (তৃতীয় রাজবংশ, খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৮০-২৬৮০) আর অন্যটি খায়েফ রে-র রাজপ্রাসাদের একটি স্থাপত্যের পরীক্ষামূলক খন্ডে (চতুর্থ রাজ বংশ)।

ফারাও-এর প্রতি নিজেদের আনুগত্য দেখাতে প্রতীক হিসেবে মিশরীয়রা আবেদনপত্রে মৌমাছির একটি ছবি এঁকে দিত। অন্ধকারের দেবতা অমঙ্গলময় হুহ্ জনগণের যে অনিষ্ট ঘটায় তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে মৌমাছিকে তারা মনে করত তাদের বিশ্বস্ত সহায়। তা ছাড়া মৌমাছি ছিল তাদের কাছে নিঃস্বার্থতা ও নির্ভয়তার প্রতীক, বিপদ ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করার শক্তি। তাকে তারা দেখত পবিত্রতার আদর্শ ও শৃঙ্খলার রক্ষক হিসেবে।

প্রাচীন মিশরীয়রা ইতিমধ্যেই যাযাবর ধরনের মৌমাছি পালনে ব্যাপকভাবে যেমন অভ্যস্ত হয়েছিল তেমনি সফলতাও অর্জন করেছিল। মিশরের উত্তরাঞ্চলে ছয় সপ্তাহ আগে গাছ-গাছালিতে ফুল ফুটত বলে দক্ষিণ মিশর থেকে তারা নৌকায় করে নীল নদের উজান বেয়ে সে অঞ্চলে মৌমাছি নিয়ে যেত। পরে আবার তারা মৌমাছিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসত, সাথে থাকত প্রচুর মধুর ফসল। মৌমাছিদের আনা-নেওয়া করা হত পোড়ামাটির পাত্র দিয়ে তৈরী সহজে বহনযোগ্য মৌচাকের মধ্যে ঢুকিয়ে নুড়িপাথর দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে। এমনকি একপাশে মৌমাছি ঢোকার পথওয়ালা কঞ্চিবোনা মাটিলেপা মৌচাকও তারা সেই আমলে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল।

এখনও অটুট বৈষয়িক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন থেকে আমরা জানি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষে ও তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে মেসোপটেমিয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। প্রাচীন লিপিকরদের রচনা থেকে দেখা যায়, ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে বিপুলভাবে মৌমাছি পালন করা হত।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রথম সহস্রাব্দে আসিরিয়া মধু ও জলপাইয়ের দেশ বলে পরিচিত ছিল। প্রথম সারগন-এর শাসনকালে (খ্রী. পূ. নবম শতাব্দীতে) এবং তাঁর মৃত্যুর পর মৃতের শরীরে মোমের প্রলেপ মাখান হত এবং তা ডুবিয়ে রাখা হত মধুতে। মৌমাছি প্রতিপালনে আসিরীয়দের ছিল অসাধারণ দক্ষতা। মৌমাছির ঝাঁককে বশে আনার মত এমন 'গোপন ধ্বনি' তাদের জানা ছিল যা দিয়ে তারা ইচ্ছামত মৌমাছির ঝাঁককে মৌচাক থেকে বের করতে কিংবা ফের তাতে ফিরিয়ে নিতে পারতো। (রোমক কবি ভার্জিল নিজেও ছিলেন মৌমাছি পালক। তিনি লিখেছেন, ঝাঁঝ-করতাল বাজিয়ে মৌমাছির ঝাঁককে মৌচাকে ফিরিয়ে আনা যায়। এটা যে সত্য তার প্রমাণ রয়েছে মৌমাছি পালন নিয়ে ইদানীং কালের লেখায়। তাতে এরকম উল্লেখ আছে যে, মৌচাক থেকে ৬০ থেকে ১২০ সেণ্টিমিটার দূরে অবস্থিত কোন কম্পনযন্ত্র থাকলে কিংবা কোন লাউড স্পীকার থেকে ৬০০ হার্টস কম্পাংকের শব্দ হলে মৌমাছিরা মৌচাকের উপর অনড় হয়ে থাকে। তবে মৌমাছি পালকের পক্ষে এই ধ্বনি সহ্য করা খুবই কঠিন।)

প্রাচীন ভারতে মৌমাছিকে দেবতাদের পবিত্র সহচর বলে গণ্য করা হত বলে পুরাণে মৌমাছির মর্যাদার আসন রয়েছে। সূর্যের অবতার

এবং জগতের স্রষ্টা হিসেবে পরিচিত বিষ্ণুকে কখনো কখনো পদ্মফুলের পেয়ালার উপর বসা ছোট্ট মৌমাছি হিসেবে কখনো বা তাঁকে মাথার উপর উড়ন্ত একটি নীল মৌমাছি সমেত চিত্রিত করা হয়েছে। প্রেমের দেবতা কামদেবের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে তাঁকে ধনুক হাতে এবং মৌমাছির মালা দিয়ে তৈরী জ্যা সমেত দেখানো হয়। এর প্রতীকী অর্থ হল, তাঁর তীর একাধারে ভোগান্তি আর ভালবাসা দুইই বয়ে আনে। মৌমাছির উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপের নমুনা লোককবিতাতেও দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিকাশের প্রথম ধাপগুলিতেই দেখা যায়, প্রকৃতির দানকে যথাযথভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগানোর গুরুত্ব সে সময়েই সঠিকভাবে উপলব্ধি করা গিয়েছিল। প্রাচীন গ্রীকরা যাযাবর রীতিতে মৌমাছি পালনে অর্জন করেছিল চরম সাফল্য। যেখানেই গাছপালা সুধাময় ফুলে ফুলে ভরে উঠত সেখানেই তারা নৌকায় করে মৌচাক নিয়ে যেত। এফেসাসে আর্তেমিস-এর বিখ্যাত দেবগৃহের মধ্যে তাঁর যে শিলামূর্তি ছিল তা অলঙ্কৃত করা হয়েছিল ফলবান তরুশাখা দিয়ে, যেগুলোর উপরে উপবিষ্ট ছিল মৌমাছি। ঐ মন্দিরের ধর্মযাজিকাদের বলা হত মেলিসসি (অর্থাৎ 'মৌমাছি')। আর এই সমৃদ্ধ নগরীটির পরিচয়-প্রতীকেও অঙ্কিত ছিল মৌমাছির ছবি। (প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায়, গ্রীস ও রোমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে আইসকুলাপিউস (Aesculapius) ও ব্যাকাস (Bacchus)-এর উদ্দেশে বলিদানের সময় প্রাণিদেহ ও ফলমূলের উপর মধু ঢালা হত।)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দার্শনিক, লেখক ও পণ্ডিতবর্গ মৌমাছি সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, রূপকথা আর শত শত বছরের পুরনো বিবরণের দলিল দস্তাবেজ ঘেটে জানা যায়, ইউরোপের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে সুদূর অতীতেই মৌমাছি পালন ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছিল। ইতিহাস রচনার জনক হেরোদোতাস (খ্রী. পূ. প্রায় পঞ্চম শতক) উল্লেখ করেছেন যে, সিথীয়রা (seythians) মধু ও মোমের বাণিজ্য করত ব্যাপকভাবে। দুই হাজার বছরেরও আগে উরার্তুর জনগণ (বর্তমান আর্মেনীয়দের পূর্বপুরুষ) পলেস্তারা লাগানো টুকরির মৌচাকে মৌমাছি পালত। রাশিয়ায় মৌমাছি পালন যে কেমন উৎকর্ষলাভ

করেছিল এবং মধু ও মোম পেরিয়েস্লাভ্ল (Pereyaslavl)-এর মধ্য দিয়ে গ্রীসে রপ্তাণী হবার মত কীরকম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন রুশী বিবরণ লেখক নেস্তর (১০৫৬-১১১৪ খ্রী.)। হাজার বছর কি তারও আগে ৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ নৃপতি ওলেগ এবং বাইজানটাইন সম্রাটের মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে বিনিময় যোগ্য প্রধান প্রধান উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে ছিল মধু ও মোম। ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স ইগর বিকুরিকোভিচ ও বাইজানটিয়ামের সাথে অনুরূপ চুক্তি করেন। সংরক্ষিত নথিপত্রে দেখা যায়, দ্রেভলিয়ানিয়ে (জনৈক প্রাচীন রুশী) ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইগরকে হত্যার খেসারত দিতে গিয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রী ওল্‌গাকে বিপুল পরিমাণ মধু, মোম ও ফার জরিমানা দিয়েছিল।

খ্রীষ্টোত্তর দশম শতকে বিখ্যাত আরব লেখক ও পর্যটক আবু আলী আহমেদ বিন ওমর ইব্‌ন্ দস্ত তাঁর 'খাজার, বুরিয়াৎ, বুলগার, ম্যাগিয়ার, স্লাভ ও রুশোখ সম্পর্কে তথ্য' নামক পাণ্ডুলিপিতে লেখেন: 'স্লাভদের জনপদ বৃক্ষাচ্ছাদিত সমতল ভূমি এবং তারা বনাঞ্চলে বসবাস করে। কাঠ দিয়ে তারা এক রকম কলস বানায় যার মধ্যে মৌমাছিরা থাকে এবং নিজেদের মধু মজুত রাখে।'

১০১৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানী ইয়ারোস্লাভ প্রকাশিত 'রুস্‌কায়া প্রাভ্‌দা' (রুশী অধিকার) নামে প্রাচীন রুশ আইনের সারসংকলনে (code) মৌমাছি পালক ও বনমধু সংগ্রহকারীদের অধিকার রক্ষামূলক বিধির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই। বুনো মৌমাছি বাসা বেঁধেছে এমন গাছ কেউ নষ্ট করলে কিংবা মধু আহরণের জন্য সেগুলো কেউ ধ্বংস করে দিলে তার বিরুদ্ধে মোটা জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা তাতে ছিল। 'লিথুনীয় সংবিধিতে' (Lithuanian Statute) এ রকম অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। সে কালে মধু ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। তা সুদে ধার দেওয়া চলত। মধু ধারের কাজকর্মকে বলা হত 'মধুর সুদী কারবার'।

ইতিহাসকার ন. ই. কোস্তোমারোভ্ বলেছেন, 'প্রাচীন নোভ্‌গোরোদে' রুটি আর মধু মূল্যমান প্রকাশ করত। এই মর্মে বিধান ছিল যে, অমুক কারণে এই এই পরিমাণ রুটি ও মধু প্রদান করতে হবে।

ভ. ম. ভিৎভিৎস্কি গেল শতকে ব্যবহারিক মৌমাছি পালন নিয়ে

লেখা তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, একাদশ শতকের প্রথম দিকে পশ্চিম ও দক্ষিণ রুশ (বর্তমানে ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)-এর কোন কোন এলাকা সফর করে পর্যটক 'হল' তাঁর বিবরণীতে (chronicle) লিখেছেন: 'এই দেশে আমি স্তেপ অঞ্চলে মৌমাছি, মৌমাছিপালক ও মৌমাছির উদ্যান দেখেছি অবিশ্বাস্য বিপুল সংখ্যায় আর অরণ্যানীতে দেখেছি মৌমাছির অসংখ্য বাসা। লক্ষ্য করেছি, মধু ও মোমের অসাধারণ প্রাচুর্য রয়েছে এখানে।'

মঙ্গোলীয় 'সোনালী যাযাবর' (Golden Horde) দের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ইতিহাসবেত্তা ব. গ্রেকভ ও আ. ইয়াকুবভ্স্কি দশম শতকের শেষার্ধের আরব ভৌগলিক মাক্‌সিদির অনুসরণে 'বুলগারিয়া থেকে খোরেজমে' ভল্গা নদী দিয়ে ভাটিতে পাঠানো পণ্য দ্রব্যের একটি তালিকা দিয়েছেন। তাতে মধু একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

রোমে, পোপ সপ্তম ক্লিমান্‌তের কাছে 'মস্কোর বিষয়াবলী সম্পর্কে' লিখিত প্রতিবেদনে ১৫২৩-২৪ সালে আলবার্তো ক্যাম্পে্নজ্‌ রাশিয়ায় মধু ও মোমের উল্লেখযোগ্য ফলনের কথা পোপকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, অধিবাসীরা বসত বাড়ির আশে পাশেই 'ঘরোয়া' মৌমাছি পোষে এবং তা বংশানুক্রমে চলতে থাকে।

১৫২৫ সালে ইতালীয় ইতিহাসবেত্তা পাউলাস জোভিয়াস (বা পাওলো জোভো) (১৪৮৩-১৫৫২) তাঁর 'মস্কোর দৌত্য সম্পর্কিত বই'তে লিখেছেন, 'মস্কোভা ভূমির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফসল হচ্ছে মধু ও মোম। কারণ গোটা দেশটাই উর্বর মৌমাছিতে ভরা, চমৎকার মধু জোগায় ওরা... বনের মধ্যে কিংবা ঘন ঝোপ আর তরুবীথিতে — সর্বত্রই দেখা যায় চমৎকার সব মৌমাছির ঝাঁক গাছের ডালপালায় ঝুলে আছে। তামার পাত্র বাজিয়ে তাদেরকে প্রলুব্ধ করার দরকারই পড়ে না। লোকবসতি তেমন বেশি নয় বলে বড়ো ধরনের তরুবীথির সব কটি গাছ ভাল করে খুঁজে দেখা হয় না। ফলের গাছের আড়াল-আবডালে অসংখ্য মৌচাক লুকোনো থেকে যায় আর মৌমাছিদের আহরণ করা পুরোনো মধু পড়ে থাকে অঢেল পরিমাণে, কখনো কখনো গাছের প্রকান্ড গোড়ায় মধুর বিশাল হ্রদ তাদের চোখে পড়ে'।[2]

অ্যাডাম অলিরিয়াস (ওলশাগের) (১৬৪৩) লিখেছেন, 'বনাঞ্চলের সর্বত্র মধু ও মোম এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, রুশীরা শুধু

যে মধু-সুরা তৈরীর কাজে প্রথমটি এবং ঘরোয়া ও ধর্মীয় কাজে মোমবাতি হিসেবে দ্বিতীয়টি (ধর্মীয় কাজে এই ব্যবহার খুবই উল্লেখযোগ্য) ব্যবহার করে তা নয়, বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত অন্য দেশে বিক্রিও করে থাকে।'

সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ায় (Rus) রাজা কিংবা গ্র্যান্ড ডিউক প্রত্যেক বছর হেমন্তের শুরুতে সামন্ত প্রজাদের কাছ থেকে (মধু, মোম ও ফার) আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হতেন। সামন্ততান্ত্রিক রাশিয়ায় কৃষকরা তাদের প্রভুকে খাজনা পরিশোধ করত দ্রব্যে তথা সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু — মধুতে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে রাশিয়ায় আদিম মৌমাছিপালন (বা 'বোর্তনিচেস্‌তভো' — বুনো মৌমাছিদের তাড়িয়ে দিয়ে বনাঞ্চলে মধু সংগ্রহ) সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। বুনো মধু সংগ্রহকারীরা তখন বিপুল পরিমাণ মধু সংগ্রহ করত। কিয়েভ জলাভূমি অঞ্চলের বনানীময় লেবেদিনস্কি এস্টেটগুলির একটি থেকেই ২৪০০০ পুদ (প্রায় ৭২০০০ গ্যালন) বুনোমধু সংগ্রহ করা হত। সে সময়ে এ রকম এস্টেটের সংখ্যা ছিল প্রায় হাজার খানেক। তাই সংগৃহীত মধুর মোট পরিমাণও ছিল প্রায় ৭ থেকে ২০ লক্ষ গ্যালন। ভিৎভিৎস্কি ১৮৬১ সালে হিসাব করে দেখেছেন যে, '...গৃহপালিত মৌমাছির কাছ থেকে পাওয়া লাভের কথা নাই বা বললাম, শুধুমাত্র বনাঞ্চল থেকে যে পরিমাণ মধু ও মোম আমাদের পিতা, পিতামহরা পেতেন তার মূল্য ছিল একশ কোটি অ্যাসিগনাত্‌সিয়া (assignat — আঠারো শতকে রাশিয়ায় প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা)।' সুতরাং রাশিয়াকে যে 'মধু স্রোতা' (mellifluous) বলা হত তা মোটেও বিস্ময়কর নয়।

প্রাচীন রাশিয়ায় অনেক গ্রাম ও ছোট ছোট অনেক পল্লীর সমস্ত অধিবাসীরাই বুনো মধু সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকত। তবে ক্রমে ক্রমে এই পেশার ভূমিকা ও গুরুত্ব কমতে থাকে। এর অন্যতম কারণ হল, কাজটা ছিল জটিল ও দক্ষতানির্ভর; এতে একদিকে মৌমাছিদের জন্য গাছে গাছে কোটর তৈরী করতে হত অন্যদিকে বনের সেই মহাপেটুক তথা ভালুকের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে হত। তবে আরণ্যাঞ্চলে মৌমাছি পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার কারণ প্রধানতঃ ব্যাপকভাবে গাছ কাটায় রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের বনাঞ্চল উজাড়

হয়ে যাওয়া। এর ফলে মৌমাছিরা তাদের খাদ্যের সমৃদ্ধ উৎস হারায়। চোলাইকরণ ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও পরবর্তীকালে চিনি শিল্পের বিকাশের ফলেও বনাঞ্চলে মৌমাছি পালনের গুরুত্ব শোচণীয়ভাবে কমে যায়।

পশ্চিম ইউরোপেও মৌমাছি পালনের গুরুত্ব কমে যেতে থাকে। নতুন বিশ্বের আবিষ্কার এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার নতুন সমুদ্রপথের সন্ধান প্রাপ্তির ফলে নতুন নতুন বাণিজ্যপথ খুলে যায়। বিশ্বের অপর অংশ থেকে ইউরোপ মধু আমদানী করতে শুরু করে। শুধুমাত্র আমেরিকাই বছরে পাঁচকোটি কিলোগ্রাম মধু রপ্তানী করে। তা ছাড়া বিপুল পরিমাণ চিনি আমদানীর ফলে মধু জোর প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হয়। ফলে কৃষকরা লেগে যায় অন্যান্য ফসলের (আলু ও গাজর) আবাদে। আর এ সব চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি জমির জন্য তারা হাত বাড়াতে থাকে সুধাময় উদ্ভিদে ভরা চারণভূমিগুলোর উপর।

নতুন পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় মৌমাছিপালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন প্রতিভাবান ইউক্রেনীয় মৌমাছিপালক প. ই. প্রোকোপোভিচ (১৭৭৫—১৮৫০)। তিনিই প্রথম গুটানো ফ্রেমের মৌচাক উদ্ভাবন করেন।' এর ফলে মৌমাছিপালনের কলাকৌশলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রোকোপোভিচ উদ্ভাবিত মৌচাকের সাহায্যে সর্বাধিক মধু আহরণের ক্ষমতা সম্পন্ন মৌমাছি পরিবারকে মৌচাক থেকে 'ধোঁয়ার সাহায্যে তাড়ানো' সম্ভব হয় এবং এভাবে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে মৌমাছির ঝাঁক নিধন পদ্ধতির অবসান ঘটে।

মৌমাছি পালনে বিরাট অগ্রগতি সত্ত্বেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রাশিয়ায় কৃষির এই শাখাটির বিকাশে কোন অবদান রাখেনি। ১৯১০ সালে দেশে প্রায় ৫৭,১৬,০০০ মৌমাছি-বসতি ছিল (এর এক পঞ্চমাংশ পালিত হচ্ছিল কাঠামো-মৌচাকে) এবং মধু রপ্তানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ গ্যালন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের সময়ে মৌমাছি পালন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম মাসেই সোভিয়েত সরকার মৌচাষকে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালের শুরুতে যখন নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র অভ্যন্তরীণ

শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময়েও লেনিন মৌমাছি পালনকে সুরক্ষিত করার জন্য ডিক্রী স্বাক্ষর করেন। মৌচাষের আইনগত দিক নিয়ে এবং মৌমাছি পালকদের স্বার্থরক্ষা কল্পে সেটিই ছিল প্রথম সোভিয়েত আইন। সোভিয়েত ইউনিয়নে মৌমাছি পালনের ইতিহাসে এর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

১৯৪০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে মৌবসতির সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে মহাসমরে (১৯৪১-৪৫) এই শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারের মালিকানাধীন হাজার হাজার মৌখামার ধ্বংস হয় এবং বিশ লক্ষেরও বেশি মৌমাছি বসতি একেবারে খতম হয়ে যায়। মহাসমরোত্তর কালে মৌচাষ পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং কৃষিতে তার অবদান অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৌমাছির জীবনবিজ্ঞান

Sic vis non vobis mellificatis apes. (তাই তোমরা, মৌমাছিরা, মধু তৈরী কর, তবে নিজেদের জন্যে নয়।)

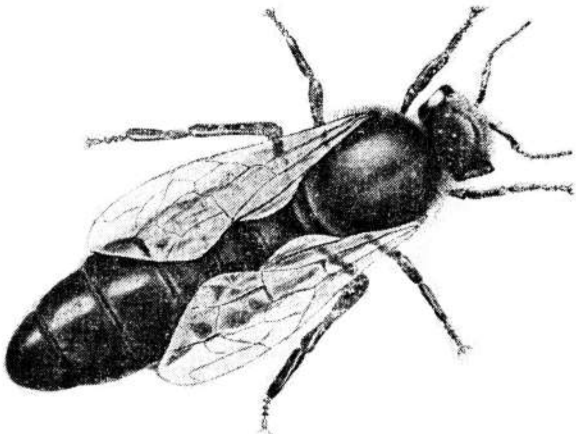
— ভার্জিল

১৭৫৮ সালে প্রখ্যাত সুইডিস উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ডাক্তার কার্ল লিননে মৌমাছির নাম দেন Apis mellifera (মধুবহ); তিন বছর পর তিনি এর নাম Apis mellifica (মধুকর) হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর দেওয়া প্রথম নামটি আজ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

মৌমাছি সামাজিক প্রাণী। এরা বড় বড় পরিবার বা বসতিবদ্ধ হয়ে মৌচাকে থাকে এক একটি মৌমাছি পরিবার। এই সব পরিবারের বৈশিষ্ট্যকে বলা হয়ে থাকে বহুরূপতা (polymorphism)। মৌমাছি পরিবারে তিন রকমের বা জাতের মৌমাছি থাকে: রাণী মৌমাছি (উর্বর স্ত্রী মৌমাছি), পুরুষ মৌমাছি ও কর্মী মৌমাছি (অনুর্বর স্ত্রী মৌমাছি)। এভাবে একটি মৌমাছি-বসতিতে একটি রাণী মৌমাছি, কয়েকশ' পুরুষ মৌমাছি ও হাজার হাজার কর্মী মৌমাছি (কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষাধিক) থাকে।

লেভ্ তল্‌স্তোয় মৌমাছির জীবন চর্চার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর উপন্যাসগুলোতে তিনি দক্ষতার সাথে মৌমাছি পালনের সৌন্দর্যকে রূপায়িত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে আমরা মৌবাগিচার নিম্নলিখিত যে বর্ণনা পাই তা যেমন বিজ্ঞানসম্মত তেমনি শিল্পসুষমামণ্ডিত।

'চাকের মুখগুলোর সামনে পাক দিয়ে গিজ্‌ গিজ্‌ করছে পুরুষ আর অন্যান্য মৌমাছির দল এবং তারই মধ্য থেকে কর্মীমৌমাছিরা বরাবর একই দিকে উড়ে যাচ্ছে বনের মধ্যেকার পুষ্পমঞ্জরিত লাইম গাছের দিকে — আহরণের খোঁজে, আবার একই পথে চাকে ফিরে



চিত্র — ৩: রাণী মৌমাছি

আসছে সঞ্চয় নিয়ে। এ-সব দেখে (লেভিন-এর) মাথা ঘুরে গেল। অবিরাম কানে আসতে লাগল অবিশ্রান্ত গুঞ্জন ধ্বনি — কাজে ব্যস্ত দ্রুত উড্ডীয়মান কর্মী মৌমাছির গুঞ্জনের ঐক্যতান মিলিয়ে যেতে না যেতেই কানে এল পুরুষ মৌমাছির অলস গুনগুনানি, তার পরপরই শোনা গেল দুশ্‌মনদের হাত থেকে আহরণ রক্ষায় প্রস্তুত, হুল ফোটাতে উদ্যত সান্ত্রী মৌমাছির সতর্ক গুঞ্জন।'

কর্মী মৌমাছির তুলনায় রাণী ২·৫ গুণ লম্বা এবং ওজনে ২·৮ গুণ ভারী (চিত্র ৩)। রাণীর কাজ হল প্রজনন; মৌচাকের খোপে খোপে প্রতিদিন সে ১০০০ থেকে ২০০০ কিংবা তারও বেশি নিষিক্ত ডিম পাড়ে। শূককীটগুলোকে দেওয়া খাবারের ধরন ও মোমের প্রকোষ্ঠগুলোর আকৃতির ভিত্তিতেই ডিমগুলো রাণী অথবা কর্মী মৌমাছি হিসেবে বেড়ে ওঠে। নিষিক্ত ডিম ছাড়াও রাণী মৌমাছি অনিষিক্ত ডিম পেড়ে থাকে। সেগুলি থেকে পুরুষ মৌমাছির জন্ম হয়। এভাবে অপুংজনি (parthenogenesis) বা শুক্রাণুদ্বারা অনিষিক্ত প্রজনন প্রক্রিয়া মৌমাছিদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে।

রাণী মৌমাছি মারা গেলে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন যদি নতুন রাণী জন্ম নেওয়ার মত শূককীট আর না থাকে কিংবা

কয়েকটি মাত্র শূককীট আর অসংখ্য পরিসেবিকা থাকে তবে কর্মী মৌমাছিরা মৌচাকের শূন্য খোপগুলোতে ডিম পাড়তে পারে (তা থেকে কেবল পুরুষ মৌমাছি জন্মায়)। এদেরকে 'পুংপ্রসবক মৌমাছি' বলা হয়। কর্মী মৌমাছি তার জীবন কালে ২৮টি ডিম পাড়তে সক্ষম। কোন মৌমাছিবসতিতে যদি রাণী মৌমাছি না থাকে তবে তা ধ্বংস হতে বাধ্য। কারণ, খাবার সংগ্রহে অপারগ কিংবা মৌচাকের অন্য কোন কাজ করতে অক্ষম পুরুষ মৌমাছিদের সংখ্যাই কেবল তাতে বেড়ে যায়।

গ্রীক ইতিহাসবেত্তা জেনোফোন রাণী মৌমাছির কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বলেছেন, রাণীর কাজ হল মৌচাকে থাকা আর কর্মী মৌমাছিরা যাতে অলস হয়ে বসে না থাকে তার দিকে নজর রাখা। রাণী তাদেরকে সুধা ও পরাগ জোগাড় করতে পাঠায় এবং কে কী আনল আর সেসব ঠিক ঠিক জায়গামত মজুত করা হল কি না তা তদারক করে। আবার দরকারমত মৌচাকে সংগৃহীত মজুত সামগ্রী মৌমাছিদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিলি-বন্টন করাও তার কাজ। মৌচাক শক্ত ও সুন্দরভাবে বানানো, বাচ্চাকাচ্চাদের ঠিকমত লালন-পালন করা ইত্যাদি দেখাশোনা করাও রাণীর কর্তব্য।

সতেরো শতকের ওলন্দাজ প্রকৃতিবিদ সোমারডাম রাণী মৌমাছির মেয়েলি স্বভাব ও পুরুষ মৌমাছির পুরুষ স্বভাবের প্রকৃতি পুরোপুরি নির্ধারণ করতে সক্ষম হন (ব্যারণ অগাস্ট ফন বারলেপ্‌শ্‌ কর্তৃক ১৮৭৬ সালে উল্লিখিত তথ্য অনুসারে)। তাঁর এই পর্যবেক্ষণকে পরবর্তীকালে অন্যান্য গবেষকরাও সমর্থন করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, রাণী মৌমাছি হল পুরো বসতির মাতৃস্থানীয়া। খাবার সংগ্রহের জন্য কর্মী মৌমাছির অনুরূপ প্রয়োজনীয় অঙ্গ তার না থাকলেও তার ভূমিকার গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। জোহান ঝে'রজন মনে করেন যে, রাণী মৌমাছি হল গোটা মৌমাছি পরিবারের প্রাণকেন্দ্র এবং তার ডিম থেকে জাত সমস্ত মৌমাছিরই সে মা। আক্ষরিক অর্থেই পুরো কলোনীর মাতৃপদ যে রাণী মৌমাছির, তার উপর আ. ম, বুতলিয়েরভও জোর দিয়েছেন।

রাশিয়ায় মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে প. ই. প্রকোপোভিচ্-এর অবদান অনেক। তাঁর মন্তব্য, '...পুরুষ ও কর্মীমৌমাছির চেয়ে রাণী মৌমাছি দেখতে অনেক অনেক সুন্দর ও মনোরম। প্রথম দর্শনেই তার

কর্তৃত্বব্যঞ্জক জমকালো চেহারা আমাদের কৌতূহল জাগায়। তার শাবকদের মধ্যে সেই বয়োজ্যেষ্ঠ। তার সুসমঞ্জস দেহ, তার পায়ের রঙ, তার দৈর্ঘ্য, তার ছিমছাম গড়ন, তার ছোটখাট পাখা দুটো — এক কথায় পুরো চেহারাটাই তার অসাধারণ সুন্দর, মনোরম ও চমৎকার। নিজের চোখে না দেখলে বোঝা যায়না যে সব মিলিয়ে সে চেহারার কী আড়ম্বর, কী উৎকর্ষ, কী মনোহারিতা...'

মৌমাছি বসতিতে রাণীর মৃত্যু হলে মৌমাছিদের আচরণ দেখেই মৌমাছিপালক তা বুঝতে পারেন। তাদের গুঞ্জনে, মৌচাকের চারপাশে তাদের অনবরত ছোটাছুটিতে আতঙ্কের ভাব ফুটে ওঠে। রাণী ছাড়া মৌমাছিরা বাঁচতে পারে না বলে অগত্যা তাদেরকে তিন দিন-বয়সের এক বা একাধিক ডিম বেছে নিয়ে তা ফুটিয়ে নতুন রাণীর জন্য দিতে হয়। নলাকার সাদা মুক্তোর মত ডিম থেকে শূককীটের জন্ম হয় এবং তা সুপ্রশস্ত মোম-খোপে বড় হতে থাকে; রাণী হিসেবে নির্বাচিত এই শূককীটটিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত এক ধরনের জেলি (রাজসিক বা রয়াল জেলি) খাওয়ান হয় বলে তা রাণী মৌমাছি হিসেবে বেড়ে ওঠে। এভাবে ষোল দিনে মৌমাছিরা নতুন রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

পূর্ণতা প্রাপ্তির পর রাণী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছির সাথে মিলনের জন্য মৌচাক থেকে বের হয়ে শূন্যে উড্ডীন হয় এবং মিলন শেষে মৌচাকে ফিরে আসে। এরপর আর সে চাক ছেড়ে বের হয় না। রাণীর অনুচর জাতীয় কর্মী মৌমাছিরা তখন সযত্নে রাণীর পরিচর্যা করতে থাকে (চিত্র ৪)। এরা যে শুধু রাণীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার (তার দেহ পরিস্কার করা, শরীর আঁচড়ান, মৌচাক থেকে তার মল সরানো ইত্যাদি) কাজ করে তা নয়, উপরন্তু তাকে অতি পুষ্টিকর রাজসিক জেলিও খাওয়ায়। রাণীর মৃত্যুর পরও অনুচররা তাকে নিয়ে কীভাবে ব্যস্ত থাকে সে বিষয়ে অধ্যাপক রেমি শভে' বিস্তৃত বিবরণ রেখে গেছেন।

রাণী মৌমাছি গড়পড়তা পাঁচ-ছয় বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত বাঁচে। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে তার প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে (এ জন্যে দুই কি তিন বসন্তের পর মৌচাকের রাণী বদলে ফেলা যুক্তিযুক্ত)। রাণী মৌমাছির একটি হুল আছে যা একাধারে ডিম প্রসবের জন্য ডিম্বস্থালকের ও আত্মরক্ষার কাজ করে। রাণী সাধারণত



চিত্র — ৪: অনুচর পরিবেষ্টিত রাণী মৌমাছি

কখনো কাউকে হুল ফোটায় না, এমনকি মারাত্মক আঘাত পেলেও। তবে উড়ন্ত অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাণী মৌমাছিকে কখনো দেখতে পেলে সে রাগে হুল খাড়া করে থাকে।

অধ্যাপক র. শভেঁ এবং তাঁর সহকর্মীরা রাণী মৌমাছি নিয়ে যে সব মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয়, জীবিত রাণী মৌমাছি মৌচাকে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যা কর্মী মৌমাছির ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। তাঁরা প্রমাণ করেন, রাণী মৌমাছির শরীর দিয়ে যে মিহি গুড়ো পাওয়া যায় তা কর্মী মৌমাছির ডিম্বাশয়ের বিকাশকে সর্বদাই বাধা দেয়। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে, রাণী মৌমাছির দেহ থেকে নিংড়ানো অ্যালকোহল নির্যাসের মধ্যেও অনুরূপ উপাদান আছে।

বৃটিশ গবেষক ডাঃ সি. জি. বাট্‌লার এই প্রতিরোধী পদার্থটিকে অক্সিডেকানোইক (oxy-decanoic acid) এসিড বলে নির্ধারণ করেছেন। হরমোনের গুণযুক্ত এই পদার্থটি মৌচাকের ভেতরে সমস্ত মৌমাছির ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

রাণী মৌমাছি আরও অন্যান্য যে-সব বিচিত্র পন্হায় কর্মী মৌমাছিকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিও নির্ণিত হয়েছে। যেমন, রাণী চুম্বকের মত তাদেরকে নিজের কাছে টেনে রাখতে পারে; আরও রাণী কুঠুরি বানানো থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে; কর্মী ও পুরুষ মৌমাছির জন্য মোম-কুঠুরি তৈরীর উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রবল ভাবে উদ্দীপিত করতে পারে।

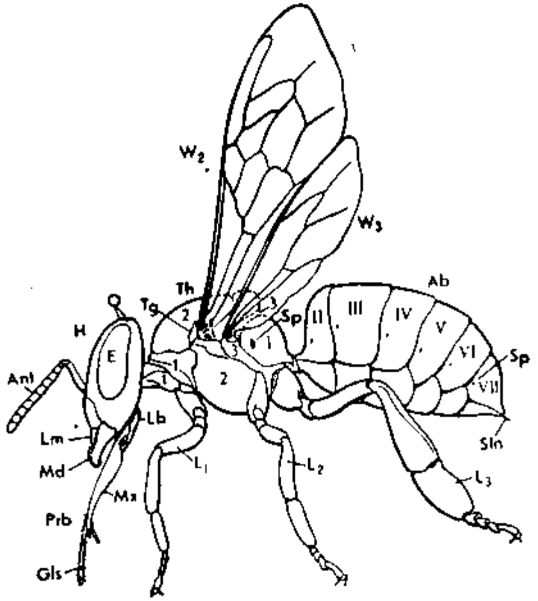
কখনো কখনো কোন কারণবশতঃ অনুচর কর্মীমৌমাছিরা রাণীর উপর অসন্তুষ্ট হলে অতর্কিতে তাকে চতুর্দিক থেকে দলা পাকিয়ে ঘিরে ধরে। রাগে উত্তেজনায় তারা তখন তাকে হুল বেধাতে না হয় তার পাখনা ও পা ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। প্রথম দিকে কেবল দু-একটা মাছি তাকে আক্রমণ করতে শুরু করলেও ক্রমে গণ্ডায় গণ্ডায় এবং শতে শতে মৌমাছি তাতে যোগ দেয়। আ. ই. রুটের বর্ণনা অনুযায়ী কখনো কখনো এমনও হয় যে, তৎক্ষণাৎ তারা রাণী মৌমাছিটিকে হুল বিঁধিয়ে মেরে ফেলে। মৌমাছির এই ধরনের বেশ কয়েকটি দল পরীক্ষা করে তিনি মৃত রাণীর শরীরে বিদ্ধহুল দেখতে পেয়েছেন। তবে প্রায়ই অনুচর মৌমাছিরা রাণীকে চারপাশ থেকে এত

বিপুল সংখ্যায় এবং এমনভাবে জাপটে ধরে যে, তাদের পক্ষে তলপেট ঘুরিয়ে হুল বেঁধানো ও বিষ ঢালা আদৌ সম্ভব হয় বলে মনে হয় না। আর হুলে যদি মৃত্যু নাও হয় তবু তাদের চাপ এত বেশি যে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই রাণী মারা পড়ে।

দৃশ্যত, মৌমাছিদের বিবেচনায় তাদের মোমের অট্টালিকায় রাণীর কোন অসদাচরণের কারণেই তার উপর এই হামলা। মৌচাক খুললেই দেখা যায় যে, মৌমাছিরা রাণীকে গোল হয়ে জাপটে ধরেছে। ছয় মাস কি পুরো বছর চমৎকার ভাবে রাণী তার দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তার সাথে এদের এ রকম বৈরী আচরণের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অচেনা কোন রাণীকে মৌমাছিরা ঘেরাও করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে অন্য বসতি থেকে আসার কারণেই তার ওপর এ আক্রমণ। কিন্তু নিজেদের মৌচাকের রাণীকে কেন যে মৌমাছিরা শেষ করে দেয় তা বোঝা দুষ্কর।

পুরুষ মৌমাছির জৈবিক কাজ হল রাণীর গর্ভাধান করা। রাণীর মতো পুরুষ মৌমাছিও নিজের খাবার নিজেরা সংগ্রহ করতে পারে না, তার জন্য সে পুরোপুরি কর্মী মৌমাছিদের উপর নির্ভরশীল। তার পায়ে ফুলের পরাগ রাখার মত কোন 'থলি' নেই। তার মুখও ফুল থেকে সুধা আহরণের উপযোগী নয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মে তারা বাঁচে পরিশ্রমী কর্মী মৌমাছির তৈরী মধু খেয়ে। এ ভাবে গ্রীষ্মের মাসগুলো শুধু কোন রকমে টিকে থাকে। তারপর শরৎ এলে তারা মৌচাক থেকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। আর তখন ক্ষুধা ও ঠান্ডায় তারা মারা পড়ে।

আ. ম. বুতলেরভ লিখেছেন, পুরুষ মৌমাছি কোন কাজই করে না, শুধু আমোদে মেতে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে খেলে বেড়ায়। দিনের মাঝামাঝি সময়ে সবচেয়ে ভালো সময়টাতে তরুণী রাণীর পেছনে তাড়া করে উড়ন্ত অবস্থায় তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াই তাদের কাজ। তবে, ১৯০১ সালে প্যারিসে মৌমাছি পালকদের এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি পুরুষ মৌমাছিদের পক্ষ নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে আ. ফ. জুবারেভ জানিয়েছেন — বক্তারা তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে, পুরুষ মৌমাছিরা একেবারে নিষ্কর্মা নয়। ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা জন্মানোর জন্য যে তাপমাত্রা বজায় রাখা দরকার মৌচাকে সেই তাপমাত্রা বজায় রাখতে



চিত্র — ৫ : গাত্ররোম অপসারিত অবস্থায় বামদিকের উপাঙ্গ সহ কর্মী মৌমাছির দেহ ব্যবচ্ছেদের রেখাচিত্র (স্নডগ্রাসের অনুসরণে)
1, 2, 3 — বক্ষ-খণ্ড; I, II, III, IV, V, VI, VII — উদর-খণ্ড; Gls — জিহ্বা; Prb — শুঁড়; Mx — উপরের চোয়াল; Md — নিচের চোয়াল; Lm — উপরের ঠোঁট; Lb — নিচের ঠোঁট; Ant — বোধশলাকা; E — পুঞ্জাক্ষি; H — মাথা; O — সরলাক্ষি; Tg — টেগুলা; Th — বক্ষ; W — পাখা; Ab — উদর; Sp — শ্বাসরন্ধ্র; Stn — হুল; L — পা

তারা সাহায্য করে। তাই পুরুষ মৌমাছিদের যথাসময়ে হননের ব্যাপারটা মৌমাছিদের উপর ছেড়ে দেওয়াই তারা সমীচিন বলে মনে করেন। পুরুষ মৌমাছিদের বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যুক্তি দিয়েও নানা লেখা অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছির পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে লাগে ২৪ দিন। তাদের যৌনাঙ্গ (শুক্রাণু থলি থেকে শুক্রবাহী নালিকাদ্বারা যুক্ত দুটি শুক্রাশয়, দুটি সহায়ক গ্রন্থি, একটি শুক্রক্ষেপক নালী এবং

একটি রমণ অঙ্গ) কেশ পরিণত। কোষ থেকে বের হওয়ার পর পুরুষ মৌমাছির শুক্রাণু আট থেকে চোদ্দ দিনে পূর্ণতা লাভ করে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, পুরুষ মৌমাছির শুক্রাশয়ে কুড়ি কোটি শুক্রাণু থাকে।

পুরুষ মৌমাছির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। দ্রুত সঞ্চরণশীল রাণী মৌমাছিকে অনুসরণ করে তার সাথে শূন্যে সঙ্গমের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মী মৌমাছিরা (চিত্র ৫) তাদের স্বল্পায়ু জীবনে অশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করে (তা মানুষের খুব উপকারে আসে)। নির্দ্বিধায় বলা চলে, এদের কোন শৈশব নেই। কারণ, তরুণ মৌমাছিরা তাদের পরিত্যাগ করে চলে যায় বলে মোমের খোপগুলোর দেয়াল-মেঝে নিয়মিত পরিস্কার করে সেগুলোকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার দায়িত্ব জীবনের তৃতীয় দিনটি থেকেই তাদের উপর বর্তায়। চতুর্থ দিন থেকেই তাদের ভূমিকা হয় গৃহী মৌমাছির মত। তারা পরিণত শূককীটগুলোকে পরাগমেশানো মধু খাওয়াতে শুরু করে আর আশপাশটা বুঝে ওঠার জন্য চাকের চারপাশে উড়ে বেড়াতে থাকে। সপ্তম দিন থেকে তাদের চোয়ালাস্থিক গ্রন্হি কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। রাণী মৌমাছিকে এবং ভবিষ্যতে রাণী মৌমাছি হবে এমন শূককীটকে খাওয়ানোর মত রাজসিক জেলি এই গ্রন্হি থেকেই নিঃসৃত হয়। বারো থেকে আঠারো দিনের মাথায় এই সব গৃহী মৌমাছির মোমগ্রন্হি গজিয়ে উঠলে তারা মধুকোষ তৈরীর কাজে লেগে যায়। এই সময় তারা মৌচাক পাহারা দেয়, সুধা পরখ করে দেখে আর এমনভাবে বাচ্চা-কাচ্চাদের শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে, যেন এরা জীবন্ত কম্বল। ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে, মৌচাকে যাতে নিয়মিত আলো বাতাস চলাচল করে — সে সব দেখা গৃহী মৌমাছির কাজ। কর্মী মৌমাছির বয়স যখন ১৫ থেকে ১৮ দিন হয় তখন তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেয়। মাঠ-মৌমাছির মত তখন তারা তন্নতন্ন করে খাবার খুঁজতে এবং মধু ও পরাগ সংগ্রহ করতে বের হয়। এসব কাজের প্রত্যেকটি পর্যায়ে তারা যে কতখানি কর্মতৎপরতার সাথে কাজ করে তার উদাহরণ হিসেবে এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ভবিষ্যৎ বোনদের যে ছয় দিন তারা আহার জোগায় সে কদিনে প্রত্যেকটি শূককীটের কাছে তাদের যেতে হয় ৮০০০ থেকে ১০ ০০০ বার।

মাঠ-মৌমাছির কাজ হল সুধা, পরাগ ও জলের পর্যাপ্ত উৎস সন্ধান করা। তারা প্রচুর পরিমাণে পরাগ সংগ্রহ করে, লালা ভিজিয়ে তাতে সুধা মেশায়, তারপর পেছনের পা দুটির বিশেষ থলিতে তা রাখে। পরাগের দুটো ছোট্ট দলায় (অর্থাৎ দুটি থলির মধ্যেকার জিনিষটুকুতে) প্রায় চল্লিশ লক্ষ পরাগরেণু থাকে। পরাগদলাগুলি মৌচাকে আনার পর তা চাকের খোপে খোপে জমা করে রাখা হয় যেন পরে তার সাথে মধু মিশিয়ে মৌরুটি বানানো যায়।

কেবল কর্মী মৌমাছিদেরই বিশেষ মোম গ্রন্থি থাকে। উদরের শেষ চারটি খণ্ডকের উপরেই সেগুলির অবস্থান। মোমের কুচি বা আরশির উপর অবস্থিত আটটি রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে মোমের আঁশ বা কুচি বের হয়। ১৬৮৪ সালে জন মার্টিন সুচের আগা দিয়ে চাক নির্মাতা একটি মৌমাছির উদর থেকে মোমের কুচিগুলো সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। আর মোম যে মৌমাছির জৈবিক প্রক্রিয়াজাত, বস্তুত তিনিই তা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন। তবে তার মাত্র ১০৮ বছর পরে জন হান্টার দেখিয়েছেন যে, মৌমাছির মোমগ্রন্থি থেকেই মোমের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

মৌমাছির মোমের একশটি কুচির ওজন মাত্র ২৫ মিলিগ্রাম। তাই এক কিলোগ্রাম মোমে প্রায় চল্লিশ লক্ষ কুচি থাকে। এই সমস্ত কুচির মত ইট দিয়েই কর্মী মৌমাছি — যারা মৌচাকের প্রকৃত স্থপতি — অন্ধকারে কাজ করে করে মধু ও পরাগ রাখার জন্যে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মোমাধার এবং বাড়ন্ত বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য টেকসই আরামদায়ক খোপ নির্মাণ করে। কর্মী মৌমাছির কুঠুরি বানাতে তাদের লাগে ১৩ মিলিগ্রাম বা মোমের ৫০টি কুচি আর পুরুষ মৌমাছির কুঠুরির জন্য লাগে ৩০ মিলিগ্রাম বা ১২০টি কুচি। প্রত্যেকটি কুঠুরি ষড়ভুজাকৃতির এবং তার প্রতিটি দেয়ালই সংলগ্ন অন্যান্য প্রত্যেকটি কুঠরির সাধারণ দেয়ালের কাজ করে।

এই সব ষড়ভুজাকার কুঠুরির দুটো স্তর নিয়ে গঠিত হয় মধুকোষ। দুই স্তরের মাঝখানে বিশেষ ধরনের একটি প্রাচীর থাকে যা কুঠুরির মেঝের কাজ করে। ১৫০ গ্রাম ওজনের একটি মধুকোষে ৯১০০টি ভাঁড়ার কুঠুরি থাকে এবং তাতে চার কিলোগ্রাম মধু রাখা যেতে পারে।

মোম-উৎপাদক মৌমাছিরা তিন থেকে পাঁচ দিন — এই বয়সেই তাদের আরশিতে মোমের পাতলা স্তর নিঃসৃত করে থাকে। তবে তাদের

মোমগ্রন্থি পরিণত হয়ে উঠতে সময় লাগে বারো থেকে আঠারো দিন। আর সেটা নির্ভর করে মৌচাকে সঞ্চিত মধু ও পরাগের ওপর।

কর্মী মৌমাছিরা শুধু যে মোমঢালাইয়ে পটু, তা নয়, স্থপতি হিসেবেও তারা চমৎকার। মৌমাছির জীবন নিয়ে যা-কিছু বিস্ময়কর রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল মধুকোষ নির্মাণ। বহু বছর ধরে এদের উপর গবেষণা চালিয়ে ডারউইন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রয়োজনের উপযোগী এমন চমৎকার নির্মাণকাঠামো দেখে তারাই কেবল বিস্মিত হন না যাদের চিত্ত সংকীর্ণ। গণিতবিদেরা বলেন, মূল্যবান মোম সবচেয়ে কম ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মধু রাখার মত কুঠরি নির্মাণের জটিল সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান আসলে মৌমাছিরাই দিয়েছে।

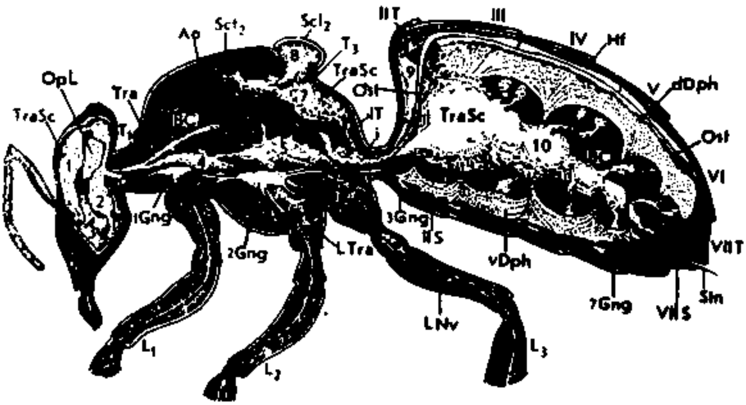
মৌমাছিরা সবসময় মৌচাক তকতকে পরিস্কার করে রাখে। কর্মী মৌমাছিরা প্রপোলিস (মৌ-সিরিশ) দিয়ে তাদের বাসস্থানের সমস্ত ফাটল ভরাট করে এবং দেয়াল পালিশ করে নিপুণভাবে। মধুতে ভাগ বসানোর আশায় কোন ইঁদুর যদি মৌচাকে ঢুকে পড়ে তবে সাথে সাথেই মৌমাছিরা হুল ফুটিয়ে, তার শরীরে বিষ ঢেলে তাকে মেরে ফেলে। তারপর শিকারটির শারীরিক পচনের মারাত্মক পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতাস নিরোধক আঠা দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলে। মৌচাকের ভেতরকার বাতাস যে সব সময় নির্মল ও টাটকা থাকে তার কারণ মৌমাছিরা সব সময় নিজেদের বাস-স্থানে অবাধ বায়ু চলাচল ও সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা বজায় রাখে।

গ্রীষ্মের কোন দিনে আপনি হয়তো দেখবেন, মৌচাকের প্রবেশমুখে সুশৃংখল সারিবদ্ধ মৌমাছিরা সবার মাথা একদিকে রেখে দারুণ উদ্যমে ডানা কাঁপিয়ে চলেছে। এরা হল বায়ু সঞ্চালক মৌমাছি, মৌচাকের ভেতরে ঠান্ডা বাতাসের জোরালো স্রোত পাঠায় এরা। মৌচাকের ভেতরেও অন্য আর এক দল এ রকম করে। আবার যখন বাইরের তাপমাত্রা কমে যায় তখন চাকের ওপর মৌমাছিরা পরস্পর এমন জড়াজড়ি করে থাকে যাতে করে তাদের দেহের বহির্ভাগে তাপক্ষয় কম হয়, বিপাক বেড়ে যায় এবং তার ফলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

কিছু মৌমাছির দায়িত্ব হচ্ছে মৌচাকের প্রবেশমুখ পাহারা দেওয়া। বিপদের প্রথম ইংগিত পাওয়া মাত্রই তারা অবাঞ্ছিত আগন্তুকের সাথে

যুদ্ধে লেগে যায়। বিপ্লবী গণতন্ত্রী রুশ লেখক ও সমালোচক দ. ই. পিসারেভ লিখেছেন, মৌমাছিদের কোন নিয়মিত রক্ষীদল নেই। তবে, অন্য গোত্রের কোন অসতর্ক অথবা দুঃসাহসী সদস্য হঠাৎ যদি মৌচাকে উড়ে এসে পড়ে তবে তার মরার দশা; তখন শত শত কর্মী মৌমাছি নীচের চোয়াল ও হুল উঁচিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনধিকার প্রবেশকারীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর অন্যদের জন্য হুঁশিয়ারী হিসেবে তার দেহটাকে ঠেলে বের করে দেওয়া হয় মৌচাকের বাইরে। কোন মৌচাক খুলে দেখলে দেখা যাবে মধুকোষের ভেতরে হাজার হাজার মৌমাছি গুঞ্জন করে চলেছে। মনে হবে মৌমাছিরা কোন বিরাম-বিশ্রাম নেয় না। শুধু অসংখ্য দায়িত্ব পালনেই তারা সদা ব্যস্ত। তবে ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তারাও বিশ্রাম নেয়, ঘুমায়। আ. ই. রুট তাঁর মৌমাছিপালন সংক্রান্ত বক্তৃতামালায় প্রায়ই উল্লেখ করেছেন যে, মৌমাছিরা দিনের চেয়ে রাতের বেলাতেই গভীর ঘুম দেয়। মৌমাছির 'ভাষার' পাঠোদ্ধারকারী অধ্যাপক কার্ল ফন ফ্রিশ বলেন, মৌচাকের ভেতরে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে যতই অবগত হওয়া যায় ততই বোঝা যায় যে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিনা কাজে কতটা সময় মৌমাছিরা ঘুমিয়ে কাটায়।

কর্মী মৌমাছির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (রাণী ও পুরুষ মৌমাছিরও) সুসমঞ্জস ক্রিয়াকলাপ স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা (কেন্দ্রীয়, প্রান্তিক ও সমবেদী) নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় (চিত্র ৬)। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র একটি মস্তিষ্ক ও একটি অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু বা স্নায়ুমালা নিয়ে গঠিত। অঙ্কীয় স্নায়ুমালা মেরুরজ্জুর অনুরূপ ভূমিকা পালন করে বলে মৌমাছির মস্তিষ্ক গুরুত্বের দিক থেকে কোন কোন উচ্চতর প্রাণীর মস্তিষ্কের সাথে কিছুটা তুলনীয়। বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের মস্তিষ্কের ওজন একেবারে যথাযথভাবে নির্ণয় করার পর দেখা গেছে যে, কর্মী মৌমাছির মস্তিষ্ক রাণী কিংবা পুরুষ মৌমাছির মস্তিষ্কের তুলনায় বড়। কোষের একটি স্তর দিয়ে গঠিত এই মস্তিষ্কে ছত্রাক আকৃতির দুটো বিশেষ অবয়ব (করেপারা পেডানকুলেটা বা করপোরা বৃন্তদন্ড) আছে। এগুলোকে উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের মূলকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কর্মী মৌমাছির মস্তিষ্কের করপোরা বৃন্তদন্ডকে গবেষকরা খুবই উন্নত ধরনের বলে নিরূপণ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা বিজ্ঞান



চিত্র — ৬: লম্বালম্বি ভাবে কর্তিত কর্মী মৌমাছির রেখাচিত্র; পৃষ্ঠরক্তনালী, মধ্যচ্ছদা, শ্বাসনালী, বায়ুথলি ও অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু দেখানোর জন্য পেশী ও পরিপাকনালী অপসারিত হয়েছে (স্নডগ্রাসের অনুসরণে) I, II, III, IV, V, VI, VII, — উদর-খন্ড; i — মহাধমনীর কুন্ডলী-পাকানো অংশ; TraSc — শ্বাসনালীয় বায়ুথলি; Opl — অক্ষিখন্ড; T — পৃষ্ঠখন্ড; Tra — শ্বাসনালী; Ao — মহাধমনী; Sct — স্কুটাম (দ্বিতীয় পৃষ্ঠখন্ড); Scl — স্কুটেলাম (পৃষ্ঠখন্ডের তৃতীয় স্ক্লেরাইট); IT — প্রপেডিয়ামের পৃষ্ঠখন্ড; Ost — হৃৎপিন্ডের অস্টিয়াম; Ht — হৃৎপিন্ড; dDph, vDph — পৃষ্ঠদেশীয় ও অঙ্কীয় মধ্যচ্ছদা; Stn — হুল; S — উরঃফলক (বক্ষাস্থি); Gng — স্নায়ুগ্রন্থি; LNv — পায়ের স্নায়ু; LTra — পায়ের শ্বাসনালী; BC — দেহ গহ্বর

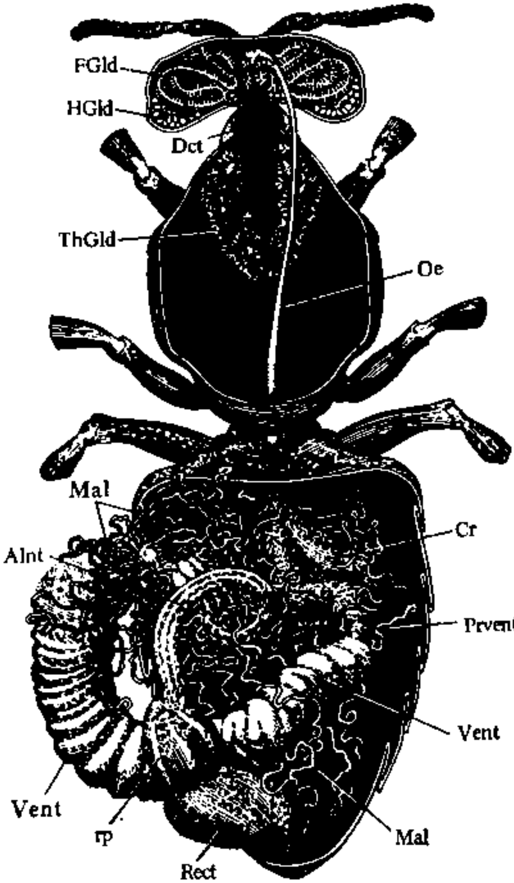
একাডেমীর সম্মানী সদস্য অধ্যাপক ভ. ফ. নাতালি মনে করেন, জটিলতম যে আচরণ কর্মী মৌমাছিদের বৈশিষ্ট্য, তার কারণ রাণী কিংবা পুরুষ মৌমাছির তুলনায় তাদের মস্তিষ্কের, বিশেষ করে তাদের করপোরা বৃন্তদন্ডের অধিকতর বিকাশ।

ইলিয়া মেচনিকভ আলোচনা প্রসঙ্গ তাঁর 'আশাবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'নিজেদের সমাজের ভালোর জন্য কর্মী মৌমাছি অনেক কিছু করলেও একটি অপূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য তাদের রয়েছে। উন্নত মস্তিষ্ক পেয়ে তারা সৌভাগ্যবান; মোম তৈরী ও খাদ্য আহরণের জন্য সুগঠিত অঙ্গও তাদের রয়েছে। কিন্তু তাদের যৌনাঙ্গ নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের,

স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়ায় তা অক্ষম।' মস্তিষ্কের নিম্নভাগ দুটি বোধশলাকা বা ঘ্রাণলতি নিয়ে গঠিত। এখান থেকে স্নায়ু বোধশলাকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের দুই পাশে অক্ষিখন্ড ও পুঞ্জাক্ষির অবস্থান। অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু মস্তিষ্কেরই একটি প্রসারিত অঙ্গ এবং তা দুটি সংগ্রথিত (অর্থাৎ প্রান্তভাগে পরস্পর সংযুক্ত) স্নায়ুগ্রন্থি নিয়ে গঠিত। স্নায়ুগ্রন্থি থেকে মৌমাছির দেহের উদর অংশের সর্বত্রই স্নায়ুর বিস্তার। দেহের সর্বত্র এই রকম স্নায়ুগ্রন্থির উপস্থিতির ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশীর কাজের সমন্বয়-সাধনের ব্যাপারটি এককভাবে মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত নয়। উদাহরণস্বরূপ কোন মৌমাছির শিরচ্ছেদ করা হলেও তা চলতে থাকে, যন্ত্রণা দিলে রেগে যায় এবং তখনও হুল ও হুল ফোটানোর অঙ্গ কাজ করে। সম্মুখীয় স্নায়ুগ্রন্থি থেকে সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রের শুরু। এই স্নায়ুগ্রন্থি মস্তিষ্কের কাছাকাছি অবস্থিত এবং কয়েকটি ছোটছোট স্নায়ুগ্রন্থি এর সংগে যুক্ত। এখান থেকেই স্নায়ু পরিপাক, সংবহন ও শ্বাসনতন্ত্রে পৌঁছে।

সাইবারনেটিক্স-এর জনক নরবার্ট ভিনার মৌমাছিদের মৌচাকের স্নায়ুকলাকে কেবল প্রতিটি স্বতন্ত্র মৌমাছির স্নায়ুকলা হিসেবে ধরে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন: তাই যদি হয় তবে একটি মৌচাকের কাজকর্ম সুসমঞ্জসভাবে সম্পাদিত হয় কীভাবে? নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে তা খাপ খাইয়ে নেয় কী করে? এ-সবের উত্তর স্পষ্টতই মৌচাকের বাসিন্দাদের নিজস্ব পারস্পরিক বন্ধনের মধ্যেই নিহিত।

মৌমাছির কোন বিশেষ ধরনের বদ্ধ রক্তসংবহনতন্ত্র নেই এবং তাদের রক্ত (রক্তলসিকা নামে পরিচিত) একাধারে রক্ত ও লসিকা — দুইয়েরই কাজ করে। রক্ত সংবহনের প্রধান অঙ্গ হল পাঁচ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট পৃষ্ঠবাহিকা তথা হৃৎপিন্ড। তা উদর থেকে মাথায় রক্ত সঞ্চালন করে। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের পার্শ্ব-প্রাচীরে লম্বা সরু ছিদ্রের মত প্রবেশমুখ বা হৃদরন্ধ্র থাকে। প্রকোষ্ঠগুলি প্রসারিত হলে এই সব হৃদরন্ধ্র দিয়ে রক্ত হৃৎপিন্ডে প্রবেশ করে। সেগুলো যখন আবার সংকুচিত হয় তখন রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে সঞ্চালিত হয়ে মহাধমনীতে আসে এবং সেখান থেকে একটি মুক্ত নির্গমপথের মধ্য দিয়ে তা করোটি গহ্বরে যায়। সেখানে তা প্রথমে মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কে অবস্থিত সংজ্ঞাইন্দ্রিয়সমূহকে এবং পরে বক্ষের পেশী সমূহকে ধৌত করে।



চিত্র — ৭: কর্মী মৌমাছির পরিপাক নালী এবং মাথা ও বক্ষের গ্রন্হিসমূহের রেখাচিত্র (স্নডগ্রাসের অনুসরণে)

FGld — খাদ্যগ্রন্হি; HGld — মাথার লালাগ্রন্হি; ThGld — বক্ষের লালাগ্রন্হি; Oe — খাদ্যনালী; Dct — নালী; Mal — ম্যালপিজি নালিকা; AInt — সম্মুখঅন্ত্র; Cr — খাদ্যস্থলী (মধু পাকস্থলী); Prvent — অনুনিলয়; Vent — নিলয়; rp — মলাশয় পটিকা; Rect — মলাশয়

মধ্যপৌষ্টিক নালী পরিস্কার করার ফলে রক্ত পুষ্টিকর পদার্থ দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং সম্ভবত তা অন্ত্রগাত্র দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে থাকে।

নিঃসারক অঙ্গ (ম্যালপিজি নালিকা) দ্বারা পরিশ্রুত হওয়ার পর রক্ত মৌমাছির দেহের বিপাকজাত অবশেষকে মল হিসেবে বের করে দিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভারমুক্ত করে। ম্যালপিজি নালিকা মৌমাছির রেচনতন্ত্রের কাজ করে; এদের কাজ মেরুদন্ডী প্রাণীর বৃক্কের কাজের মত (চিত্র ৭)।

প্রাণধারণের জন্য অপরিহার্য ক্রিয়াকলাপ, পরিবেশের তাপমাত্রা ও আরও অন্যান্য উপাদানের উপর বয়স্ক মৌমাছির হৃদস্পন্দনের সংখ্যা নির্ভরশীল। মধুকোষে বা ফুলের উপর শান্তভাবে বসে থাকা অবস্থায় মৌমাছির হৃদস্পন্দনের হার সাধারণতঃ মিনিটে ৬৫ থেকে ৭০ বার। নড়াচড়া করতে থাকলে এই হার দাঁড়ায় প্রতি মিনিটে ১০০ বার (উড়ন্ত অবস্থায় মিনিটে ১৫০ বার)। রক্তপ্রবাহ নিয়ত সচল রাখতে এবং দেহকোষে পুষ্টিকর উপাদান ও কিছুটা অক্সিজেন জোগাতে এই ধরনের দ্রুত হৃদস্পন্দনের প্রয়োজন হয়।

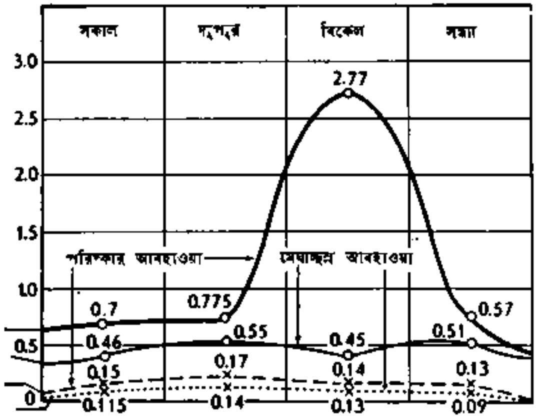
মৌমাছির রক্ত, রক্তরস (তরল অংশ) ও কোষ তথা রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শ্বেতকণিকা ও খাদককোষ (ফ্যাগোসাইট)। খাদককোষ গ্রাসনক্রিয়া (অণুজীবের হাত থেকে দেহাঙ্গকে রক্ষা করার প্রক্রিয়া) নিশ্চিত করে থাকে।

মৌমাছির শ্বাসতন্ত্র যথেষ্ট উন্নত। বায়ুথলি, শ্বাসনল, শাখা-প্রশাখা ও অণুবৎ কৈশিক শ্বাসনালিকা নিয়ে এটি গঠিত। কৈশিক শ্বাসনালিকা এক মাইক্রন ব্যাসের অত্যন্ত সরু নালিকা। বিশেষ ধরনের ছিদ্র বা শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে মৌমাছির দেহে বায়ু প্রবেশ করে। মৌমাছির বক্ষে তিন জোড়া ও উদরে ছয় জোড়া (পুরুষ মৌমাছির সাত জোড়া) শ্বাসরন্ধ্র থাকে। শ্বাসরন্ধ্রে যে অবরোধ যন্ত্র থাকে তা বাতাসের সাথে ধূলিকণার প্রবেশ রোধ করে এবং জলীয় অংশের ক্ষয় প্রতিহত করে। মৌমাছির নিশ্চল অবস্থায় শ্বাসরন্ধ্রগুলো বন্ধ থাকলেও কাজের সময়ে কিংবা যখন মৌমাছির দেহে প্রচুর অক্সিজেনের দরকার হয় তখন সেগুলো পুরোপুরি খুলে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় শ্বসন কেন্দ্র থেকে এবং অক্সিজেনের অভাব কিংবা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রাধিক্য ঘটলে প্রয়োজন মত শ্বাসরন্ধ্র উন্মুক্ত বা বন্ধ হয়ে থাকে। মৌমাছির চোখের সংখ্যা পাঁচটি—দুটি পুঞ্জাক্ষি ও তিনটি সরলাক্ষি। কাছের সামগ্রী (এক বা দুই সেন্টিমিটার দূরত্বের) চেনার জন্য এবং মৌচাকের ভেতরে কিংবা ফুলের উপর কর্মব্যস্ত অবস্থায় দিকস্থিতি নির্ণয়ের জন্য তারা সরলাক্ষি

ব্যবহার করে বলে মনে করা হয়। দূরবর্তী কোন বস্তু নির্ণয় করতে তারা পুঞ্জাক্ষি ব্যবহার করে। পুঞ্জাক্ষির কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সরলাক্ষি সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলেও মনে করা হয়। কর্মী কিংবা রাণী মৌমাছির পুঞ্জাক্ষির উপরিতলে প্রায় পাঁচ হাজার (পুরুষ মৌমাছিদের ক্ষেত্রে আট হাজারেরও বেশি) ষড়কৌণিক উপাদান বা অক্ষিপল থাকে। তা থেকে ক্রমসূক্ষ্ম নালিকা চোখের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং স্নায়ুশাখা বিন্যাসে গিয়ে শেষ হয়। এক একটি অক্ষিপলে বস্তুর সামগ্রিক প্রতিবিম্ব পড়ে না বরং তাতে বস্তুর একটি অংশ মাত্র প্রতিফলিত হয়। বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কয়েক হাজার আলাদা আলাদা প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে একত্রিত হয়ে বস্তুর একটি সামগ্রিক প্রতিবিম্ব গড়ে ওঠে। এই ধরনের দৃষ্টি মোজাইক দৃষ্টি নামে পরিচিত।

মৌমাছিরা যে নীল, হলুদ ও সাদা রঙ চিনতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। লাল রঙ বোঝার ক্ষমতা তাদের একেবারেই নেই আর হলুদ ও নীল রঙের সাথে তারা সবুজকে গুলিয়ে ফেলে। কর্মী মৌমাছির পুঞ্জাক্ষি মাথার পার্শ্বভাগে ও সরলাক্ষি মাথার পার্শ্বকরোটির লোবের উপর অবস্থিত। সূর্যের মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় পথ চিনে চলার পন্থা দৃশ্যতঃ মৌমাছির জানা আছে বলে ফন ফ্রিশ, লেংকত ও অন্যান্য গবেষকরা মনে করেন। আকাশ পরিস্কার থাকলে মৌমাছিরা সম্ভবত সূর্যের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত কোন প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা পরিচালিত হয়; যেমন, নীলাকাশ থেকে আলোর আংশিক সমবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি। ফন ফ্রিশের ধারণা, আকাশ পুরোপুরি মেঘাচ্ছন্ন থাকলে মেঘের ভেতর দিয়ে আসা অতিবেগুণী রশ্মির সাহায্যে মৌমাছিরা পথ চিনে নেয়। তবে বলতে হয়, মৌমাছিরা অতিবেগুনী আলোর প্রতি সংবেদনশীল। অথচ এই রশ্মি মানুষের চোখে একেবারেই ধরা পড়ে না।

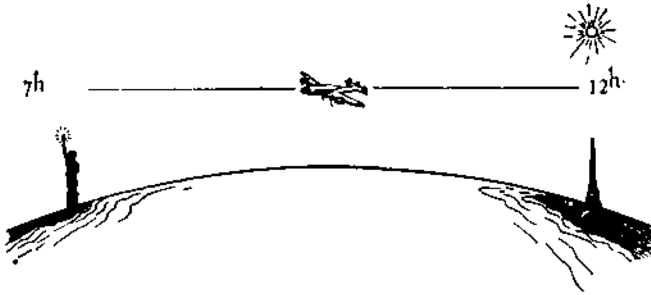
মৌমাছির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অবস্থান আকর্ষ বা বোধশলাকাগুলিতে। অ. ল. গুসেলনিকভ-এর মত অনুসারে প্রত্যেকটি বোধশলাকায় ৫০০০০০টি ঘ্রাণরন্ধ্র রয়েছে; এদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব স্নায়ুপ্রান্ত আছে। রন্ধ্রগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে স্পর্শরোম। এর ফলে বোধশলাকা একাধারে ঘ্রাণ ও স্পর্শ ইন্দ্রিয় হিসাবে কাজ করে। পাঁচ শত ভাগ জলের সঙ্গে এক ভাগ গন্ধদ্রব্য মিশিয়ে তরল করার পরও মৌমাছি যে তা টের পায় সেটা প্রমাণিত হয়েছে (এত ক্ষীণ গন্ধ আঁচ



চিত্র — ৮ : দিনের বিভিন্ন সময়ে Phacelia থেকে সুধা সংগ্রহের বক্র রেখাচিত্র (ফমিনভ-এর অনুসরণে)

করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন)। মৌমাছি যখন উড়তে উড়তে মৌচাকে ঢোকে তখন চাকের প্রবেশ মুখের দৌবারিক মৌমাছিরা নিজেদের বোধশলাকার সাহায্যে প্রত্যেকটি মৌমাছির 'গন্ধ শুঁকে দেখে' এবং এভাবে তারা নিজেদের বসতির সদস্যদের সাথে বহিরাগত আগন্তুকের পার্থক্য পুরোপুরি নির্ণয় করতে সক্ষম।

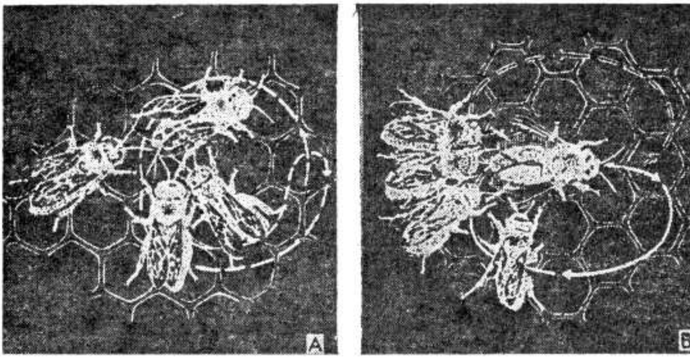
মৌমাছির স্বাদ-ইন্দ্রিয় কাইটিনময় স্বাদশলাকা হিসেবে মুখের ভেতরে চারপাশে ছড়ানো থাকে। ঐ সব স্বাদশলাকার স্নায়ু সংযোগ রয়েছে। এই সব অঙ্গের বিন্যাসের ফলে (বিশেষতঃ কর্মী মৌমাছির বেলায় তা বেশ উন্নত) মৌমাছির স্বাদ-অনুভূতি খুব সূক্ষ্ম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চার শতাংশ চিনির সিরাপ তাদের কাছে মিস্টি লাগে না; তাতে তারা ক্ষুধার্ত থাকবে বটে তবু তা ছোঁবে না। ঠিক এমনি ভাবেই স্যাকারিন মেশানো ধাতর গন্ধযুক্ত অতিরিক্ত মিস্টি দ্রবণও তাদের মুখে রোচে না। তবে কুইনাইন যুক্ত সিরাপ পেলে তা থেকে তারা ঝটপট মধু তৈরী করে নেবে। সময় কাল সম্পর্কে কর্মী মৌমাছির অনুভূতি খুবই উন্নত। দিনের ঠিক সেই সময়টাতেই তারা পরাগ ও সুধা সংগ্রহে বের হয় যখন তা ফুলের মধ্যে পাওয়া যাবে (চিত্র ৮)। বহু গবেষকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায় যে, সূর্যের



চিত্র — ৯: মৌমাছির সময়-অনুভূতি পরীক্ষার জন্য বিমানে আটলাণ্টিক পাড়ি (রেনার-এর অনুসরণে)

অবস্থান পরিবর্তন, বায়ুমন্ডলের অবস্থা ও আবাস অঞ্চল অনুসারে মৌমাছিরা তাদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। পরীক্ষা-মৌমাছিদেরকে দেখা গেছে যে, তারা প্রত্যেকদিনই ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ানোর পেয়ালা থেকে মিষ্টি জল নিতে যায়। তাদের এই সূক্ষ্ম সময়জ্ঞান সূর্যের উপর নির্ভরশীল কি না তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য পরীক্ষা-মৌমাছির কিছু চাক অন্ধকার জায়গায় কৃত্রিম আলোতে রাখা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক আলোর অনুপস্থিতিতে তাদের আচরণের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। সূর্যালোকে যেমন, এখানেও ঠিক তেমনি, একদম ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়ল তারা মিষ্টি পানির খোঁজে। এটা দেখে নীচের পরীক্ষাটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্যারিসে কৃত্রিমভাবে আলোকিত জায়গায় মিষ্টি পানি নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা মৌমাছিদের বিমানে করে নিয়ে আসা হল নিউইয়র্কে। দুটি শহরের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল, নিউইয়র্কেও (কৃত্রিম আলোময় অনুরূপ জায়গায়) মৌমাছিরা প্যারিসের মত ঠিক একই সময়ে মিষ্টি জলের তালাশে বের হয়ে পড়েছে (চিত্র ৯)।

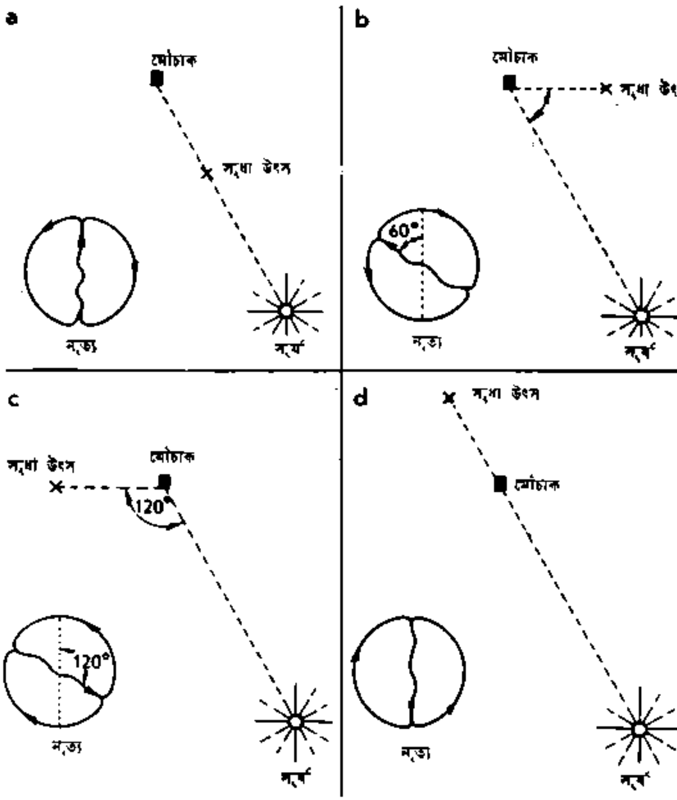
মৌমাছির কোন শ্রবণেন্দ্রিয় আছে কিনা তা এখনও নিরূপিত হয়নি। তবে মৌমাছি পালকদের প্রত্যক্ষ পর্যক্ষেণ থেকে মনে হয় যে, মৌমাছিরা শব্দ, বিশেষ করে ধাতব ঘণ্টাধ্বনি, ভালই শুনতে পায়। ইংরেজ জীববিজ্ঞানী স্যার জন লুবক এফ. আর. এস, এ নিয়ে যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন, 'মৌমাছির শ্রবণ অনুভূতি নিয়ে আমার পরীক্ষার ফলাফল আমাকে দারুনভাবে বিস্মিত



চিত্র — ১০: মৌমাছিদের 'ভাষা' ('নাচ'; ফন্ ফ্রিশ-এর অনুসরণে) A — সুধা সন্ধানীদের 'বৃত্তাকার নাচ'; B — সুধা ও পরাগ সন্ধানী মৌমাছিদের ঘেষটানো পদক্ষেপের আনুক্রমিক পর্যায়সমূহ

করেছিল। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, মৌমাছিরা তাদের ভাবাবেগ কিছুটা প্রকাশ করে গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে। আর এ থেকে ধারণা হয় যে, তারা শ্রবণ ক্ষমতার অধিকারী। ব্যাপারটা যে এমন আমি তা মোটেও অস্বীকার করি না। সে যাইহোক আমি কিন্তু কোন আওয়াজেই তাদের কখনো সাড়া দিতে দেখি নি, এমন কি খুব কাছ থেকে শব্দ করেও। একটা মৌমাছিকে ভায়োলিন বাজিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি, আওয়াজ যতটা পেরেছি করেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য! তাতে তার কোন খেয়ালই নেই, এমনকি তার বোধশলাকার সামান্যতম নড়াচড়াও আমার চোখে পড়ল না।'[3]

পরস্পরের মধ্যে মৌমাছিদের ভাবের আদান-প্রদান সম্পর্কে জানার জন্য প্রকৃতি বিদ্‌রা বাহু শতাব্দী ধরে চেষ্টা করে আসছেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন, নানা রকম ধ্বনি করে তারা একে অন্যের সাথে 'কথাবার্তা বলে'। মৌমাছিরা সুনির্দ্দিষ্ট ধরনের গতিবিধিতে অভ্যস্ত (একে বলা হয় 'নাচ')। ১৭৮৮ সালে আর্নেষ্ট স্পিৎস্‌নার এই তথ্যের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রফেসর কার্ল ফন ফ্রিশ মৌমাছিদের আচরণ নিয়ে বহু বছর যে গবেষণা করেছেন সে-সবেব বিবরণ তিনি তাঁর 'মৌমাছির জীবন থেকে' বইতে দিয়েছেন। তিনি



চিত্র — ১১: সন্ধানী মৌমাছিরা নাচের মাধ্যমে সূর্যের অবস্থানের সাথে মিলিয়ে উদ্ভিদের দিক নির্দেশ করে (ফন্ ফ্রিশ-এর অনুসরণে)

তাতে দেখিয়েছেন সন্ধানী মৌমাছিরা বিশেষ বিশেষ নাচের মাধ্যমে সুধা ও পরাগের বিপুল উৎসের খবর মৌচাকের অন্যান্য মৌমাছিদের জানিয়ে দেয় (চিত্র ১০)। সুধার পর্যাপ্ত উৎসের কথা বোঝাতে তারা 'বৃত্তাকার নাচ' করে। ঘেষটানো পদক্ষেপে জানান দেয় পরাগের প্রাপ্তি সংবাদ।

১৯৪৬ সালে একটি বিশেষ নিবন্ধে মৌমাছিদের নাচের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে ফন ফ্রিশ্ তাঁর আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ দেন। নতুন

নতুন ও খুবই মজার মজার সব পরীক্ষার সাহায্যে তিনি তাঁর আগেকার ধারণা খণ্ডন করে দেখান যে আসলে সন্ধানী মৌমাছি তাদের নাচের মাধ্যমে উৎসের প্রকৃতি সম্পর্কে (সুধা না পরাগের উৎস) মৌচাকে খবর দেয় না বরং মৌচাক থেকে উৎসের দূরত্বের খবর জানায়। তাঁর নতুন পর্যবেক্ষণ অনুসারে 'বৃত্তাকার নাচ' করে সন্ধানী মৌমাছি অন্যান্য মৌমাছিদের জানিয়ে দেয় যে, উৎসটি মৌচাকের কাছেই। কিন্তু মৌচাকে ফিরে তারা 'ঘেষটানো পদক্ষেপ' দিতে থাকলে মৌমাছিরা দীর্ঘ উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত হয় (চিত্র ১১)।

১৯৬৯ সালে মিউনিখে মৌমাছি সংরক্ষকদের দ্বাবিংশ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে অধ্যাপক ফন ফ্রিশ বলেন, সুদীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মৌমাছিরা তাদের মৌচাকের বন্ধুদের খাবারের উৎসের দূরত্ব ও পথ-নির্দেশের খবর জানানোর পন্হা অর্জন করতে পেরেছে, সত্য। তাই বলে এটা ভাবা ঠিক নয় যে, অন্য মৌমাছিরা সে-সব বুঝতে পারে না। আমরা নিশ্চয়ই মনে করি না যে আমরা ১৮২৩ সালের সেই অবস্থায় পিছিয়ে গেছি, যখন 'আনহুখ' মৌমাছির নাচের বিবরণ দিয়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝে আর মৌ-নৃত্যকে ভেবেছিলেন মৌমাছি পরিবারের নিছক বিনোদন।

মৌমাছি বসতির জীবনযাত্রা খুবই চিত্তাকর্ষক। মৌমাছিদের আচরণ ও তাদের কাজের বৈচিত্র্য এতই বিস্ময়কর যে মানুষ ভাবে, মানুষের মত মৌমাছিরও বুঝি ভাবাবেগ আছে, আছে আনন্দ, দুঃখ, ভালবাসা, আত্মত্যাগের মনোভাব এবং এমনি সব বোধ। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ, চিন্তা ও শ্রমের মত বুদ্ধিমত্তার কাজ কেবল মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব। কার্ল মার্কসের ভাষায়, মৌমাছি যে মোমের প্রকোষ্ঠ বানায় তা অনেক মানব স্থপতিকেও লজ্জায় ফেলে; কিন্তু শ্রেষ্ঠতম মৌমাছির সাথে নিকৃষ্টতম স্থপতির যে পার্থক্য তা হল, মোম-প্রকোষ্ঠটি বানানোর আগেই নির্মিতব্য বাসগৃহের একটি পরিকল্পনা স্থপতির মাথায় থাকে। কিন্তু মৌমাছির এমন কিছু থাকে না।

পতঙ্গ ও ফুলের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর লেখা ব. ন. শ্ভানভিখ-এর গ্রন্থের ভূমিকায় প্রখ্যাত শারীরবিদ ই. প. পাভলভ লিখেছেন, 'লেখক, কীটপতঙ্গ নিয়ে ফ্রিশ, নল ও মিন্নিখ-এর কিছু কিছু কৌতূহলজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। শুধু

গতবাঁধা, সহজাত ও তথাকথিত স্বতপ্রবৃত্তিগত ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পরীক্ষা নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সেখানে স্থান পেয়েছে। সে-দিক থেকে এই সব প্রাণীর আচরণ দু'রকমের — উচ্চতর ও নিম্নতর, ব্যক্তিগত ও নির্দিষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমোক্তটির গঠনপ্রণালী মানুষের কাছে বড়ো ধরনের সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। তা সমাধান কল্পে প্রাণিজগতের বিভিন্ন দিকে গবেষণার সম্প্রসারণ দরকার।'[4]

মৌমাছিশালায় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা

পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে মৌমাছি পালককে অবশ্যই সম্পূর্ণ আদর্শস্থানীয় হতে হবে। সুদূর অতীতেও মানুষ জানত যে, মৌমাছিশালায় অপরিচ্ছন্নতার কোন স্থান নেই। কারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকাই মৌমাছিদের পছন্দ। তুর্গেনেভের 'ক্রীড়াবিদের স্কেচ' গ্রন্থে গল্পকথক মন্তব্য করছেন, 'কালিনিচ-এর মৌমাছি-ঘর কি পরিস্কার! "তা না হলে মৌমাছিরা সেখানে থাকত না হুজুর," (কালিনিচ) দীর্ঘস্বাস ফেলে বলল।' মৌমাছির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীল। আর উৎকট গন্ধ (ঘাম, তামাক, মদ ইত্যাদি) পাওয়া মাত্রই তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'শিরোনামা নেই' উপন্যাসে দ. ন. মামিন-সিবিরিয়াক দক্ষতার সাথে 'ফিয়েলশের' (ডাক্তারের সহকারী) পোতাপুভ-এর মৌমাছি শালার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তা প্রায় তিনশ' মৌচাক নিয়ে বেশ বড় হয়ে উঠল। পাতোপভ ধরেছিল ঠিকই, 'অপরাধী মন নিয়ে যেমন মৌমাছিদের কাছে যাওয়া উচিত নয়' তেমনি নোংরা হাত নিয়েও না। সে বলল: আর তবে কখনো হাত না ধুয়ে মৌমাছির কাছে যাবে না। তা হলে সে খুব গোলমাল করবে। তোমাকে যদি বলতে পারত তাহলে সে বলত, বন্ধুহে, তোমার মাথার ঠিক নেই আর রীতিনীতিও দেখছি কিছু জান না।'

মৌমাছিপালক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কথা ভুলে গেলে এবং মৌমাছির খামারে পানি, সাবান ও পরিস্কার তোয়ালে সহ ধোওয়ার বেসিনের ব্যবস্থা না রাখলে মৌমাছিরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাতে

তাদের কাজও মন্দ হয়। এ রকম পালকের মৌমাছি বসতি সাধারণতঃ দুর্বল হয়, তাতে লাভ না হয়ে বরং লোকসান হতে থাকে। মধু বিক্রি তো দূরের কথা, মৌমাছির খাবার জোগানোর জন্য তাকে বরং বাধ্য হয়ে চিনি কিনতে হয়। তা ছাড়া নোংরা হাতে যে মৌমাছি পালক কাজ করছেন, হয়ত ক'দিন পরেই মৌমাছিদের নানান রোগের সাথে তিনি বেশ পরিচিত হয়ে উঠবেন।

মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে হাত পরিস্কার রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে শার্ল দাদান্ত মন্তব্য করেছেন যে, এটা তাঁকে এমন একটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা তাঁর যৌবনকালে নিজের পিতাকে — যিনি আগে ডাক্তার ছিলেন — ছেড়ে আসার আগে ঘটেছিল। একদিন একজন মজুর তাঁর বাবার কাছে এসে পাঁচড়ার মলম চাইল। ক্ষেতে ফসল তুলতে গিয়ে সে এই রোগ বাধিয়েছিল। দাদান্ত-এর বাবা মলম ব্যবহারের নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, সে যেন তার স্ত্রীকেও একইসাথে মলম ব্যবহার করতে বলে। কিন্তু স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীটি কিছুতেই মলম ব্যবহার করতে রাজি হল না। দু'সপ্তাহ পরে মজুরটি আবারও এলো মলম নিতে। আগের চেয়ে সে অনেক ভাল, তবে তার স্ত্রীকে এবার ঐ সংক্রামক রোগে ধরেছে। দা দান্ত-এর বাবা তাকে আবারও মলম দিলেন এবং বললেন, সে ও তার স্ত্রী — দু'জনেই যেন মলম লাগায় যাতে করে রোগ আবার তার শরীরে সংক্রমিত না হয়। কিন্তু এ পরামর্শ লোকটি শুনল না। এবং দু'সপ্তাহ পরে ফের সে ডাক্তারের কাছে এলো। বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন, 'আমার মনে হয়, এ দুটো অভিজ্ঞতা থেকে তোমার নিশ্চয়ই এখন এই শিক্ষা হয়েছে যে, তোমাদের দুজনেরই একই সাথে চিকিৎসা দরকার। কারণ, এ এমন এক রোগ যা সরাসরি ছোঁয়াতেই সহজে সংক্রামিত হয়।' দাদান্ত উপসংহার টেনে বলেছেন; 'ফাউল ব্রুড' রোগের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সুতরাং মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে মৌলিক ও প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে অন্যান্য সব কিছুর মত হাত ও শরীর পরিস্কার রাখা। নিজের স্বার্থেই এটা করা দরকার, কারণ তা না হলে নানা রকম রোগ, বিশেষ করে পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে। মৌমাছি পরীক্ষার আগে ও পরে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত। যদি কোন বসতিতে ইউরোপীয় বা আমেরিকান ফাউল ব্রুড রোগের সংক্রমণ দেখা দেয় তবে সাবান ও বুরুশ দিয়ে খুব

ভাল করে ঘষে বার তিনেক হাত পরিস্কার করতে হবে এবং তারপর ঈষদুষ্ণ বা গরম জলে হাত ধুয়ে নিতে হবে। হাত ধোয়া জল মাটিতে গর্ত করে ঢেলে মাটি চাপা দিতে হবে।

মৌমাছি পালকের এক নম্বর শত্রু হল মোম-মথের শূককীট। এরা মারাত্মক ক্ষতিকর। একজোড়া মোম-মথের জন্ম দেওয়া পর পর দুটি প্রজন্মের শূককীট ১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত শুকনো মোমপাতা (৬০ কিলোগ্রাম খাঁটি মোমের সম পরিমাণ) সাবাড় করে দিতে পারে। যে সব মৌমাছি শালায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব, সেগুলোকেই মোম-মথেরা আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়।

আল্টমান রিখেনবার, কা ওয়ান, কুলিকভ, জান্ডের ও অন্যান্যরা তাদের বিবরণে মৌচাকে এবং মৌমাছি ও শূককীটের দেহে আন্ত্রিক কৃমিকীটের অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। রাণী মৌমাছিকে অসাড় করে দিয়ে এই সব কৃমি মৌচাকের মারাত্মক ক্ষতি করতে এমন কি তা পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কৃমিই (গোল কৃমিই মৌমাছির দেহে বেশি থাকে) ডিমওয়ালা পানির মাধ্যমেই এদের বিস্তার ঘটে। 'এদের হাত থেকে মৌমাছিদের বাঁচানোর প্রধান উপায় হলো, মৌমাছির খামারে পানীয় জলের জন্য একটি ভালো গামলায় করে বিশুদ্ধ জল রাখা এবং মৌচাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা' (কুলিকভ)।

মৌমাছিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্য মৌমাছিদের পানি দরকার। পানি ছাড়া তাদের পক্ষে নতুন প্রজন্ম লালন-পালন করে বড় করা সম্ভব হয় না। কারণ, খাবার তৈরী করতে, দানাদার মধুকে তরল করতে, এবং পরাগ থেকে রয়াল জেলি বানাতে পানির দরকার (দানাদার মধুওয়ালা চাকের মৌমাছিরা সাধারণতঃ মারা পড়ে)।

১৯১২ সালে মৌমাছিদের পানীয় সম্পর্কে ন. ই. নেভ্স্কি লিখেছেন, 'মৌমাছি পালন সংক্রান্ত রুশী নথিপত্রের কোথাও এই সমস্যা নিয়ে কোন রচনা এমনকি আদৌ উল্লেখযোগ্য কোন লেখাও আপনি পাবেন না। শুধু তাই নয়, মৌমাছি পালন সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতেও পানীয় সম্পর্কে কিঞ্চিত্তম মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত

হয় নি। মৌমাছি শালায় কোন আয়তাধার, টব, ব্যারেল কিংবা লোনা জলে পানীয়-গামলা রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে ন্যূনতম পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও সেগুলোতে লক্ষগোচর হয় না। কিন্তু আমাদের বিদেশী মৌমাছিপালক বন্ধুরা অনেক আগেই পানীয় জলের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।'

'পার্ক' ও 'লেন্ডি'কে উদ্ধৃত করে এ. আই. রুট উল্লেখ করেছেন যে, মৌমাছি দৈনিক সাত থেকে পনেরো বার উড়ে যায় সুধা আহরণের জন্য, বার কয়েক কম ওড়ে পরাগের জন্য আর ১০০ বার পর্যন্ত ওড়ে পানির জন্যে। তাপমাত্রা কমে গেলেও (৬ থেকে ৮ ডিগ্রী সে.) জলবাহক মৌমাছি পানির খোঁজে মৌচাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং সেজন্য মারা যায়। এভাবে পানির অভাবে মৌমাছি-কলোনীর সমস্ত গ্রীষ্মকালীন মৌমাছি দু-এক দিনের মধ্যেই সাবাড় হয়ে যায়।

মৌমাছি প্রতিদিনই বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য পানি আনে। তরুণ মৌমাছিরা যদি কয়েক দিন পানি না পায় তবে তারা মারা পড়ে। এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে, পানির অভাবে মৌমাছিরা কুঠরি থেকে শূককীটদের টেনে বের করে ফেলেছে।

বসন্তকালে একটি মৌমাছি বসতিতে দৈনিক প্রায় দুই গ্লাস পানি লাগে। এই পরিমাণ পানি সংগ্রহের জন্য মৌমাছিদের প্রায় ৩০ ০০০ বার মৌচাকের বাইরে যেতে হয়। তাই মৌ-উদ্যানে পানির গামলায় ১ লিটার পানি রাখার অর্থ হল পানির খোঁজ করা থেকে ৬০ ০০০ মৌমাছির কাজ বাঁচিয়ে সুধা ও পরাগ সংগ্রহের কাজে তাদেরকে লাগানো। তা ছাড়া বসন্তে এবং গ্রীষ্মের গরম দিনগুলোতে ভিস্তি মৌমাছিরাই যে শুধু মৌচাকে পানি সরবরাহের কাজে লিপ্ত থাকে তা নয়, 'জলাধার' মৌমাছিদেরও এ কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এটা এখন স্থির হয়ে গেছে যে, জলবাহকরা মৌচাকে ফিরে এসে চাকের কুঠরিতে পানি ঢেলে রাখে না বরং 'জলাধার' বা চৌবাচ্চা-মৌমাছিদের কাছে তা তুলে দেয়।

কিয়েভের গলোসিভ পরীক্ষামূলক মৌমাছি-খামারে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পানীয় জলের গামলায় করে বিশুদ্ধ ও লবণাক্ত জল দেওয়া হলে ৪৭·৩ শতাংশ মৌমাছি বিশুদ্ধ জল গ্রহণ করে এবং ৫২·৭ শতাংশ মৌমাছি লবণাক্ত জল নেয়। ০·৫ শতাংশ লবণাক্ত দ্রবণ নিতে

তারা একটুও দ্বিধা করে নি কিন্তু ১ শতাংশ দ্রবণ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

১৯৫৮ সালে ডা: এল. সেইফার একটি কৌতূহলজনক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৌমাছিদের শুধু যে বিশুদ্ধ জলের দরকার পড়ে তা নয়, লবণ, অ্যামোনিয়া ইত্যাদিযুক্ত জলের প্রয়োজনই তাদের বেশি। পরীক্ষাটিতে পানীয় জলের কিছু গামলায় বিশুদ্ধ জল এবং ০·২৫ শতাংশ অ্যামোনিয়াম, ০·০৫ শতাংশ ভিনিগার এবং ০·৮০ শতাংশ সাধারণ লবণ মিশ্রিত জল একের পর এক রাখা হয়েছিল। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৫৪৬ টি মৌমাছি লবণ মেশনো জলের কাছে আসে, বিশুদ্ধ জলের কাছে আসে ১৫১০ টি, অ্যামোনিয়া-জলের কাছে আসে ১৪৪২ টি এবং ভিনিগার-জলের কাছে আসে ১১৮৬ টি। এ থেকে বোঝা যায় যে, মৌমাছির লবণ-জলের দরকার।

যে-সব মৌমাছি পালক তাদের ছোট্ট পাখাওয়ালা এই সব বন্ধুদের মমতা ও যত্ন দিয়ে প্রতিপালন করেন তারা তাদের নিয়মিত লবণ-জলের জোগান দিয়ে থাকেন (এক বালতি জলে ৫০ গ্রাম সাধারণ লবণ)।

সেরবিনভ (১৯১৩), জান্ডের (১৯২৭) এবং অন্যান্যদের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ পানীয় জলের মাধ্যমেই মৌমাছিদের রোগ (ফাউল ব্রুড) বিস্তার লাভ করে। তাই পানীয় জলের একটা ভালো ও সুবিধাজনক গামলা যে-কোন আধুনিক ও সুসজ্জিত মৌমাছিশালার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মধু ও তার গুণ

সময় যায়নি বয়ে খুব বেশি দূর
এসেছিল মৌমাছি সরব গুঞ্জনে
মধু ভারানত দেহে চঞ্চল গতি,
সাতখানা পিপা হাতে ছিল তার
পিপাগুলো বয়েছিল কাঁধে
মধু আর সুগন্ধ নির্যাসে ভরা
যাদুকরী গুণময়া সৌরভ মাখা।
— কালেভালা

মৌমাছিরা মধু বানায় কী ভাবে

গ্রীষ্মের আলোভরা দিনগুলোতে আমরা মৌমাছিদের ফুলে ফুলে উড়তে এবং বিন্দু বিন্দু সুধা আহরণ করতে দেখি। একশ গ্রাম মধু তৈরী করার জন্য অনুসন্ধানী মৌমাছি প্রায় দশ লক্ষ ফুলে বিচরণ করে। শুঁড় দিয়ে ফুলের সুধা চুষে নিয়ে মৌমাছি 'মধু পাকস্থলী' (যদিও সত্যিকারভাবে তা পাকস্থলী নয়) পূর্ণ করার পর মৌচাকে ফিরে আসে।

এক কিলোগ্রাম মধু তৈরী করার জন্যে অনুসন্ধানী মৌমাছিকে অবশ্যই ১২০ ০০০ থেকে ১৫০ ০০০ বোঝা সুধা বয়ে আনতে হয়। মৌচাক থেকে ফুলের অবস্থান ১৫০০ মিটার দূরে হলে প্রত্যেকটি বোঝার জন্য তাদের উড়তে হয় তিন কিলোমিটার। এভাবে এক কিলোগ্রাম মধুর জন্যে তাদের সর্বমোট উড়তে হয় ৩৬০ ০০০ থেকে ৪৫০ ০০০ কিলোমিটার দূরত্ব (পৃথিবীর পরিধির আট থেকে এগার গুণ দূরত্ব)। একটি মৌমাছি বসতি এক মরশুমে ১৫০ কিলোগ্রামের মত মধু আহরণ করে।

অনুসন্ধানী মৌমাছিরা মৌচাকে ফিরে আসার পর (প্রবেশমুখ ও

প্রহরারত সান্ত্রীদের অতিক্রম ক'রে) গৃহে অবস্থান রত অন্যান্য কর্মী মৌমাছি তাদের অভ্যর্থনা জানায়। গৃহী মৌমাছিরা তাদের বোঝামুক্ত করে তা কিছুক্ষণ নিজেদের মধুপাকস্থলীতে রেখে দেয়। সেখানে সুধাতে এক জটিল প্রক্রিয়া চলে যার শুরু অনুসন্ধানী মৌমাছির পাকস্থলীতে। গৃহী মৌমাছি সুধার প্রক্রিয়ার কাজ যেভাবে চালায় তা নিম্নরূপ। মৌমাছি তার মুখের অংশ অর্থাৎ নীচের চোয়াল পাশের দিকে খুলে শুঁড় দুটো সামনে পেছনে একটুখানি প্রসারিত করে। এর ফলে এক বিন্দু সুধা শুঁড়ের মাথায় এসে জমা হয় এবং মৌমাছি শুঁড় ভেতরে নিয়ে তা নিজের মধু পাকস্থলীতে রাখে। এভাবে সুধা উগ্রে দেওয়া ও গিলে ফেলার কাজ চলে ১২০ থেকে ২৪০ বার। তারপর কোন খালি খোপ খুঁজে নিয়ে গৃহী মৌমাছি তাতে নিজের সুধাটুকু জমা করে রাখে। তখনও কিন্তু তা মধুতে পরিণত হয় না। অন্যান্য কর্মী মৌমাছি এরপর সুধাকে মধুতে পরিণত করার জটিল কাজটি চালিয়ে যায়।

গৃহী মৌমাছিরা খুব কর্মব্যস্ত থাকলে অনুসন্ধানীরা নিজেরাই তাদের বোঝাটুকু (সুধাবিন্দু) খোপের উপরের প্রাচীরে লাগিয়ে রাখে। ব্যাপারটা শুধু চমকপ্রদ নয়, কার্যক্রমের দিক থেকেও সবচেয়ে বাস্তব। কারণ এভাবে রাখা ঝুলন্ত বিন্দুগুলো তলায়তন বেশী পায়, ফলে জলীয় ভাগের বাষ্পীভবনেও সুবিধা হয় বেশি। সুধায় জলীয় অংশের পরিমাণ শতকরা ৪০ থেকে ৮০ ভাগ এবং তাকে মধুতে পরিণত করতে হলে কখনো কখনো তার তিন চতুর্থাংশ জলীয় অংশ দূর করতে হয়। পাকা মধুতে জলীয় অংশের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ থেকে ২০ শতাংশ। প্রত্যেকটি সুধাবিন্দু এক খোপ থেকে অন্য খোপে বার বার করে বয়ে নিয়ে কর্মী মৌমাছিরা একটানা বাষ্পীভবন চালিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করে। কাঁচা সবুজ মধু ঘন মধুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এ রকম চলে। সুধা থেকে জলীয় অংশ দূর করার কাজে অন্যভাবেও অনেক মৌমাছি কাজ করে। পাখা দিয়ে বাতাস করে (মিনিটে ২৬৪০০ বার) মৌচাকে অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা তাদের কাজ। এভাবে বিশুদ্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শুধু সুধা ঘনীভূত হয় না, মৌমাছির মধু পাকস্থলীতে থাকা অবস্থায়ও তার ঘনীভবনের কাজ চলে। অধ্যাপক ই. আ. কাবলুকভ মনে করেন, মধু পাকস্থলীর কোষগুলির মাধ্যমে সুধা থেকে জলীয় অংশ পরিশোষিত হয়ে তা রক্তের লসিকা রসের সাথে

মিশে যায়। তারপর বৃক্ক হিসাবে কার্যরত ম্যালপিজি নালিকায় গিয়ে তা দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। মৌমাছির দেহের ভেতরেই এভাবে সুধা-বিন্দু আয়তনে কমে যায়। উপরন্তু সেখানে তা উৎসেচক (এনজাইম), জৈব অম্ল, জীবাণুনাশক এবং অন্যান্য পদার্থে সমৃদ্ধ হয়। মধু পাকস্থলী থেকে সুধা-বিন্দু খোপে স্থানান্তরিত করা হলেও মধুতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার অব্যাহত পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।

মধুকোষের খোপগুলো মধুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে মৌমাছি মোম দিয়ে সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দেয়। এভাবে মজুত করা মধু বছরের পর বছর ভালো থাকে। মৌমাছিরা নিজেরাই প্রাকৃতিক পন্থায় মোড়কবদ্ধ করে বলে চাকের মধু স্বাদেগন্ধে সবচেয়ে চমৎকার হয় (আর সাধারণতঃ এর দামও পড়ে বেশি)।

নানা রকমের মধু

একই জাতের ফুল থেকে সুধা সংগ্রহের সুযোগ করে দিলে মৌমাছিরা ঠিক তাই করে। ফলে এভাবে বানালে মধু কমবেশি একই রকমের হয়ে থাকে। যে জাতের উদ্ভিদ থেকে মধু সংগৃহীত হয় তার নাম অনুসারেই মৌমাছিপালক মধুর নামকরণ করেন (যেমন, লিন্ডেন, বাকউইট ইত্যাদি)। মধুতে মধুতে পার্থক্য নানারকম হতে পারে। তবে প্রধানতঃ মধু এ কয় জাতের: ফুল থেকে পাওয়া পুষ্পমধু; সংগ্রহের এলাকা অনুসারে আঞ্চলিক মধু; প্রযুক্তিজাত মধু। মধুর উপাদানের উৎস অনুসারে মধুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: পুষ্পমধু ও বৃক্ষনির্যাস মধু (Honey-dew honey)। পুষ্পমধু একপুষ্পক কিংবা বহুপুষ্পক হতে পারে। সুধাময় উদ্ভিদের প্রধান কোন জাতের উদ্ভিদের সুধা থেকে একপুষ্পক মধু তৈরী হয় (বাকউইট, লিন্ডেন বা লাইম, সাদা অ্যাকাশিয়া, উইলো বীরুৎ, সূর্যমুখী, sainfoin ইত্যাদি); বহুপুষ্পক মধু তৈরী হয় বিভিন্ন উদ্ভিদের সুধা থেকে। একেবারে পুরোপুরি একপুষ্পক মধু পাওয়া দুষ্কর। তবে কোন মধুতে নির্দিষ্ট উদ্ভিদের সুধার প্রাধান্য থাকলে সেই মধুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে সেটাই। যেমন, লিন্ডেন মধুতে থাকে লিন্ডেন কিংবা লাইম গাছের সুধা। কোন নির্দিষ্ট

জাতের মধুতে যে বিশেষ সৌরভ, রং ও স্বাদ থাকে, অন্য কোন উদ্ভিদের সামান্য সুধায় তার খুব একটা পরিবর্তন হয় না। নিম্নলিখিত মধুগুলো বহুপুষ্পক মধুর শ্রেণীভুক্ত: তৃণভূমির মধু, স্তেপ কিংবা প্রেইরী মধু, বুনো মধু, ফল বা ফল বাগানের মধু, পার্বত্য-তাইগা মধু ইত্যাদি।

রূপ, গন্ধ ও স্বাদ অনুসারেই প্রায়শঃ মধুর গুণ বিচার করে হয়ে থাকে। সৌরভ, রঙ ও রুচিকর আস্বাদ অনুযায়ীও তার জাত নির্ধারণ করা যায়। তিন রকমের মধু চেনা যায় রঙ দেখে: হালকা, মাঝারি ও কালচে রঙের। অনেক মধুর পার্থক্য শুধু রঙে নয়, রঙের মাত্রাতেও। এ রকম মধু কম নয়। কয়েক জাতের মধু আছে যাদের কোন রঙই নেই। সেগুলো দেখতে আলোর মত রঙহীন ও জলের মত স্বচ্ছ। এ ধরনের মধুর চাকের দিকে তাকালে মনে হবে তা একদম খালি (যেমন, সাদা অ্যাকাশিয়া)। বয়মভর্তি অবস্থায় এ মধু অর্ধস্বচ্ছ দেখায়। সাধারণতঃ হাল্‌কা রঙের মধুই সবচেয়ে ভাল। আ. ই. রুট বলেছেন, সবচেয়ে ভালো মধু 'জলের মত স্বচ্ছ'। কথাটা খুব যথাযথ না হলেও কাজের বেলায় মোটামুটি খাটে। এখানে অবশ্য একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। অনেক রচনায় বলা হয়েছে, কাল্‌চে মধুতে প্রচুর খনিজ দ্রব্য প্রধানতঃ লৌহ, তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে বলে জীবদেহের জন্য তা অধিকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। সৌরভ অনুসারেও মধুর জাত নির্ণয় করা যায়। কোন কোন জাতের মধুতে অসাধারণ রুচিকর, মনোহর সুগন্ধ রয়েছে। গোগোল-এর রুদি পাংকোর কথায়: '...আমি হলফ করে বলতে পারি, আপনি কিন্তু অন্য কোন গ্রামে এর চেয়ে ভালো মধু পাবেন না। ভাবুনতো একবার, মধুকোষ ঘরে আনা মাত্রই সারা ঘর সুগন্ধে এমন ম'ম করবে, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এ একেবারে চোখের জলের মত পরিস্কার। কিংবা বলতে পারেন কানের দুলের দামী স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।[৫]

চমৎকার সুগন্ধি মধু (লেরু, অ্যাকাসিয়া, লিন্ডেন ইত্যাদি) ছাড়াও এমন অনেক মধু আছে যেগুলিতে অরুচিকর দুর্গন্ধ থাকে (তামাক ও অন্যান্য)।

এলাকায় মধুর সরবরাহ কমে যাওয়ায় ১৯৪৮ সালে উলিয়ানভস্ক প্রদেশের রাদিশ্চেভ জেলার লেনিন যৌথখামারের মৌমাছিশালায় মৌমাছিদের চিনি খেতে দেওয়া হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া ঐ মধুতে ছিল কেরোসিনের গন্ধ। ঐ চিনির সিরাপ খাওয়ার পর প্রথমদিন মৌমাছিদের ঝাঁকে ঝাঁকে মেরামত কারখানার আশে পাশে উড়তে দেখা গেল। পুরো দুটো দিন তারা কেরোসিনের গন্ধে উত্তেজিত হয়ে ঠিক ঐ গন্ধের সুধারে খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রইলো।

এর পরদিন মৌমাছিদের লাইলাকের সুরভিত সিরাপ খেতে দেওয়া হল। দেখা গেল দলে দলে তারা লাইলাকের ঝাড়ে গিয়ে বসছে, অন্যান্য উদ্ভিদের কাছে তারা প্রায় গেলই না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এ রকম: মৌমাছিদের কোন বিশেষ গন্ধে অভ্যস্ত করতে খুব একটা সময় লাগে না। আরো একটা ব্যাপার স্পষ্ট হল। বিশেষ ধরনের সুরভিত সিরাপ পান করার পর মৌমাছিরা শুধু যে সেই সৌরভময় সুধা সংগ্রহ করে তা নয়, তাদের সঙ্গীদেরও লাগিয়ে দেয় তার খোঁজে।

মৌমাছিদের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে মৌমাছি পালকরা এর সুযোগ নেন। কোন বিশেষ উদ্ভিদের সুধার খোঁজে আরো বেশি সংখ্যায় মৌমাছিকে প্রণোদিত করানো এই প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য। পর-পরাগায়নও তাতে বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু এই পন্থায় মৌমাছিপালক মৌমাছিদের কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং ব্যাপক পরাগায়নের জন্য ইচ্ছেমত উদ্ভিদের কাছে মৌমাছিদের পাঠাতে পারেন।

প্রশিক্ষণের পদ্ধতি এই রকম: যে ফুলের কাছে মৌমাছিদের পাঠানো হবে সেই ফুলের সৌরভ মেশানো শতকরা ৫০ ভাগ চিনিযুক্ত ১০০ গ্রাম সিরাপ মৌমাছিদের খেতে দিতে হবে, পাঠানোর আগের দিন সন্ধ্যায় কিংবা ঐ দিন সকালে।

সুগন্ধি সিরাপ তৈরী করা খুবই সহজ। ১০০ গ্রাম সিরাপের জন্য ৫০ গ্রাম চিনিকে ১০০ ঘন সেন্টিমিটার ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করতে হবে। সিরাপ ঠাণ্ডা হবার পর বাঞ্ছিত সৌরভের ২৫ গ্রাম ফুল তাতে দু'ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। আঁটো-সাটো ঢাকনাওয়ালা কাঁচের অথবা এনামেলের পাত্র ব্যবহার করা দরকার যেন সুগন্ধ উবে না যায়। ফুলের

বৃতির গন্ধ ফুলের সৌরভের চেয়ে ভিন্নতর বলে আগে ভাগেই ফুল থেকে তা আলাদা করে নেওয়া উচিত।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, গন্ধের পার্থক্য বোঝার খুব সূক্ষ্ম বোধশক্তি মৌমাছির রয়েছে। তাই সিরাপের বিশুদ্ধতার উপর প্রশিক্ষণের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং ব্যবহৃত ফুলের সৌরভে কিংবা সিরাপের মধ্যে বাইরের অন্য কোন গন্ধ থাকা চলবে না।

সবচেয়ে ভালো পন্হা হচ্ছে, দিনের বেলা সিরাপ তৈরী করে সারা রাত তাতে ফুল ডুবিয়ে রাখা এবং খুব ভোরে মৌমাছিরা সুধার তালাশে বের হবার আগেই তা মৌচাকের ভেতরে রেখে দেওয়া। সিরাপসহ আহারের পাত্রটি ফ্রেমের উপর রাখতে হয় (দ্রুত পদ্ধতিতে মধু সংগ্রহের ব্যাপারটি চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত)। সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের ফুল ফোটার পুরো মওসুম ধরে যদি এভাবে সিরাপ দেওয়া হয় তবে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। ভোর বেলা সুগন্ধি সিরাপের স্বাদ পাওয়া মাত্রই সন্ধানী মৌমাছিরা ঐ সৌরভময় উদ্ভিদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ফুলের সুগন্ধ তাদের কাছে এক ধরনের সংকেত হিসেবে কাজ করে। উদ্ভিদের কাছ থেকে মৌচাকে এবং মৌচাক থেকে উদ্ভিদে উড়ে যাওয়ার পথে তারা বাতাসে ঐ সুগন্ধময় নিশানাপথ তৈরী করে যায়।

মধুর রাসায়নিক উপাদান ও পুষ্টিক্ষমতা

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় আশি রকমের বিভিন্ন পদার্থ মধুতে থাকলেও মধুর মূল উপাদান হল চিনি (গ্লুকোজ এবং লেভিউলোজ বা ফ্রুক্টোজ)। গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ হল একশর্করা (monosaccharide) যা খুব সহজেই জীবদেহে আত্তীকৃত হয়। ইক্ষু ও বীটচিনির মত দ্বি-শর্করা (Disaccharide) রক্তে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আগে স্যাকারেজ (Saccharase) বা বিপরীতক (invertase) এনজাইমের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অন্ত্রনালীতে আর্দ্রবিশ্লেষণ (hydrolysis) প্রক্রিয়ায় বিদীর্ণ হয়ে থাকে। বিদীর্ণ হওয়ার পর গ্লুকোজ ও লেভিউলোজ যকৃৎ শিরা দ্বারা পরিশোষিত হয়। এখান থেকে তা যকৃতে যায় এবং জমা থাকে। পরে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গেলে তা আবার রক্তে ফেরৎ আসে। একক শর্করা কোন রকম রূপান্তর ছাড়াই অন্ত্র থেকে সরাসরি রক্তে চলে

যায়। আর গ্লুকোজ সরাসরি রক্তে অন্তর্বিদ্ধ (inject) করা যায় বলে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তা করা হয়ে থাকে*।

অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের জন্য যে পরিমাণ শক্তির দরকার তার অর্ধেকেরও বেশি আসে আমাদের খাদ্যের মধ্যেকার শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে। শর্করা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি কমিয়ে দেয়। এ দিক থেকে মধু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বিশুদ্ধ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের প্রায় পুরোটাই এতে রয়েছে। দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক ক্রীড়াবিদ তাই খেলাধুলো ও প্রতিযোগিতার আগে এবং ক্রীড়া তৎপরতার মাঝখানে মধু খেয়ে থাকেন। দ্রুত শক্তি গড়ে তোলা দরকার এমন বৃদ্ধ ও শিশুদেরকেও ডাক্তাররা মধু খাবার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

সাধারণ শর্করা ছাড়াও মধুতে এমন বেশ কিছু এনজাইম (উৎসেচক) ও অন্যান্য পদার্থ রয়েছে যা জীবকোষ, কোষকলা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চাহিদা মেটায়। জীবন্ত দেহের আওতায় যে সব এনজাইম থাকে তা ঔষধ বিক্রেতার কাছে লভ্য সাধারণ বিকারকের চাইতে অনেক অনেক সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জলের সাথে ১৭০° সে. তাপমাত্রায় সীলবদ্ধ টিউব কিংবা নির্বীজক যন্ত্রে (autoclave) উত্তপ্ত করে শ্বেতসারের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটানো যায়; আবার একই ফলাফল পাওয়া যায় আরও কম তাপমাত্রায় শ্বেতসারের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশিয়ে; এমন কি এর চাইতেও ভাল ফল পাওয়া যায় যদি টায়ালিন (ptyalin) অর্থাৎ মুখের লালার একটি এনজাইম যোগ করা যায়। ১০০° সে. তাপমাত্রায় চর্বির সাথে ক্ষার মিশিয়ে ফোটানো হলে তা সাবানে রূপান্তরিত হয়; শরীরের ভেতরে লাইপেজ (Lipase)-এর সাহায্যে দেহতাপেই সাবানীকরণ হয়ে থাকে। আধ্যাপক ভি. এন. বুকিন লিখেছেন, 'খাদ্য সরবরাহ যতই থাকুক না কেন এনজাইম না হলে অঙ্গ-

---

* গ্লুকোজ উদ্ভিদের স্বাভাবিক উপাদান। সালোকে সংশ্লেষণের ফলে এর উৎপত্তি। কাঠামোকল্পনার মাধ্যমে তা এভাবে দেখানো যেতে পারে: COO ভেঙ্গে হয়েছে $C+H_2O \longrightarrow CHHO$ (ফরমালডিহাইড) এবং O_2, যা বায়ুতে মিশে যায়। ফরমালডিহাইডের ছয় ভাগ রাসায়নিক ভাবে যুক্ত হয়ে গ্লুকোজ তৈরী করে।

প্রত্যঙ্গ শ্রান্তিতে ক্ষয়ে মরে যাবে। কারণ, ঐ খাদ্যের আত্তীকরণ করা সম্ভব হবে না। বায়ুহীন শূন্যতায় যেমন করে শ্বাসরোধ হয়, এনজাইমের অভাব ঘটলে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের আবহের মধ্যেও তেমনিভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্বাসরোধ ঘটবে।' এনজাইমের সামান্য একটি মাত্রার কার্যকারিতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এখানে পারক্সিডেজ (peroxidase) এনজাইমের কথা উল্লেখ করা যায়। অ্যাকাডেমিশিয়ান A. Bach ঝালকন্দ (horseraddish) থেকে এই এনজাইম পেয়েছিলেন। বিশ কোটি ভাগের এক ভাগের মত নীচু মাত্রায় ঘনত্বেও এটি সক্রিয় থাকে।

মধুতে নিম্নলিখিত এনজাইমগুলো পরিলক্ষিত হয়: ডায়াস্টেজ, ইনভারটেজ, স্যাকারেজ, ক্যাটালেজ, পারক্সিডেজ ও লাইপেজ। অন্যান্য সব খাদ্যের তুলনায় সর্বাধিক মাত্রায় এনজাইমের উপস্থিতির দিক থেকে মধু অন্যতম। শ্বেতসার ও ডেক্সট্রিন (শ্বেতসার আঠা) ডায়াসটেজ (কিংবা এমাইলেজ) কে শর্করায় রূপান্তরিত করে; স্যাকারেজ বীট ও ইক্ষু চিনিকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিবর্তিত করে; আর ক্যাটালেজ পারক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করে। জার্মান লেখক Enoch Zander-এর মত কোন কোন লেখক মধুর মধ্যেকার এনজাইমকেই তার চমৎকার গুণাগুণের কারণ বলে মনে করেন। Zander বলেন, মৌচাকে গ্রীষ্মের মৌমাছিদের আনা প্রাণহীন বস্তুকে এনজাইম জীবন্ত পদার্থে পরিণত করে। তারপর তা মৌমাছির দেহের বাইরে কর্মতৎপর হয়, পরিপক্কতা পায় ও মারা যায়।

সুইস পরিক্ষামূলক স্টেশনের মৌচাষ বিভাগে কর্মরত Dr. Anna Mauririo-ও বিশ্বাস করতেন যে, মৌমাছিরা চাকে মধু সীলবদ্ধ করার পরও এনজাইমের প্রক্রিয়া বন্ধ হয় না বরং কোষে মজুত অবস্থায়ও তা অব্যাহত থাকে। সুইজারল্যান্ডের একটি পুরোনো বাড়ীতে মৌমাছিদের সংগ্রহ করা ১৮৯৫ সালের মধু পাওয়া যায়। ঐ মধু যখন বিশ্লেষণ করে দেখা হয় তখন তা প্রায় ষাট বছরের পুরোনো। ক্রোম্যাটোগ্রাম (পৃথকীকরণ যন্ত্র) থেকে প্রত্যাশিত ফলাফলই পাওয়া যায়: তাতে ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজের সুস্পষ্ট চিহ্ন, আর্দ্রবিশ্লেষণহীন চিনির ঈষৎ নিদর্শন এবং মলটোজ ও ওলিগোসাকারাইড (স্বল্পশর্করা) বর্গের বৈশিষ্ট্যগত চিহ্ন বর্তমান।

মধুর মধ্যে অন্যান্য যে-সব উপাদান থাকে সেগুলি হল: ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ক্লোরিন, ফসফরাস, গন্ধক ও আয়োডিনের লবণ। কোন কোন জাতের মধুতে রেডিয়ামও থাকে। ঐ সব লবণের কোন কোনটির শতকরা হার মানুষের রক্তরসের মধ্যেকার ঐ হারের অনুরূপ (সারণী-১ দেখুন)।

সারণী-১

উপাদান	মানব রক্ত (পালাডিনের অনুসরণে)	মধু (শেরমানের অনুসরণে)
ম্যাগনেসিয়াম	০·০১৮	০·০১৮
সালফার	০·০০৪	০·০০১
ফসফরাস	০·০০৫	০·০১৯
লৌহ	অত্যল্প	০·০০০৭
ক্যালসিয়াম	০·০১১	০·০০৪
ক্লোরিন	০·৩৬০	০·০২৯
পটাসিয়াম	০·০৩০	০·৩৮৬
আয়োডিন	অত্যল্প	অত্যল্প
সোডিয়াম	০·৩২০	০·০০১

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের E. S. Przhevalsky ল্যাবরেটরিতে বাক-উইট মধু ও বহুপুষ্পক মধুর বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে, সেগুলির মধ্যে এ্যালুমিনিয়াম, বোরন, ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা, লিথিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, অসমিয়াম, সিলিকন, টিন, টাইটেনিয়াম ও দস্তার লবণ রয়েছে।

মানব দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য খনিজ লবণের গুরুত্ব অপরিসীম। খনিজ লবণের ঘাটতিযুক্ত অথচ আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ পদার্থ ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রণালীবদ্ধভাবে সরবরাহ করে দেখা গেছে যে,

এর ফলে পরীক্ষা-প্রাণীরা মারা যায়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, জীবদেহে অত্যাণুমাত্রায় যে অণুমৌল ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় সে সবের গুরুত্বপূর্ণ জীবজ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, বহুসংখ্যক এনজাইম, ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) ও হরমোনের (অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরস) সাথে এদের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনশীলতা, কোষকলার শ্বসন, রক্তসংবহন ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। বয়সের সাথে সাথে বিপাক ক্রিয়ায় পরিবর্তন সূচীত হয় বলে রক্তে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোবাল্ট, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, দস্তা ইত্যাদির মত জৈবিক গুরুত্বপূর্ণ অণুমৌলেরও পরিমাপগত তারতম্য ঘটে। খাদ্যে, বিশেষ করে মধুর মাধ্যমে এ সব গ্রহণ তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উপরন্তু, মধুতে কিছু কিছু জৈব অম্লও থাকে। Enoch Zander লিখেছেন, মধুতে অম্লের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিরর্থক বহু কথা বলা হত। কোষের মধ্যেকার মধু মোমবদ্ধ করার আগে সংরক্ষণের জন্য মৌমাছিরা তাতে যে ফরমিক এসিড অন্তর্বিদ্ধ করে দেয়, তা মধুতে অম্ল উপাদানের উপস্থিতির কারণ বলে সাধারণ ধারণা ছিল। মধুতে প্রধানত যে সব জৈব অম্ল থাকে তার মধ্যে ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, টার্টারিক এসিড ও অকজালিক এসিড সবচেয়ে বেশি থাকে।

এ ছাড়াও মধুতে ভিটামিন, আমিষ, এফিলিট কোলিন, হরমোন, এণ্টিবায়োটিক (জীবাণু প্রতিরোধী পদার্থ), ফাইটন্ সাইড (উদ্ভিদ নাশক) ও অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ থাকে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভ. প. ফিলাটোভ ভেবেছিলেন যে মধুতে জীবজনিক (biogenic) উদ্দীপক তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপকে তীব্রতর করার মত পদার্থ আছে। ল্ভভ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরু উদ্যানে পরীক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বায়োসিস (bioses) নামে শরীরবৃদ্ধির অনুকূল একরকম পদার্থ মধুতে রয়েছে। গাছের কাটা ডাল মধু-মেশানো জল লাগিয়ে রোপণ করে দেখা গেছে যে তা দ্রুত শিকড় বিস্তার করে এবং ভাল ভাবেই বেড়ে ওঠে।

মধুর যে পুষ্টিকর গুণাগুণ, তা অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উচ্চ প্রশংসিত হয়ে আসছিল। তবে মাত্র ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগেই কেবল তা বিজ্ঞানের সমর্থন লাভ করেছে। মধুর

ক্যালরিমূল্যে উঁচু মানের। এক কিলোগ্রাম মধুতে ক্যালরির পরিমাণ ৩১৫০-৩৩৫০ (জলীয় উপাদনের উপর নির্ভর ক'রে)। তুলনা করলে দেখা যাবে, এক লিটার খাঁটি গরুর দুধে ৬২০ ক্যালরি, এক লিটার সর-তোলা দুধে ৩১০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম রাই রুটিতে ২০৪০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম টাটকা ভোজ্য ব্যাঙের ছাতায় ২৭০ ক্যালরি, শ্বেতসাগরের এক কিলোগ্রাম নাভাগা মাছে ৬২০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম চর্বিহীন গোমাংসে ৭৪০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম কাস্পিয়ান শুটকী মাছে ৮৫০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম আপেলে ৪০০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম কমলালেবুতে ২৩০ ক্যালরি, এক কিলোগ্রাম শশায় ১৪০ ক্যালরি পাওয়া যায়। তবে শক্তির উৎস হিসেবে শুধু যে খাদ্যই আমাদের দরকার তা নয়। যেমন ধরুন, যখন ভিটামিন, এনজাইম বা অন্যান্য পদার্থ জীবদেহে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় তখন তা থেকে কোন ক্যালরিই পাওয়া যায় না। অথচ খাবারের সে গুলোই হল ভিত্তিমূলক উপাদান, যা না হলে জীবদেহ বাঁচতে পারে না। চিনির সাথে মধুর তুলনা করলে দেখা যায়, চিনিতে শুধু শ্বেতসারই থাকে আর তা থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুধু অন্তঃসারশূন্য ক্যালরিই পায়। পক্ষান্তরে মধুতে রয়েছে আশিটিরও বেশি বিভিন্ন পদার্থ যা স্বাভাবিক বিকাশ ও কর্মতৎপরতার জন্য দরকারী।

মধুর ভেতরকার ভিটামিন

ভিটামিন শুধু যে খাদ্যের অপরিহার্য উপাদান তা নয়, অনেকগুলি ভিটামিন আবার ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বেরিবেরি, দিনকানা, পেলাগ্রা, রিকেট ও স্কার্ভির মত মারাত্মক রোগকে ভিটামিনই আয়ত্বে এনেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য প্রখ্যাত প্রাণ-রসায়নবিদ অধ্যাপক A. Bach লিখেছেন, 'খুব সীমিত ও সুনির্দিষ্ট কার্যকারিতার জন্য অতি সাম্প্রতিক কালে অপ্রধান খাদ্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হলেও জীববিজ্ঞানে ভিটামিনের তাৎপর্য অসাধারণ। শারীরবিজ্ঞান কিংবা প্রাণ-রসায়নের এমন কোন শাখা আজকাল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যা ভিটামিন-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে না। সজীব

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিপাক, সংবেদক অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ, স্নায়ুতন্ত্রের কর্মতৎপরতা, উৎসেচকগত প্রক্রিয়া — জীববিজ্ঞানের এই সমস্ত বিভিন্ন ও মৌলিক পরিসর ভিটামিনের সাথে খুব ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত'। জীবনের উৎপত্তি বিষয়ে বিশ্বপন্ডিত অধ্যাপক A. Oparin-এর মতে, ভিটামিনতত্ত্ব হচ্ছে আধুনিক খাদ্যবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। বস্তুত, ভিটামিন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান ছাড়া আধুনিক প্রাণ-রসায়ন ও শারীবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব বোঝা একেবারেই অসম্ভব।

মধুতে ভিটামিন B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_c, C, E, K ও ক্যারোটিন পাওয়া যায়। এক কিলোগ্রাম মধুতে এগুলির পরিমাণ নিম্নরূপ: ভিটামিন B_2 (রিবোফ্ল্যাভিন) ১·৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামিন B_1 (অ্যানুরিন) ০·১ মিলিগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামিন B_3 (প্যান্টোথেনিক এসিড) ২ মিলিগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামিন B_5 বা PP (নিকোটিনিক এসিড) ১ মিলিগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামিন B_6 (পাইরিডক্সিন) ৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত; ভিটামিন C (এসকরবিক এসিড) ৩০ থেকে ৫৪ মিলিগ্রামের কম নয়। তালিকাবদ্ধ এই পরিমাণ সামান্য হলেও জীবদেহের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধুর মধ্যেকার অন্যান্য জিনিষ যেমন, কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার-শর্করা), খনিজ লবণ, অণুমৌল, জৈব অম্ল, এনজাইম ইত্যাদির সাথে এ সব ভিটামিন একত্রে যুক্ত অবস্থায় রয়েছে। মধুতে ভিটামিনের পরিমাণ এর মধ্যেকার পরাগের মিশ্রণের উপর নির্ভরশীল। পরিস্রাবন করে পরাগ নিস্কাশন করা হলে সেই সাথে ভিটামিনও চলে যায়।

সুতরাং মধু শুধু, সুস্বাদু প্রাকৃতিক দান নয়, রোগ প্রতিরোধী একটা শক্তিশালী অস্ত্রাগারও বটে। অন্যান্য ঔষধের সাথে পথ্য হিসেবে যেমন, তেমনি অনেক চিকিৎসাতেও মধু খাওয়া চলে। কিন্তু অন্যান্য অনেক খাবারের তুলনায় (চিনি, জ্যাম ইত্যাদি) সুস্পষ্ট ভাবে সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, হাসপাতাল, স্ব্যাস্থ্যনিবাস, স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র ইত্যাদিতে যতটা মধুর ব্যবহার হওয়া উচিত, ততটা হয় না।

আমরা জানি, প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীকরা শবদেহ সংরক্ষণের জন্য মধু ব্যবহার করত। দ্বাদশ শতকের আরব চিকিৎসক ও পর্যটক আব্দ-আল-লতিফ, গিজেহ্-এর একটি পিরামিডে সীলবদ্ধ পাত্রে মধুতে সুরক্ষিত একটি শিশুর শবদেহ দেখতে পান। মধ্যপ্রাচ্যে এক সামরিক অভিযানের সময় মৃত্যুবরণ করলে মহাবীর আলেকজান্ডারের মৃতদেহ

একটি মধুভর্তি শবাধারে ডুবিয়ে সমাহিত করার জন্যে ম্যাসিডোনিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল বলে জানা যায়। বাইবেলের কালেও এই সংরক্ষণকর গুণের কথা জানা ছিল। খৃীষ্টীয় প্রথম শতকে সম্মানিত ইহুদীদের শবদেহ দীর্ঘকাল সংরক্ষণের জন্য মধুতে রাখা হত বলে উল্লেখ আছে।

মাংস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেও প্রাচীন গ্রীক ও রোমকরা মধু ব্যবহার করত। এতে মাংস ভাল থাকত এবং তার স্বাভাবিক স্বাদগন্ধও বজায় থাকত।

আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, মধু ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে এবং তা ধ্বংস করে দেয়। গুনডেল ও ব্লাটনার[6] হেমোলাইটিক স্ট্রেপটোকক্কাস দ্বারা সংক্রমিত সাদা ইঁদুরের ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ্য করেন। গোজেনবাখ ও হফমান[7] চামড়ার ক্ষতের ভেতর দিয়ে কয়েকটি গিনিপিগের দেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে তারপর ক্ষতে মধুর প্রলেপ লাগান। এই মধু-চিকিৎসায় প্রাণীগুলো বিপদ কাটিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। কোন কোন লেখক (König) মনে করেন, মধুর এই গুণাগুণের মূলে রয়েছে এর মধ্যেকার শর্করা; অন্যদের (Hauduschka, Kaufman) মতে মধুতে যেসব জৈব অম্ল রয়েছে সেগুলিই এই গুণের কারণ; আরো কেউ কেউ (Gündel, Blattner, Helfman) এনজাইম ও শর্করার যৌথ প্রভাবকেই নির্দেশ করেন। মধুতে আলোক সংবেদী ও তাপসংবেদী এন্টিবায়োটিক বা প্রতিরোধকের আবিষ্কার সম্পর্কে Dold[8] প্রমুখের প্রতিবেদন খুবই কৌতূহলজনক। Milan Prica মনে করেন, কর্মী মৌমাছির নিঃস্রাবী ক্রিয়াকলাপের ফলেই মধুতে এন্টিবায়োটিক পদার্থের উৎপত্তি।[9]

অধ্যাপক M. Neshchadimenko ও A. P. Moroz-এর সাথে একত্রে কিয়েভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে বর্তমান লেখক যে পরীক্ষা চালিয়েছেন তাতে দেখা গেছে যে, প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম মধুর তুলনায় 'ত্বরিত পদ্ধতি'তে (চতুর্থ অধ্যায় দেখুন) প্রাপ্ত মধুতে অধিকতর শক্তিশালী জীবাণুনাশক গুণাগুণ রয়েছে[10]। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ৬৩ রকম মধুর মধ্যে দশটি পরীক্ষা করে দেখা হয়। তার মধ্যে ২ নং (ভিটামিন মধু), ১৩ নং (রক্তোৎপাদী মধু), ১৭ নং (মামিন [স্তনদুগ্ধ]-ভিটামিন মধু), ৩৭ নং (কোকো-দুধ-ডিম-ভিটামিন মধু) বিশেষভাবে

সারণী-২

১৩ নং মধুতে বংশ বৃদ্ধির ফলাফল
(রক্তোৎপাদী)

পরিপোষিত-ব্যাকটেরিয়া	দৈনন্দিন জীবাণুতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলাফল							
	১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন	৫ম দিন	৬ষ্ঠ দিন	৭ম দিন	৮ম দিন
স্ট্রেপটোকক্কি	+	+	+	—	—	—	—	—
স্টেফিলোকক্কি	+	+	+	—	—	—	—	—
টাইফয়েড ব্যাসিলাস	+	+	—	—	—	—	—	—
কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াম	+	+	—	—	—	—	—	—
প্যারাটাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াম — A	+	+	—	—	—	—	—	—
প্যারাটাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াম — B	+	+	+	—	—	—	—	—
ব্রেসলাউ	+	+	—	—	—	—	—	—
গার্টনার	+	+	—	—	—	—	—	—
শিগা	+	+	—	—	—	—	—	—
শ্মিটজ	+	+	—	—	—	—	—	—

সারণী — ৩

৩৭ নং মধুতে বংশবৃদ্ধির ফলাফল

(কোকো, দুধ, ডিম-ও-ভিটামিন)

পরিপোষিত-ব্যাকটেরিয়া	দৈনন্দিন জীবাণুতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলাফল							
	১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন	৫ম দিন	৬ষ্ঠ দিন	৭ম দিন	৮ম দিন
স্ট্রেপটোকক্কি	+	+	+	—	—	—	—	—
স্টেফিলোকক্কি	+	+	+	—	—	—	—	—
টাইফয়েড ব্যাসিলাস	+	+	—	—	—	—	—	—
কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াম	+	+	—	—	—	—	—	—
প্যারাটাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াম — A	+	+	—	—	—	—	—	—
প্যারাটাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াম — B	+	+	+	—	—	—	—	—
ব্রেসলাউ	+	+	—	—	—	—	—	—
গার্টনার	+	+	—	—	—	—	—	—
শিগা	+	+	—	—	—	—	—	—
শ্মিট্জ	+	+	—	—	—	—	—	—

সারণী — ৪

নিয়ন্ত্রণ-মধুতে বংশবৃদ্ধির ফলাফল

১৯৩৯ সালে সংগৃহীত দূরপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক লিন্ডেন মধু

পরিপোষিত-ব্যাকটেরিয়া	দৈনন্দিন জীবাণুতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলাফল							
	১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন	৫ম দিন	৬ষ্ঠ দিন	৭ম দিন	৮ম দিন
স্ট্রেপটোকক্কি	+	+	+	+	—	—	—	—
স্টেফিলোকক্কি	+	+	+	+	—	—	—	—
টাইফয়েড ব্যাসিলাস	+	+	+	—	—	—	—	—
কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াম	+	+	+	—	—	—	—	—
প্যারাটাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াম — A	+	+	+	—	—	—	—	—
প্যারাটাইফয়েড ব্যাকটেরিয়াম — B	+	+	+	+	—	—	—	—
ব্রেসলাউ	+	+	+	—	—	—	—	—
গার্টনার	+	+	+	—	—	—	—	—
শিগা	+	+	+	—	—	—	—	—
শ্মিটজ	+	+	+	—	—	—	—	—

+ চিহ্ন দ্বারা বৃদ্ধি ও — চিহ্ন দ্বারা বৃদ্ধির অনুপস্থিতি দেখানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য। এদের বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে, এ সব মধুতে এমন সব পদার্থ আছে যা স্বাভাবিক অবস্থায় জীবাণু বৃদ্ধির উত্তম মাধ্যম (দুধ, ডিমের সাদা অংশ, প্রাণিদেহের রক্ত ইত্যাদি)।

স্ট্রেপটোকক্কাস, স্টেফিলোকক্কাস, টাইফয়েড জীবাণু, প্যারাটাইফয়েড A ও B এবং Breslau, Gärtner, Shiga ও Schmitz-জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা চালানো। চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী পরিপোষিত জীবাণুকে (24-hour culture) এক মিলিলিটার লবণ-দ্রবণে মিশিয়ে মিশ্রতরলের দুই ফোঁটা তিন মিলিলিটার মধুর সাথে যুক্ত করা হয়। সমপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-নমুনাও আলোদা করে নেওয়া হয়। জীবাণুযুক্ত মিশ্রতরল মধুর সাথে সমভাবে মিশিয়ে নিয়ে একটি নির্বীজক যন্ত্র ৩৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় রাখা হয়। আগার প্লেটে, সিরাম আগার প্লেটে ও সুরুয়াতে নমুনাগুলো আট দিন ধরে প্রতিদিন বংশবৃদ্ধির জন্য দেওয়া হল। এভাবে প্রাপ্ত জীবাণু পরিপোষণের নমুনাগুলির (মোট ২০৮০) জীবাণু বৃদ্ধি এরপর পর্যবেক্ষণ করে দেখা হল। পরপর দু'বার এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে একই ফলাফল পাওয়া গেল। ০.০২ শতাংশ ফরমিক এসিডযুক্ত অত্যধিক চিনি (৪ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৩০ শতাংশ লেভিউলেজ) সমৃদ্ধ এবং লবণাক্ত দ্রবণে পুষ্টি সাধনের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটে। পক্ষান্তরে নতুন ধরনের মধুগুলি ও সাধারণ লিণ্ডেন মধুর (নিয়ন্ত্রণ-নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সবগুলোই উঁচু মাত্রার ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণ প্রদর্শন করে। তবে নতুন জাতের মধুগুলোর তুলনায় লিণ্ডেন মধু কম কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। ১৩-ও ৩৭ নং মধু সম্পর্কিত উপাত্ত ২ ও ৩ নং সারণীতে এবং লিণ্ডেন মধুর উপাত্ত ৪ নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি এবং 'ত্বরিত পদ্ধতিতে' প্রাপ্ত ৮৫ টি নতুন মধু থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যাকটেরিয়া বিনাশী গুণাগুণ নিঃসন্দেহে কর্মী মৌমাছির নিঃস্রাবধর্মী ক্রিয়াকলাপের ফল।

মধুর ছত্রাক বিনাশী গুণাগুণ

আমাদের চারিদিকের বাতাসে অসংখ্য ছত্রাক অণুবীজে ভরা। অনুকূল পরিবেশে, যথাযথ তাপে ও আর্দ্রতায় এই সমস্ত অণুবীজ

খাদ্যের উপস্থিতিতে অংকুরিত হয়। ছত্রাকের ক্রমবর্ধমান দেহতন্তু খাদ্যের মধ্যে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত ভেদ করে যায়। ফলে ময়দা, ম্যাকারোনি (রাবরি জাতীয় খাবার), চিনি, জ্যামের মত খাদ্যসামগ্রী এবং সবরকমের সংরক্ষিত খাদ্য, চিনির প্রলেপ বিহীন মিষ্টান্ন, ফল ও পানীয়ের সবাদগন্ধ অরুচিকর হয়ে ওঠে এবং সেগুলির রূপও বিকৃত হয়ে যায়। ছত্রাক গজানোর কারণে যে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী অপচয় হয় সে কথা মনে রেখে আমরা মধুর উপর পরীক্ষা চালাই এবং দেখতে পাই যে তাতে ছত্রাক বিনাশী গুণাগুণ রয়েছে। গিজেহ্-এর পিরামিডে প্রাপ্ত মধুর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ৩৩০০ বৎসরেরও বেশি কাল পার হওয়ার পরেও তাতে মধুর নিজস্ব সৌরভ অক্ষুন্ন ছিল। অভিজ্ঞ মৌমাছিপালকরাও দীর্ঘকাল যাবৎ বলে আসছেন যে, যথাযথভাবে সংরক্ষিত করা হলে, মধুতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর মত ছত্রাক গজায় না।

কিয়েভ খাদ্যবিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছত্রাকবিজ্ঞান পরীক্ষাগারে কর্মরত ফ. কাগানোভা-ইওরিশ আমাদের অনুরোধে মধুর ছত্রাক প্রতিরোধী গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার কাজে তিনি দু'জাতের প্রাকৃতিক মধু (দূর প্রাচ্য থেকে আনা ১৯৩৯ সালের লিণ্ডেন মধু ও ইউক্রেন থেকে আনা ১৯৪০ সালের বাকউইট মধু) এবং 'ত্বরিত পদ্ধতিতে' আমাদের সংগৃহীত ২০ টি নমুনা ব্যবহার করেন। খাদ্য থেকে বিযুক্ত দশ রকমের ছত্রাক সমস্ত নমুনার মধ্যে দেওয়া হয়। সব রকমের আমিষ, শ্বেতসার-শর্করা ও জীবন্ত কোষের পরিপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ (ভিটামিন, খনিজ ইত্যাদি) মধুতে থাকলেও দেখা গেল যে, বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা বরং ছত্রাক ধ্বংস হয়ে গেছে (আমাদের মতে মধুতে ছত্রাক বিনাশী ও ব্যাকটেরিয়া বিনাশী পদার্থের অবস্থানই এর কারণ।[11]

প্রাকৃতিক মধু

কথায় আছে, মৌমাছির মধু মাত্রই মিস্ট। অধিকাংশ প্রাকৃতিক মধুই স্বাদেগন্ধে চমৎকার। সবচেয়ে প্রচলিত মধুগুলো হচ্ছে:

আবখাজিয়ান (Abkhazian) **মধু**: পাহাড়ী মধু দেখুন।

অ্যাকাসিয়া (Acacia) **বা কালো লোকাস্ট** (black locust) **মধু**:

সেরা জাতের মধুগুলোর একটি। পাতলা অবস্থায় স্বচ্ছ; কেলাসিত অবস্থায় তুষারের মত মিহি দানার রূপ নেয়। অ্যাকাসিয়া মধুতে ৩৫·৯৮ শতাংশ গ্লুকোজ এবং ৪০·৩৫ শতাংশ লেভিউলোজ থাকে।* এক হেক্টর জায়গার মেকি অ্যাকাসিয়া বা লোকাস্ট গাছের (Robinia pseudoacacia) সুগন্ধি ফুলের সুধা আহরণ করে মৌমাছিরা ১৭০০ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করে। হলুদ অ্যাকাসিয়ার (caragana arboresceus Lam.) সুধা থেকেও মৌমাছিরা সুধা বানায়। এ জাতের মধুর রং হালকা। কেলাসিত অবস্থায় সাদা রঙের মাঝারি আকৃতির দানা পড়ে, তা দেখতে অনেকটা মোমের মতো। এক হেক্টর জমির পুষ্পময় গাছপালা থেকে মৌমাছি ৩৫০ কিলোগ্রাম মধু আহরণ করে।

আলফালফা (Alfalfa) **মধু**: লুস্যা'ন (lucerne) মধু দেখুন।

অ্যানজেলিকা (angelica.) **মধু**: অ্যানজেলিকা ফুলের (Archangelica officinalis Hoffm) বাগান থেকে এই মধু সংগ্রহ করা হয়। এর সৌরভ ও স্বাদ মনোরম।

আপেল (Apple) **মধু**: ফিকে হলুদ রঙের। সৌরভ অসাধারণ মনোরম ও স্বাদ বেশ মিস্টি। এতে ৩৯·৬৭ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৪২ শতাংশ লেভিউলোজ থাকে। এক হেক্টর পুষ্পিত আপেল গাছ (Pyrus malus L.) থেকে ২০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

বাম (Balm) **মধু**: মেলিসা (melissa) মধু দেখুন।

বারবেরি (barberry) **মধু**: সোনালী হলদে রঙের। মনোরম সৌরভ ও মুখরোচক মিস্টি স্বাদের মধু। ফুলে ভরা বারবেরি ঝোপ (Berberis vulgaris L.) খুঁজে পেতে মৌমাছিদের একটুও দেরি হয় না। এগুলো প্রায় তিন মিটার লম্বা হয়ে থাকে। বারবেরি ফলের রক্তরোধক গুণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এর ব্যাপক আবাদ হয়। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও ভারতীয়রা এর আরোগ্যকর গুণের কথা জানত। অসুরবাণী-পালের গ্রন্হাগারে ২৬০০ বছরের পুরোনো যে ফলক পাওয়া গেছে তাতে খোদিত কথায় ইংগিত ছিল যে, বারবেরি 'রক্ত পরিস্কার' করতে পারে। গেল শতকের শেষ দিকে রাশিয়ায় নির্বাচনবিদ (selectionist) ইভান

---

* লেভিউলোজ বা ফ্রুক্টোজ হচ্ছে মিস্টতম প্রাকৃতিক চিনির একটি। তা সুকরোজ (বিট বা ইক্ষু থেকে প্রাপ্ত চিনি)-এর তুলনায় ১·৭ গুণ এবং গ্লুকোজের তুলনায় ২·৫ গুণ বেশি মিস্ট।

মিচুরিন বারবেরি নিয়ে আগ্রহ দেখান এবং এর দলে ১৮৯৩ সালে এর অবীজ জাতের উদ্ভব হয়।

বিলবেরি (Bilberry) **বা হোর্টলবেরি** (whortleberry) **মধু:** চমৎকার সৌরভ ও মনোরম স্বাদের লালচে মধু। খাটো বিলবেরির গুল্মঝোপ (Vaccinium myrtillus L.) থেকে আহরিত সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। বিলবেরি খুবই চমৎকার সুধাময় উদ্ভিদ যা থেকে দৈনিক ২·৫ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হতে পারে।

তিত-কমলা (Bitter orange) **মধু:** অন্যতম শ্রেষ্ঠ মধু। এর সৌরভ লেবু ফুলের সৌরভের মত তীব্র এবং আস্বাদ অতুলনীয়। তিত-কমলা গাছ (citrus aurantium) থেকে মধু সংগৃহীত হয়। ১৯৩৮ সালে E. R. Root উল্লেখ করেন যে, Alin Caillas নামে একজন ফরাসী রসায়নবিদ তিত-কমলা মধুতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ও লোহের ফসফেটের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং ঔষধ-মানের দিক থেকে এ দিকে বিশেষ মনযোগ দেওয়ার পক্ষে মত দেন।

ব্ল্যাকবেরি (Blackberry) **মধু:** ডিউবেরি (dewberry) মধু দেখুন।

ব্ল্যাক লোকাস্ট মধু: অ্যাকেসিয়া মধু দেখুন। ব্লুউইড (Blueweed) **বা বাগলস** (bugloss) **মধু:** প্রথম শ্রেণীর মধু। হালকা অম্বর রঙের। সৌরভ মনোরম ও আস্বাদ বেশ ভাল। এই মধু খুবই সান্দ্র বা আঠালো এবং বেশ ধীরেধীরে দানা বাঁধে। বরিজ (borage) গোত্রের সদস্য ব্লুউইড বা ভাইপার'স বাগলস (Echium vulgare L.)-এর গোলাপী রঙের ও উজ্জ্বল নীল ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু আহরণ করে। ভাইপার'স বাগলস খুবই মূল্যবান মধু-উদ্ভিদ যা প্রতি হেক্টরে ৩০০ থেকে ৪০০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন করে থাকে।

বরিজ (Borage) **মধু:** সুন্দর প্রকাণ্ড বরিজ ফুলের (Borago officinalis L.) সুধা থেকে এই মধু পাওয়া যায়। সুধাময় ও ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে এর চাষ হয়। এক হেক্টরে ২০০ কিলোগ্রামের মত এই চমৎকার মধু পাওয়া যায়।

ব্র্যাম্বল (Bramble) **মধু:** ডিউবেরি মধু দেখুন।

বাকউইট (Buckwheat) **মধু:** এই মধু দেখতে কাল্‌চে রঙের। লালাভ কাল্‌চে হলুদ থেকে তা কাল্‌চে বাদামী রঙের হয়ে থাকে। দেখতে অনেকটা বৃক্ষ নির্যাস মধুর (honey-dew honey) মত।

অন্যান্য মধুর তুলনায় এর স্বতন্ত্র সৌরভ ও বিশেষ ধরনের স্বাদ-গন্ধ আছে। এই মধু খেলে কারো কারো 'গলা চুলকায়'। দানা পড়ার পর বাকউইট মধু মণ্ড জাতীয় পিণ্ডে পরিণত হয়। এতে গ্লুকোজের পরিমাণ ৩৬·৭৫ শতাংশ ও লেভিউলোজের পরিমাণ ৪০·২৯ শতাংশ। অন্যান্য ফিকে মধুর তুলনায় এতে লোহা ও আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে বলে রক্তশূন্যতার চিকিৎসায় এই মধু প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়ে থাকে। লোক প্রবাদ আছে যে, 'কালচে মধু ফ্যাকাশে চেহারার জন্য উত্তম'। বাকউইট (Fagopyrum esculentum)-এর সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। ফলের বাগানে কিংবা মেঠো ফসল হিসেবে বাকউইটের চাষাবাদ ব্যাপক। এক হেক্টর থেকে উৎপন্ন মধুর পরিমাণ ৬০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত দাঁড়ায়।

বাগলস মধু: ব্লুউইড মধু দেখুন।

বারডক (Burdock) **মধু**: কালচে জলপাই রঙের উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত মধু। যথেষ্ট আঠালো। লোমশ বারডক (Lappa tamentosa Lam.) ও বৃহৎ বারডকের (Arctium lappa major Gaertn.) ছোট ছোট কালচে-পাটল ফুল থেকে এই মধু সংগৃহীত হয়। এক হেক্টর জায়গা থেকে গড়ে ৬০০ কিলোগ্রাম এই সুস্বাদু মধু পাওয়া যায়।

গাজর (carrot) **মধু**: মনোরম সৌরভযুক্ত কালচে হলুদ রঙের মধু। বন্য ও আবাদী গাজরের (Daucus carota L.) সুগন্ধি সাদা ধন্যাক গোত্রের ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়।

চেস্‌নাট (Chestnut) **মধু**: দেখতে কালচে। এর সৌরভ ক্ষীণ এবং স্বাদগন্ধ অপ্রীতিকর। মিস্ট চেসনাটের (Castanea sativa L.) ফুল থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। শোভাময় হর্স চেস্‌নাট-এর (Aesculus hippocastanum L.) সাদা ও ফিকে-লাল ফুলের মধু থেকেও মৌমাছিরা মধু উৎপাদন করে থাকে। এ মধু মিস্টি চেসনাটের মধু থেকে আলাদা। এ জাতের মধু বর্ণহীন, পাতলা এবং সহজেই তাতে দানা পড়ে। কখনো কখনো এর স্বাদ কটু হয়। একে নিকৃষ্ট জাতের মধু হিসাবে গণ্য করা হয়।

ক্লোভার (Clover) **মধু**: সবচেয়ে ভাল মধুগুলোর একটি। রঙহীন, স্বচ্ছ ও মনোরম সৌরভযুক্ত। দানা পড়ার পর কঠিন সাদা বস্তুতে পরিণত হয়। ক্লোভার মধুতে ৩৪·৯৬ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৪০·২৪ শতাংশ

লেভিউলোজ থাকে। এক হেক্টর সাদা ক্লোভার (Trifolium repens L.) ১০০ কিলোগ্রাম মধু যোগায়।

ধনে (coriander) **মধু**: তীব্র কটুগন্ধ ও সুনির্দিষ্ট স্বাদযুক্ত মধু। ধন্যাক গোত্রের সাদা ও ঈষৎ পাটল ফুল (coriandrum sativum L.) থেকে এই মধু সংগৃহীত হয়। পুষ্পময় এক হেক্টর জায়গা থেকে ৫০০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

কর্ণফ্লাওয়ার (cornflower) **মধু**: সবুজাভ হলদে রঙের। এর মনোরম সৌরভ কাগজি বাদাম (almond)-এর সৌরভের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই মধুর স্বাদ কিছুটা কটু ও স্বতন্ত্র ধরনের। কর্ণফ্লাওয়ার বা নীল ঝুমকা (blue bottle) (centaurea cyanus L.) চমৎকার সুধাময় উদ্ভিদ।

কার্পাস (cotton) **মধু**: স্বতন্ত্র সৌরভ ও মুখরোচক আস্বাদ যুক্ত উজ্জ্বল হালকা রঙের মধু। এতে সাধারণত দ্রুত খুব মিহি ও সাদা দানা পড়ে। কার্পাস মধুতে গ্লুকোজের পরিমাণ ৩৬·১৯ শতাংশ। কার্পাস গাছের (Gossypium L.) পাতার (পুষ্প বহির্ভূত) সুধাগ্রন্থি থেকে যে মধু সংগৃহীত হয় তার সাথে ফুল থেকে সংগৃহীত মধুর স্বাদ-গন্ধের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এক হেক্টার জমিতে পুষ্পিত কার্পাসে ১০০ থেকে ৩০০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়। পর-পরাগায়নের ফলে কার্পাসের ফলনও ৪০ থেকে ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

ড্যানডিলাইয়ন (Dandelion) **মধু**: সোনালী হলুদ রঙের; বেশ ঘন ও সান্দ্র মধু। কড়া গন্ধ ও কড়া স্বাদের এই মধুতে দ্রুত দানা পড়ে। সাধারণ ড্যানডিলাইয়ন (Taraxacum officinale L.)-এর সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। এই উদ্ভিদ সর্বত্র প্রচুর জন্মায়। ড্যানডিলাইয়ন মধুতে ৩৫·৬৫ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৪১·৫০ শতাংশ লেভিউলোজ থাকে।

ডিউবেরি (Dewberry) **মধু**: ডিউবেরি ফুলের (Rubus caesius L.) সুধা থেকে এই মধু পাওয়া যায়। ডিউবেরি মধু জলের মত স্বচ্ছ এবং তা স্বাদেগন্ধে চমৎকার। ফুলে-ভরা এক হেক্টার ডিউবেরি জমি থেকে মৌমাছিরা ২০ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করতে পারে। ব্র্যাম্বল বা ব্ল্যাকবেরি (R. fructiosus থেকে) এই মধুর সমগোত্রীয়।

ড্রাগন মাথা (Dragon's head) **মধু**: বর্ষজীবী সুগন্ধি-তৈল (essential-oil) উদ্ভিদ Dracocephalum moldavicum L.-এর নীলচে

রক্তবেগুনি ফুল থেকে এই মধু আহরণ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ককেশাস, আলতাই, ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য এলাকার বনাঞ্চলে এই উদ্ভিদ জন্মায়। এই মধু উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। এর সৌরভ ও স্বাদ মনোরম। ড্রাগনমাথা বেশ মূল্যবান সুধাময় উদ্ভিদ, কারণ এর ক্ষীণ লেবুটে গন্ধ যুক্ত ফুলে উঁচু মাত্রায় শর্করা সহ প্রচুর পরিমাণ সুধা থাকে। এক হেক্টর জমি থেকে ২৯০ কিলোগ্রামের মত মধু পাওয়া যায়।

ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus) **মধু**: এই মধুর স্বাদগন্ধ অপ্রীতিকর হলেও ফুসফুসের যক্ষ্মার লোকজ চিকিৎসায় একে যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। চির সবুজ ইউক্যালিপটাস বা নীল গঁদ বৃক্ষের (Eucalyptus globulus Labill.) বড় বড় নিঃসঙ্গ বহু-পুংকেশরময় ফুল থেকে এই মধু পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে।

ভেষজশাস্ত্রে এর আরোগ্যকর গুণাগুণ সম্পর্কে যে সব উপাত্ত পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধী। কোন কোন লেখক (ল. গ্দানস্কি) এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী, অন্যরা (ন. ইলিইন) আবার একে অতিরঞ্জন বলে মনে করেন। ইউক্যালিপ্টাস তেল ও অন্যান্য ইউক্যালিপ্টাস ভেষজ সামগ্রী ফুল থেকে না নিয়ে গাছের পাতা নিষ্কাশিত করে নেওয়ার ব্যাপারটি দেখে আমরা সহজেই ধারণা করতে পারি যে, ইউক্যালিপটাস মধুর ভেষজ মূল্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখা হয়েছে।

হেদার (Heather) **মধু**: সাধারণ হেদার [Calluna vulgaris (L.) Salisb.]-এর পল্লবিত চিরসবুজ ঝোপের ঈষৎ রক্তবেগুনী রঙের কৃশতনু ফুল থেকে এই মধু তৈরী হয়। এই মধু কালচে, কালচে হলুদ কিংবা পিঙ্গল রঙের হতে পারে। ক্ষীণ সৌরভযুক্ত এই মধুর স্বাদ মনোরম অথবা কষা এবং কিছুটা তেতো হয়ে থাকে। হেদার মধু খুবই আঠালো, তা দানা বাঁধতে বেশ সময় নেয়। এক হেক্টার জমির হেদার থেকে মৌমাছিরা ২০০ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করে।

হেম্প-ম্যালো (Hemp-mallow) **মধু**: নিষ্কাশনের ঠিক পরপর এই মধু নিষ্প্রভ হলদে রঙের দেখায়। স্বাদগন্ধ চূড়ান্ত রকমের অপ্রীতিকর। এক হেক্টার জমির হেম্প-ম্যালো (Hibiscus cannabinus L.) থেকে ৪০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়।

বৃক্ষনির্যাস (Honey dew) **মধু**: ফুলের সুধা থেকে এ মধু উৎপন্ন হয় না। তৈরী হয় সবুজ মাছি বা উদ্ভিদ উকুন (Aphididae), বাকল

পোকা (Coccidae) এবং পাতা ফড়িং (Psyllidae)-এর মত উদ্ভিদ ছারপোকাদের মিস্টি, আঠালো নিঃস্রাব থেকে। এই সমস্ত পতঙ্গ উদ্ভিদের তরুরস খেয়ে বাঁচে; উদ্ভিদের কাণ্ডে ও পত্ররাজিতে এদের নিঃসৃত যে মল দেখতে পাওয়া যায় তার উৎস বৃক্ষনির্যাসের অনুরূপ ভাবা হত। প্রাচীন কালে ও এ রকম ধারণা ছিল; প্লিনি ভেবেছিলেন এগুলো তারার দেশ থেকে পড়ে। এই বিশ্বাস বহু শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সুধা ও বৃক্ষনির্যাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ফুলের সুধার প্রায় সবটাই বলতে গেলে শর্করা, পক্ষান্তরে বৃক্ষনির্যাসে শতকরা ৭০ ভাগ নাইট্রোজেনজাত পদার্থ ও ডেক্সট্রিন থাকে। উদ্যমী তৎপরতায় মৌমাছিরা বৃক্ষনির্যাস খুঁজে তা থেকে মধু তৈরী করে।

বৃক্ষনির্যাস মধু সাধারণতঃ কালচে ও আঠালো। এর সৌরভ ক্ষীণ এবং স্বাদগন্ধ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ফুলের মধুর চাইতে এর ব্যাকটেরিয়াবিনাশী গুণাগুণ তুলনামূলকভাবে কম। মৌচাকে শীতকালীন খাদ্য হিসাবে বৃক্ষনির্যাস মধু থেকে গেলে তা মৌমাছিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৃক্ষনির্যাস মধু খাদ্যশিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (প্রধানতঃ মিস্টান্ন ও গাঁজন (fermentation) শিল্পে)। গবেষণায় দেখা যায়, বৃক্ষনির্যাস নিঃসন্দেহে সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দাবী করে। চেক্ গবেষক O. Gargasim পৃথকীকরণ কৌশলের (chromatography) সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, বৃক্ষনির্যাসে র‍্যাফিনোজ, মলটোজ, মেলজিটোজ, স্যাকারোজ, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও আরও সাত রকম অনির্ণীত শর্করা রয়েছে। এই মধুতে প্রচুর অ্যামিনো এসিডও আছে। নিম্নলিখিত অ্যামিনো এসিড বৃক্ষনির্যাস মধুতে পাওয়া গেছে: অ্যালানিন, আর্জিনাইন, এসপারটিক এসিড, সিস্টিন, গ্লুটামিক এসিড, গ্লাইসিন, হিস্টিডিন, লিউসিন, লাইসিন, মেথিওনাইন, প্রোলিন, সেরিন, থ্রিওনিন, ট্রিপটোফেল, টায়রোসিন ও ভ্যালিন। বৃক্ষনির্যাস ও বৃক্ষনির্যাস মধুর প্রাণ-রাসায়নিক গঠন-উপাদান এবং আণুবীক্ষণিক অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে তথ্য খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে Werner Kloft, Anna Maurizio ও Walter Keser এবং Das Waldhonigbuch (বনমধুগ্রন্থ) (মিউনিখ, ১৯৬৫) নামক গ্রন্থে। প্রাকৃতিক মধুতে বৃক্ষনির্যাসের অস্তিত্ব

পরীক্ষার জন্য কয়েকটি পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়। সবচেয়ে সহজ একটি পদ্ধতিতে স্পিরিট বিক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয়। ৯৬ শতাংশ পর্যন্ত পরিশোধিত এলকোহলের ছয় ভাগ, মধু ও পরিস্রুত পানির ১:১ দ্রবণে মেশানো হয়। ধোঁয়াটেভাব বৃক্ষনির্যাসের অস্তিত্বের সংকেতবহ।

হোরহাউন্ড (Hore hound) **মধু**: হালকা রঙের এই মধু রুচিকর স্বাদ-গন্ধযুক্ত। একাধিক বর্ষজীবী হোরহাউন্ড (Marrubium vulgare L.)-এর ঈষৎ ধূসর সাদা ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে। ফুলের সুধা উঁচু মাত্রায় চিনি ও সুগন্ধিযুক্ত হওয়ায় মৌমাছিরা তা চট্ করে খুঁজে পায়। এক হেক্টর পরিমাণ জমির উদ্ভিদ থেকে ৫০ কিলোগ্রাম চমৎকার মধু পাওয়া যায়।

হোভেনিয়া (Hovenia) **মধু**: লিন্ডেন মধুর অনুরূপ তবে একটু বেশি কাল্চে। এর সৌরভ কড়া এবং ফুল (Hovenia dulcis Thubg.) থেকে মৌমাছিরা এই মধু যোগাড় করে। ফলের জন্য ও সৌন্দর্যবৃক্ষ হিসেবে এর আবাদ হয়।

হিস্যপ (Hyssop) **মধু**: চমৎকার স্বাদ ও গন্ধের জন্য একে উন্নত মানের মধু হিসেবে গণ্য করা হয়। গুল্ম জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ Hyssopus officinalis L.-এর গাঢ় নীল ফুলের সুধা থেকে এই মধু প্রস্তুত হয়। ইউক্রেন, মধ্যএশিয়া এবং ক্রিমিয়া, ককেশাস, ও আলতাই পার্বত্য অঞ্চল সহ অন্যান্য এলাকার বনাঞ্চলে এই উদ্ভিদ জন্মায়। সুগন্ধী তেলের উদ্ভিদ হিসাবে এবং মৌ-উদ্যানের মূল্যবান সুধাময় ফসল হিসেবে হিস্যপের চাষাবাদ হয়ে থাকে।

ল্যাভেনডার (Lavendar) **মধু**: প্রথম শ্রেণীর মধু, দেখতে সোনালী রঙের এবং এর সৌরভও রুচিকর। একাধিক বর্ষজীবী সুগন্ধি তেল জাতীয় গুল্মের (Lavandula vera Dc) নীলচে রক্তবেগুণী ফুলের সুধা থেকে মৌমাছিরা এই মধু উৎপাদন করে।

লিন্ডেন (Linden) **বা লাইম** (Lime) **মধু**: অন্যতম শ্রেষ্ঠ মধু। অসাধারণ স্বাদ-গন্ধের জন্য খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। নিষ্কাশনের পরপর টাট্কা অবস্থায় এই মধু খুব সুরভিত, স্বচ্ছ এবং ঈষৎ হলদে বা ফিকে সবুজ রঙের হয়। এতে ৩৬·০৫ শতাংশ গ্লুকোজ এবং ৩৯·২৭ শতাংশ ফ্রুক্টোজ থাকে। উফা (বা বাশকির) এলাকার লিন্ডেন মধু দেখতে বর্ণহীন। দানা পড়লে তা সোনালী আভাযুক্ত

মোটা দানাদার সাদা বস্তুতে পরিণত হয়। আমুর (বা দূর প্রাচ্য) এলাকার লিণ্ডেন মধু অনুজ্জ্বল হলদে রঙের। সব রকমের লিণ্ডেন মধুরই সুনির্দিষ্ট ও রুচিকর স্বাদগন্ধ রয়েছে। তবে এ মধুতে ক্ষীণ কটু স্বাদও লক্ষণীয় (তা অবশ্য খুব দ্রুত অপসৃয়মান)। সর্দির চিকিৎসায় (প্রধানতঃ ঘর্মনিঃসারক হিসেবে) দেশী ওষুধে লিন্ডেন মধু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লাইম অথবা লিন্ডেন গাছের (Tilia) সবুজাভ হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। চমৎকার সুধাময়তার জন্য এই উদ্ভিদের নাম হয়েছে মধু-উদ্ভিদের রাণী। এই খ্যাতি এর প্রাপ্য। কারণ একটা গাছ থেকেই মৌমাছিরা ১৬ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করতে পারে আর এক হেক্টার লেবু-বাগান থেকে ১০০০ কিলোগ্রামেরও বেশী মধু উৎপন্ন হয়ে থাকে।

লুস্যারন (Lucerne) বা **আলফালফা** (alfalfa) **মধু**: লাইলাক অথবা লুস্যা'ন (আলফালফা) (Medicago sativa L.)-এর রক্তবেগুনি ফুল থেকে এই মধু সংগ্রহ করা হয়। নিষ্কাশনের প্রথম অবস্থায় রঙের মাত্রা বিচারে বর্ণহীন থেকে অম্বর রঙের হতে পারে। লুস্যা'ন মধু দ্রুত দানা বাঁধে এবং ঘনীভূত দুধের মত সাদা বস্তুতে পরিণত হয়। এই মধু মনোরম সৌরভ ও স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত। এতে ৩৬·৮৫ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৪০·২৪ শতাংশ লেভিউলোজ থাকে। এক হেক্টার লুস্যান-এর আবাদ থেকে ৩৮০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

মেপল (Maple) বা **সাইকামোর** (sycamore) **মধু**: চমৎকার স্বাদগন্ধযুক্ত হালকা রঙের মধু। বাহারি নরওয়ে মেপল (Acer. platanoides L.), সাধারণ মেপল (A. campestre L.) ও সাইকামোর (A. pseudoplatanus)-এর হলুদাভ সবুজ ফুলের সুধা মৌমাছিরা প্রবল উৎসাহে তালাশ করে। প্রতি হেক্টার জমির নরওয়ে মেপল থেকে ২০০ কিলোগ্রাম এবং সাধারণ মেপল থেকে ১১০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত মধু পাওয়া যায় (উত্তর আমেরিকার মেপল-মধুর সাথে এই মেপল মধু গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কারণ সেটা হল A. saccharium বা শর্করা মেপল-এর অকেলাসিত তরুরস)।

তৃণভূমির (Meadow) **মধু**: সোনালী হলুদ কিংবা ঈষৎ হলুদাভ রঙের। সৌরভ ও স্বাদ চমৎকার। তৃণভূমির নানান ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়।

মেলিলোট (Melilot) বা **মটর ফুলের মধু**: চমৎকার জাতের মধু। মনোরম সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত। হালকা অম্বর থেকে সাদা রঙের হয়ে থাকে। এর সুস্বাদ ও চমৎকার সৌরভ ভ্যানিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাধারণ মেলিলোট (Melilotus officinalis Desr.)-এর উজ্জ্বল হলুদ ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু তৈরী করে। এতে গ্লুকোজের পরিমাণ ৩৬·৭৯ শতাংশ ও লেভিউলোজের পরিমাণ ৩৯·৫৯ শতাংশ। মেলিলোটের ফুল ও পাতা (Herba Meliloti) মেলিলোট বা সবুজ আস্তর (Plaster) তৈরী করতে এবং ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মৌমাছিরা এক হেক্টর পরিমাণ জায়গার বুনো মেলিলোট থেকে ২০০ কিলোগ্রাম এবং এক হেক্টর আবাদী মেলিলোট থেকে ৬০০ কিলোগ্রাম মধু তৈরী করে।

মেলিসা (Melissa) বা **বাম** (balm) **মধু**: এই মধুর স্বাদগন্ধ চমৎকার। সুগন্ধি বাম ফুলের (Melissa officinalis L.)-এর সুগন্ধি ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন, ক্রিমিয়া ও ককেশাসে ভেষজ গুল্ম ও সুগন্ধি-তেল-শস্য হিসাবে এই গুল্মের ব্যাপক আবাদ হয়ে থাকে। এক হেক্টর জমি থেকে ১৫০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়।

মিনোনেট (Mignonette) **মধু**: এই মধু সেরা জাতের। অসাধারণ সৌরভ ও মনোরম স্বাদ-গন্ধের দিক থেকে কেবল লিন্‌ডেন মধুর সাথেই এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। মিনানেট (Reseda odorata L.)-এর ফুল থেকে এই মধু আহরিত হয়। এই ফুলের সুধা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং পরাগরেণু রক্তিম কমলা রঙের মত সুন্দর। প্রতি হেক্টর জমির মিনোনেট থেকে ২০০ কিলোগ্রাম মধুর ফসল পাওয়া যায়।

দুধ-আগাছা (Milk weed) **মধু**: মহামূল্যবান সুধাময় উদ্ভিদ (Asclepias syriaca L. এবং A. cornuti Desc)-এর সুগন্ধি সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এক হেক্টর জমির দুধ-আগাছা থেকে গড়ে ৬০০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়। হলুদ আভা যুক্ত হালকা রঙের এই মধুর সৌরভ মনোরম এবং স্বাদগন্ধ চমৎকার। শুকনো ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এই মধু চাকে এমন জমাট বেঁধে যায় যে পরে তাপ দিয়েও তা নিষ্কাশন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

মাদার ওয়ার্ট (Motherwort) **মধু**: অনেকটা খড়ের রঙের মত

ফিকে সোনালী রঙের মধু। এর সৌরভ ক্ষীণ এবং স্বাদগন্ধে বৈশিষ্ট্য আছে। মাদারওয়ার্ট (Leonurus cardiaca L.)-এর পাণ্ডুর বেগুনী ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। পরিত্যক্ত জমি, জঞ্জালস্তূপ ইত্যাদিতে এই উদ্ভিদ জন্মে থাকে। মোটা গুচ্ছে প্রতিটি উদ্ভিদে ২৫০০-এরও বেশি ফুল ফোটে। উঁচু মাত্রায় শর্করা উপাদান সহ প্রচুর সুধা এই সব ফুল থেকে পাওয়া যায়। এক কালে ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত এই মূল্যবান সুধাময় উদ্ভিদ থেকে যে কোন আবহাওয়ায় মৌমাছি চট করে সুধা আহরণ করতে পারে।

পর্বত-ছাই (Mountain ash) **মধু**: রোয়ান (rowan) মধু দেখুন।

মাস্টার্ড (Mustard) **(সরিষা) মধু**: সোনালী হলুদ রঙের মধু। দানাদার অবস্থায় হলুদাভ ক্রিমের দীপ্তি নেয়। সাদা মাস্টার্ড (sinapis alba L.)-এর বড় হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধু পাওয়া যায়। এক হেক্টর জমির মাস্টার্ড থেকে মৌমাছিরা ৪০ কিলোগ্রাম মধু আহরণ করে।

মটরফুলের (Peaflower) **মধু**: মেলিলোট মধু দেখুন।

পেপারমিন্ট (Peppermint) **মধু**: একাধিক বর্ষজীবী সুগন্ধি তেল-উদ্ভিদ (Mentha piperita L.)-এর সুগন্ধি ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়। সুধার পর্যাপ্ত উৎস — এই উদ্ভিদের ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। পেপারমিন্টের মনোরম সৌরভযুক্ত এই মধু অম্বর রঙের হয়ে থাকে।

ফ্যাসেলিয়া (Phacelia) **মধু**: হালকা সবুজ অথবা সাদা রঙের এই মধু রুচিকর সৌরভ ও মনমাতানো স্বাদ যুক্ত। দানা পড়লে তা আঠালো পেস্টের মত হয়। অন্যতম সেরা জাতের মধু হিসাবে একে গণ্য করা হয়। ফলে এর চাহিদাও প্রচুর। অন্যতম মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মধু-উদ্ভিদ Phacelia tanacetifolia Benth-এর নীল ফুলের সুধা থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। এক হেক্টর জমির প্রস্ফুটিত উদ্ভিদ থেকে ৫০০ (দক্ষিণ অক্ষাংশে এমন কি ১০০০) কিলোগ্রাম মধু পাওয়া সম্ভব।

পাম্পকিন (Pumpkin) বা **স্কোয়াশ** (squash) **মধু**: সোনালী হলুদ রঙের এই মধুর স্বাদগন্ধ মনোরম। বেশ তাড়াতাড়ি এতে দানা পড়ে। এক হেক্টর জমির পাম্পকিন (Cucurbita pepo L.) কিংবা স্কোয়াশ (C. malopepo) থেকে ৩০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়।

সরিষা (Rape) **মধু**: এই মধু দেখতে সাদা এবং কখনো কখনো হলুদ। এর সৌরভ মনোরম তবে মিস্টতা প্রীতিকর নয়। এই মধু বেশী ঘন, সহজে দানা পড়ে এবং পানিতে তেমন মেশে না। দীর্ঘদিন মজুত করলে সহজেই গেঁজে যায়। বিশিষ্ট সুগন্ধি তেল-উদ্ভিদ সরিষা (Brassica napus var. oleifora Metzg.)-এর হলুদ ফুলের সুধা থেকে মৌমাছিরা এই মধু বানায়। একটি মৌমাছি বসতি এই উদ্ভিদ থেকে একদিনে ৮ কিলোগ্রাম মধু বানিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক হেক্টর জমির সরিষা থেকে ৫০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

রাস্‌প্‌বেরি (Raspberry) **মধু**: খুবই মনোরম সৌরভ ও রুচিকর স্বাদের সাদা মধু। মধুকোষ থেকে প্রাপ্ত মধু এত সুস্বাদু যে, মনে হয় যেন তা মুখের মধ্যেই গলে যাচ্ছে। রাস্‌পবেরির (Rubus idaeus L.) ফুল থেকে এই মধু পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদের কান্ডে যখন ফুল ফোটে তখন মৌমাছি অন্য সুধাময় উদ্ভিদ ফেলে রেখে এগুলো থেকে মধু আহরণ করে। এর কারণ রাস্‌প্‌বেরির ফুলগুলো মধু আহরণরত মৌমাছির উপর অনেকটা 'ছাতার' মত এমনভাবে ঝুলে থাকে যে বৃষ্টি-বাদলার দিনে মৌমাছিরা সুধা সংগ্রহের কাজ নির্ঝঞ্ঝাটে চালিয়ে যেতে পারে। বুনো রাস্‌পবেরি থেকে প্রতি হেক্টারে ৭০ কিলোগ্রাম এবং উদ্যানের রাস্‌পবেরি থেকে প্রতি হেক্টারে ৫০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়। এই মধুতে ৩৩·৫৭ শতাংশ গ্লুকোজ ও ৪১·৩৪ শতাংশ লেভিউলোজ বিদ্যমান।

রোডোডেনড্রন (Rhododendron) **মধু**: এর স্বাদগন্ধ অপ্রীতিকর এবং তা বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে (সাধারণ দুর্বলতা, মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, সংজ্ঞা হারান ইত্যাদি)। এই মধুতে আলকালয়েড (উপক্ষার) এন্ড্রোমেডোটক্সিন-এর অস্তিত্বই যে ঐ রকম বিষক্রিয়ার কারণ তার প্রমাণ আছে। চিরসবুজ রোডোডেনড্রন্‌ গুল্ম (Rhododendron) ponticum L.)-এর ফুল থেকে এই মধু পাওয়া যায়।

পাহাড়ী (Rock) **মধু**: দুর্লভ ও স্বতন্ত্র জাতের মধু। বন্য মৌমাছিরা এগুলো সংগ্রহ করে এবং পাহাড়ের কোটায় জমা রাখে। ফিকে হলুদ রঙের এই মধুর স্বাদ ও সৌরভ মনোরম। মধুকোষে মোমের পরিমাণ থাকে সামান্য এবং মধু শক্ত দানাদার বস্তুর রূপ নেয়। এ মধু

খেতে হলে চাককে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হয়। সাধারণ মধুর মত এ মধু আঠালো ধরনের নয় বলে মোড়ক বাঁধার দরকার হয় না। এ জাতের মধু বছরের পর বছর মজুত করে রাখা যায়, তাতে গুণাগুণ নষ্ট হয় না।

ককেশাসের আবখাজিয়া থেকে এই পাহাড়ী মধু পাওয়া যায় বলে কখনো কখনো একে আবখাজীয় মধু বলা হয়ে থাকে।

বাশকিরিয়ায় এক ধরনের পাহাড়ী মধুর ব্যবহার দেখা যায় যা কখনো কখনো দানাদার লিন্‌ডেন মধু থেকে তৈরী করা হয়। বিশেষ এক ধরনের চুলীতে বাষ্পীভবন করে জলীয় অংশ দূর করে নেওয়ার পর ঐ মধু পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে মধুর মধ্যেকার সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ (এনজাইম, ভিটামিন ইত্যাদি) চলে যায় বলে এই জাতের মধুর পুষ্টিমান হ্রাস পায়।

রোজবে (Rosebay) **মধু**: উইলো হার্ব (willow-herb) মধু দেখুন।

রোয়ান (Rowan) **মধু**: কড়া সৌরভ ও মনোরম আস্বাদযুক্ত এই মধু লালচে রঙের। রোয়ান বা পর্বতছাই (Sorbus aucuparia L.) ফুলের সুধা থেকে মৌমাছিরা এই মধু আহরণ করে। প্রতি হেক্টরে ৪০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়।

সেইজ (sage) **মধু**: রুচিকর সৌরভ ও মনোরম স্বাদযুক্ত হালকা অম্বর ও কালচে সোনালী রঙের মধু। একাধিক বর্ষজীবী সেইজ গুল্মের (salvia officinalis L.) উদ্যানের নীলচে রক্তবেগুনী ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে। এই উদ্ভিদের ব্যাপক আবাদ হয়ে থাকে। প্রস্ফুটিত সেইজ-এর প্রতি হেক্টরে ৬৫০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়।

সাঁ ফোয়াঁ (sainfoin) **মধু**: সোনালী হলুদ রঙের মধু, খুবই সৌরভময় ও মনোরোম স্বাদের। একাধিক বর্ষজীবী পশুখাদ্য জাতীয় ঘাস সাঁ ফোয়াঁ (onobrychis sativa Lam. এবং O. viciifolia Scop.)-এর পাটল ও লাল ফুল থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। সাঁ ফোঁয়া'র এক হেক্টর জমি থেকে মৌমাছিরা ১০০-৬০০ কিলোগ্রাম ভাল মধু সংগ্রহ করে।

স্যালো (sallow) **মধু**: উইলো মধু দেখুন।

লবণ-গাছ (salt-tree) **মধু**: হলুদ আভাযুক্ত হালকা রঙের মধু।

খুব সহজেই এতে দানা পড়ে। ছোট ছোট কাঁটাওয়ালা গাছ Halimodendron halodendron Pall. Voss)-এর বড় পাটল ফুলের সুধা থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। কাজাখস্তানে এই গাছ জন্মে থাকে। প্রস্ফুটিত লবণ-গাছের এক হেক্টর জমি থেকে ১৯০ কিলোগ্রাম মধু আসে।

স্কোয়াশ (squash) **মধু**: পাম্পকিন মধু দেখুন।

সোথিস্‌ল (sowthistle) **মধু**: প্রথম শ্রেণীর মধু। মনোরম সৌরভ ও স্বাদ যুক্ত এই মধুর রং সাদা। বিভিন্ন রকম আগাছা জাতীয় সোথিস্‌ল (sonchus oleraceus Scop.) উদ্ভিদের পিঙ্গল আভাযুক্ত লাল ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয়।

সূর্যমুখী (sunflower) **মধু**: সোনালী হলুদ রঙের মধু, তবে দানা পড়লে হালকা অম্বরের রং নেয়। কখনো কখনো তাতে সবুজ আভা লক্ষ্য করা যায়। এর সৌরভ ক্ষীণ এবং স্বাদ কিছুটা কষালো হলেও মনোরম। প্রধান তৈলবীজ ফসল সূর্যমুখীর (Helianthus annuus L.) সোনালী হলুদ ফুল থেকে এই মধু তৈরী হয়। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছি ফুলের পরাগায়ন করে দেয় বলে সেগুলির উর্বরতা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, মৌমাছি সূর্যমুখী ফুলে সক্রিয় থাকলে ফসল উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এক হেক্টর জমি থেকে ৫০ কিলোগ্রাম মধু আসে।

সাইকামোর (sycamore) **মধু**: মেপল মধু দেখুন।

থিস্‌ল (Thistle) **মধু**: পয়লা জাতের মধু। বর্ণহীন, সবুজাভ কিংবা সোনালী (হালকা অম্বর) রঙের হয়ে থাকে। সৌরভ ও স্বাদ মনোরম। কেলাসিত হলে মিহি দানা পড়ে। কাঁটাময় কাণ্ড ও ঈষৎ ধূসর পাতা যুক্ত মাস্ক থিজল (Carduus nutans L.)-এর সুন্দর রাস্‌পবেরি ফুলের মধু থেকে মৌমাছিরা মহাউদ্যমে মধু আহরণ করে।

তামাক (Tobacco) **মধু**: হালকা ও গাঢ় রঙের হয়ে থাকে। অপ্রীতিকর সৌরভ ও কটু স্বাদের মধু। নীচু মানের স্বাদগন্ধের কারণে এই মধু মানুষের ব্যবহারের পক্ষে অনুপযোগী। সুগন্ধি সেরা তামাক সংরক্ষণের কাজে তা ব্যবহৃত হয়। মৌমাছির শীতকালীন খাদ্য হিসাবে নির্বিঘ্নে ব্যবহৃত হতে পারে। তামাক (Nicotiana tabacum L.) ফুলের সুধা থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়।

টিউলিপ (Tulip) **মধু**: লালচে রঙের এই মধুর সৌরভ ও স্বাদ মনোরম। টিউলিপ গাছের (Liriodendron tulipifera L.) সবুজাভ-লাল সুন্দর বাহারি ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে। অন্য যে কোন উপক্রান্তীয় উদ্ভিদের তুলনায় এই উদ্ভিদের ফুল অধিকতর সুধা নিঃসরণ করে বলে একে বেশ ভাল মধু-উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি গাছ থেকে ১ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

ভেচ (vetch) **মধু**: সরু পাতাওয়ালা ভেচ Vicia tenuifolia Roth.)-এর সুধা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই মধু তৈরী হয়। সাইবেরিয়া ও স্তেপ অঞ্চলে এই উদ্ভিদ জন্মে। এই মধু বেশ পরিস্কার এবং রুচিকর সৌরভ ও স্বাদযুক্ত। লিপিবদ্ধ দলিলে দেখা যায়, একটি সাইবেরীয় মৌমাছি বসতি একদিনে ৫ কিলোগ্রামের মত ভেচ মধু আহরণ করতে পারে।

বুনো পার্সনিপ (wild parsnip) **মধু**: চমৎকার স্বাদগন্ধযুক্ত হালকা রঙের মধু। দ্বিবর্ষজীবী বুনো পার্সনিপের (Pastinaca sativa L.) হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধু তৈরী হয় (বাশকিরিয়ায় মধু-উদ্ভিদ হিসেবে বুনো পার্সনিপের স্থান লিন্‌ডেন-এর পরেই)।

উইলো (willow) বা **স্যালো** (sallow) **মধু**: সোনালী হলুদ রঙের মধু। কেলাসিত হলে মিহি দানাদার ক্রিমের মত সাদা বস্তুতে পরিণত হয়। স্বাদগন্ধ বেশ ভাল। প্রায় ১৭০ রকমের উইলো পরিবারের (salix) গুল্ম ও গাছ থেকে মৌমাছি চট করে মধু আহরণ করে থাকে। উইলোর কোন কোন প্রজাতি প্রচুর পরিমাণে সুধা নিঃসরণ করে থাকে এবং একটি মৌমাছি-কলোনী কখনো কখনো একদিনে তা থেকে ৩-৪ কিলোগ্রামে মধু আহরণ করতে পারে। এক হেক্টর জমি থেকে ১৫০ কিলোগ্রাম মধু উৎপন্ন হয়।

উইলো হার্ব (willow-herb) বা রোজবে *(rosebay)* **মধু**: স্বচ্ছ সবুজ আভাযুক্ত মধু। কেলাসিত অবস্থায় তুষারের মত সাদা দানাদার কিংবা ক্রিমের বা চর্বির মত বস্তুতে পরিণত হয়। তাপ দিলে উইলো হার্ব মধু হলুদ হয়ে যায়। এই মধুর সৌরভ রুচিকর এবং স্বাদ মনোরম। রোজবে বা উইলো হার্ব (Epilobium বা Chaemaenaerion augustifolium L.)-এর জমকালো পাটল রক্ত-বেগুনী ফুলের সুধা

থেকে এই মধু তৈরী হয়। এক হেক্টরে ৬০০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

শীতকালীন ক্রেস (Wintercress) **মধু**: ক্ষীণ সৌরভ ও ভাল স্বাদযুক্ত। এই মধু সবুজাভহলুদ রঙের। এই মধু দীর্ঘকাল সংরক্ষণের উপযোগী নয়। শীতকালীন ক্রেস (Barbarea vulgaris R. Br.)-এর সোনালী হলুদ ফুলের সুধা থেকে এই মধু উৎপন্ন হয়। নদীর তীরে, হ্রদের আশেপাশে, স্যাঁতসেঁতে জলায় ও জলমগ্ন তৃণভূমিতে এই উদ্ভিদ জন্মায়। প্রতি হেক্টরে শীতকালীন ক্রেস থেকে ৪০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

বিষাক্ত বা 'মাদক' মধু

বিষাক্ত বা 'মাদক' (heady) মধুর কথা প্রাচীনকালেও লোকে জানত। Xenophon, Strabo ও Pliny'র রচনায় এর উল্লেখ আছে। কী ভাবে মধু খাইয়ে গ্রীক বাহিনীকে Colchis-এ (বর্তমান সোভিয়েত জর্জিয়া) দেরী করিয়ে দেওয়া হয়েছিল xenophon তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'আন্যাবিস' বা 'সাইরাস অভিযান' গ্রন্থে। "চূড়া পার হয়ে গ্রীকরা প্রচুর সুযোগ সুবিধা আছে এমন কিছু গ্রামে শিবির স্থাপন করল। সেখানে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু সে সব দেখে তারা মোটেও বিস্মিত হল না; কেবল মৌচাকের বিপুল সংখ্যাধিক্যই অসাধারণ বলে মনে হল তাদের কাছে। যে সব সৈন্য চাকের মধু খেল তাদের সবাই জ্ঞান হারাল, তাদের বমি ও পায়খানা হতে লাগল। কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। যারা একটু খানি মুখে দিয়েছিল তাদের অবস্থা হল মতালের মত, যারা একটু বেশি খেয়েছিল তাদের অবস্থা উন্মাদের মত আর কারো বা প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এই অবস্থায় দলে দলে তারা মাটিতে পড়ে রইলো, যেন যুদ্ধে তারা পরাজিত। সর্বত্র বিষাদ নেমে এল। পরদিন অবশ্য দেখা গেল যে, কেউ মরে নি। আগের দিন ঠিক যে সময়ে তারা সংজ্ঞা হারিয়েছিল পরের দিন ঠিক সেই সময়েই তারা সংজ্ঞা ফিরে পেল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে তারা সুস্থ হয়ে উঠল ঠিক যেন তারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছে।"[12] Pliny দুরকমের বিষাক্ত মধুর কথা উল্লেখ করেছেন। একটি পন্টাসের

হেরাক্লিয়ায় উৎপন্ন হয় এবং অন্যটি Sanni বা Macrone দের মধ্যে পাওয়া যায়। মৌমাছিরা যে-সব গুল্মে যাতায়াত করে থাকে সে-সব গুল্ম থেকেই এ ধরনের বৈশিষ্ট্যর উদ্ভব হয়। প্রথম জাতের বিষাক্ত মধুর জন্ম এগলথ্রোন (aegolethron) বা ছাগল-বিষ (Goat's-bane) নামক উদ্ভিদের ফুল থেকে এবং দ্বিতীয়টির জন্ম এক জাতের রোডোডেনড্রন থেকে।[13]

মাক্সিম গোর্কী তাঁর 'মানুষের জন্ম' নামক ছোট গল্পটিতে ককেশাসের 'মাদক মধু'র বর্ণনা দিয়েছেন:

"বাঁ দিকে, পাহাড়ের মাথায় জমেছে ধোঁয়াটে, ভারী, জলভরা মেঘ; তারই ছায়া পড়েছে 'মরা' বক্স গাছের সারির শোভাময় সবুজ ঢালুতে। এখানেই বুড়ো বীচ আর লিণ্ডেন গাছগুলোর কোটরে পাওয়া যায় সেই 'মাদক' মধু যার মিঠে মাদকতা সেই পুরাকালে একদিন লৌহদৃঢ় রোমানদের ছয় হাজার সৈন্যের গোটা বাহিনীকে জয় করেছিল যে মহান পম্পিউসের সৈন্যরা, তাদের সবার পতনের কারণ-প্রায় হয়েছিল। লরেল আর আজালিয়া ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে, আর ভবঘুরেরা সেই মধু কোটর থেকে বের করে নিয়ে গমের আটা দিয়ে তৈরী চেপ্টা রুটিতে মাখিয়ে খায়, যে রুটিকে দেশীয়রা বলে লাভাশ..."।[14]

বাতুমীর আশেপাশে বিভিন্ন এলাকার (xenophon বর্ণিত উপকাহিনীর দৃশ্যের কাছাকাছি জায়গা) মৌমাছিপালকরা অনেক সময় মৌচাক থেকে কেবল মোমই সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। কারণ, ঐ সমস্ত মৌচাকের মধু খেলে সম্মোহনী আবেশে মাথা ঝিম ঝিম করা, মাদকতা, বমিমিভাব ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বার্টন সর্বপ্রথম বিষাক্ত মধুর কথা উল্লেখ করেন ১৭৯৪ সালে; এর পর পরই নিউজার্সি, ভার্জিনিয়া, উত্তর ক্যারোলিনা, ফ্লোরিডা ও অন্যান্য রাজ্য থেকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আসে। বড়ো পাতাওয়ালা পার্বত্য লরেল (Kalmia latifolie), হীথ গোত্রের একটি সদস্য (Ericaceae), হলুদ অথবা ক্যারোলিনা জেসমীন কিংবা জেলসিমিনাম (Gelseminum sempervirens), সোপবেরি (sapindus marginatus), রোডোডেনড্রন (Rhododendron) ও আরো কিছু উদ্ভিদের সুধা থেকে এই বিষাক্ত মধু তৈরী হয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মধ্য ও উত্তর জাপানের পার্বত্য এলাকায় উৎপন্ন মধ্ প্রায়শঃ শারীরিক অসুস্থতা ঘটায়। স্থানীয়ভাবে hotsutsayi নামে পরিচিত হেদ্যার গোত্রের একটি উদ্ভিদের সুধাই এই মাদক বা বিষাক্ত প্রভাব সৃষ্টির কারণ। আজালিয়া, মংক্‌সহুড (নেকড়ে-বিষ) ও আন্ড্রোমিডা মধুও বিষাক্ত জাতের। কিন্তু ফক্সগ্লোভ, হেমলক, হেনবেন ও ওলিয়েন্ডার-এর মত বিষাক্ত উদ্ভিদের মধু নিরাপদে খাওয়া যায়।

Z. I. Gutnikova-র বক্তব্য অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরপ্রাচ্যে মৌমাছিরা বগ হেদ্যারের (Chamaedaphne calyculata Moench) সুধা থেকে বিষাক্ত মধু তৈরী করে। হাজার হাজার হেক্টর জায়গায় এই গুল্ম এমনভাবে ছেয়ে থাকে, যেন মোটা কার্পেট। ২০ থেকে ৩০ দিন দিন ধরে এর ফুল ফোটে। এক একটা মৌমাছি বসতি এসব ফুল থেকে দৈনিক প্রায় তিন কিলোগ্রাম মধু তৈরী করে। এই মধু দেখতে হলুদাভ, অনেকটা তিতা এবং এতে সহজেই দানা পড়ে। এ জাতের মধু খেলে ঠাণ্ডা ঘাম, কাঁপুনী, বমিবমি ভাব, বমি করা, ও প্রচণ্ড মাথাব্যথার উপসর্গ দেখা দেয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই মধুর ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম, সংজ্ঞা হারানো ও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে। তবে মজার ব্যাপার হল, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও এই মধু মৌমাছিদের কোন ক্ষতি করে না। গ্রীষ্মের ও শীতের খাবার হিসাবে যে-সব মৌমাছি কলোনীকে এই মধু খেতে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে কোনরকম ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায় নি। I. S. Molochny খাবারোভস্ক অঞ্চলে লক্ষ্য করেছেন যে, স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, জলায় ও পাঁকভরা পুকুরে জন্মায় এমন বুনো রোজমেরী বা জলায় জন্মানো চা (Marsh tea) (Ledum palustre L.) জাতীয় উদ্ভিদের ফুল থেকে মৌমাছিরা 'মাদক' মধু তৈরী করে। এই উদ্ভিদের সাদা ফুলে এমন এক ধরনের মাদক ঘ্রাণ রয়েছে যা সহজেই মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে। 'মাদক' মধুর অনিষ্টকরতা দূর করার জন্যে Molochny একটি পন্থার কথা বলেছেন। ক্ষতিকর মধুকে তিন ঘণ্টা ধরে ৮০ থেকে ৯০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় অবিরাম নাড়তে নাড়তে এমনভাবে উত্তপ্ত করতে হবে যেন মধু না উতলায়। এই দীর্ঘ উত্তাপ মধুর মধ্যেকার বিষাক্ত পদার্থকে নষ্ট করে দেয় এবং তা খাওয়ার উপযোগী হয়। তবে এর ফলে মধুর স্বাদ-গন্ধ ও গুণাগুণও নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে K. Sharashidze 'মাদক'

মধু উত্তপ্ত করার পদ্ধতিতে অগ্রগতি এনেছেন। এই পদ্ধতিতে মধুকে ৪৬০ সে. তাপমাত্রায় এবং ৬৭ মিলিমিটার পারদ-চাপে উত্তপ্ত করলে বিষাক্ত পদার্থগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় অথচ মধুর স্বাদ-গন্ধের কোন পরিবর্তন হয় না।

বিষাক্ত উদ্ভিদের সুধা থেকে মৌমাছিরা যে বিষাক্ত উপাদান মধুতে স্থানান্তরিত করে থাকে সে বিষয়ে অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৫১ সালে Sharashidze সোভিয়েত জর্জিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ইনস্টিটিউটে কৌতুহলজনক একসারি পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, 'মাদক' মধুর বিষাক্ত ধর্মের কারণ আজালিয়া ও রোডোডেনড্রন ফুলের সুধায় বিষের উপস্থিতি। এই মধু মাত্রা অনুযায়ী গিনিপিগকে খাইয়ে দেখা গেছে যে, ১০ গ্রাম মধু খাওয়ানোর পর গিনিপিগের চোয়াল কাঁপতে থাকে, বমি ও খিঁচুনী শুরু হয়। আর ১৪ গ্রাম খাওয়ানো হলে প্রাণী মারা যায়। পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রণ-প্রাণীরা সাধারণ মধু খেয়ে সুস্থ থাকে। আর একসারি পরীক্ষায় গিনিপিগদের এলকোহল এবং আজালিয়া ও রোডোডেনড্রন ফুলের জলযুক্ত নির্যাস (এলকোহল অপসারণের পর) এবং এই সব ফুলের সুধা খেতে দেওয়া হয়। 'মাদক' মধু খাওয়ানোর পর গিনিপিগগুলোর যে ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এ ক্ষেত্রেও তারা সে ধরনের লক্ষণ প্রদর্শন করে।

'মাদক' মধুর মধ্যেকার বিষ পুরোপুরি স্থায়ী হয় না। দীর্ঘদিন ধরে, এমন কি সাধারণ অবস্থায় রেখে দিলেও বিষাক্ততা কমে যায়।

বহু ভিটামিনযুক্ত মধু

ভিটামিনসমূহের খুব সামান্য মাত্রা (এক গ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগ) শুধু যে মানবদেহকে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে তা নয়, সংক্রমণ ও বাইরের ক্ষতিকর নানা প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তোলে।

পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা গেছে যে, রোজহিপ ও অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশন করা ঘনীভূত ভিটামিন C সিনথেটিক এসকর্বিক এসিডের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। এর কারণ হল, কাঁচা শাক-সবজি

থেকে পাওয়া ঘনীভূত ভিটামিনে জীবজ সক্রিয় পদার্থ (ফ্ল্যাভোনোইড, ক্যাটেচোল ইত্যাদি) থাকে এবং এগুলো সিনথেটিক বা সংশ্লেষী বস্তুতে পাওয়া যায় না। ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণেও দেখা যায় যে, স্বাভাবিক খাদ্যের সাথে গ্রহণ করা হলে শরীরে সিণথেটিক ভিটামিনের আত্তীকরণ অধিকতর ভালোভাবে হয়ে থাকে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বহু ভিটামিনযুক্ত মধু বিশেষ মূল্যবান। বহুভিটামিন যুক্ত মধু বলতে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত দ্রুত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত মধুর জাতকে বোঝায় না। বরং বহুভিটামিন-মধু হল মধু, ক্যালসিয়াম এবং নিম্নলিখিত কোন কোন ভিটামিনের যান্ত্রিক মিশ্রণ: A (অ্যাক্সেরোফটল), B_1 (অ্যানুরিন), B_2 (রিবোফ্ল্যাভিন), C (এসকরবিক এসিড), PP (নিকোটিনিক এসিড), ও D (ক্যালসিফেরল)। সোভিয়েত ইউনিয়নে দু'জাতের মধু বাজারে পাওয়া যায়: ১ নং মধু, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এবং ১১ নং মধু, শিশুদের জন্য।

মধু মোড়কবদ্ধ করার কারখানায় বিশেষ বৈদ্যুতিক মিশ্রণযন্ত্রে মধুর মিশ্রণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় বিপরীত চিনি (invert sugar) ও মধুর অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও ক্যালসিয়াম সমভাবে বন্টিত করা হয়ে থাকে। খুবই জলগ্রাহী বলে মধু এই পন্থায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে (এতে প্রায় ২০ শতাংশ জল থাকে যার মধ্যে ভিটামিন C, B_1 B_2 ও PP সহজেই দ্রবীভূত হয়)। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A ও D খুব ছোট ছোট গোলকের আকারে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের দানার মধ্যে সমভাবে (আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ পর্যায়ে) বিস্তার লাভ করে বলে মধু সুষম, সমরূপ উজ্জ্বল হলুদ রং পায়। আমাদের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মধুর সান্দ্রতার কারণে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের খুব ছোট বলগুলি মিশ্রণের মধ্যে পুরোপুরি মিশে যায় না। বহু ভিটামিন-মধু সাধারণ মধুর চেয়ে কিছুটা ব্যয়সাধ্য। তবে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনের মূল্য আলাদাভাবে বিবেচনা করলে, তা তুলনামূলকভাবে বেশ সস্তা।

মধুতে ভিটামিনসমূহের সংরক্ষণ: খাদ্যদ্রব্য মজুত করে রাখলে তার মধ্যেকার ভিটামিনগুলোর গুণ ও ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেই কারণে আমরা ভিটামিনযুক্ত মধুতে এ সব কতটা সংরক্ষিত থাকে তা পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেই। সেই অনুসারে পরীক্ষা হিসাবে আমরা সোভিয়েত

ইউনিয়নের খাদ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিখিল ইউনিয়ন ভিটামিন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন ল্যাবারেটরিতে এসকরবিক এসিড (ভিটামিন C) মিশিয়ে মধুকে ভিটামিন যুক্ত করি এবং তা পর্যবেক্ষণের জন্য ছয়মাস রাখা হয়।[16]

পরীক্ষালব্ধ যে তথ্য আমরা পাই তাতে দেখা যায় যে, বাকউইট মধুর চেয়ে লিন্‌ডেন মধুতে এসকরবিক এসিড অধিকতর কর্মক্ষম থাকে এবং এক্ষেত্রে লিন্‌ডেন মধুই সবচেয়ে উত্তম। সেখানে অবশ্য আরও একটি কৌতূহলজনক দিক ছিল। ছয় মাস পর দেখা গেল যে, মধুর নিজস্ব এসকরবিক এসিড ৫০ শতাংশ এবং কৃত্রিমভাবে প্রযুক্ত এসকরবিক এসিডের ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ বজায় রয়েছে। এ থেকে আমাদের এ ধারনা জন্মায় যে, মধুর স্থিতিকারক গুণ রয়েছে যা ভিটামিন C-র জারণকে প্রতিহত করে। উপরন্তু মধুর ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণের প্রতিক্রিয়াও বেশ অনুকূল।

আমাদের ঐ সব পরীক্ষায় এসকরবিক এসিড (ভিটামিন-C) ব্যবহারের কারণ, অন্যান্য ভিটামিনের তুলনায় এটিই সবচেয়ে অস্থায়ী। এভাবে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরা যায় যে, মধুর সাথে যুক্ত হওয়ার পর অন্যান্য ভিটামিনগুলোও (B_1, B_2, PP, D ও A) ভাল থাকে।

বহুভিটামিন-মধু ও বহুমূত্র রোগ: মস্কোর ডাক্তার A. Davydov ১৯১৫ সালে বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় সাফল্যজনকভাবে মধু ব্যবহারের এক বিবরণ দেন। আটজন রোগীর ক্ষেত্রে মধু প্রয়োগ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শর্করা-বহুমূত্র রোগের চিকিৎসায় অনেক ভাবেই মধু বেশ কাজে লাগতে পারে: (১) সুস্বাদু পদার্থ হিসাবে; (২) বহুমূত্র রোগীর পথ্যে পুষ্টিকর সংযুক্তি হিসাবে, কারণ এটা খেলে বহুমূত্র রোগের বেলায় নিষিদ্ধ অন্য কোন মিষ্টি জিনিষ খাওয়ার ইচ্ছা প্রায় হয়ই না; (৩) এসিটোনেমিয়া প্রতিরোধের জন্য বহুমূত্র রোগীর পথ্যের পরিপূর্ণ চিনি ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র যেখানে দিতে হয়, সেখানে এসিটোনেমিয়া প্রতিরোধে সহজেই মধু দেওয়া চলে; (৪) গ্লুকোজের নিঃসারণ বাড়ায় না বরং কমিয়ে দেয় এমন চিনি হিসেবে।[17]

লেভিউলোজ (ফ্রুক্টোজ)-এর সাথে ভিটামিন B_1, PP ও C (যেগুলির পরিমাণ মধুতে ৪১ শতাংশ)-এর সন্নিবেশ বহুমূত্র রোগে শর্করা জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের রূপান্তরকে স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে হিতকর

প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, এই সব ভিটামিন শুধু যে কার্বোহাইড্রেট সমূহের রূপান্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা নয়, উপরন্তু সেগুলি রক্তের মধ্যেকার চিনির স্তরেরও অবনমন ঘটায়। তদুপরি মধুতে ইন্সুলিন সদৃশ হরমোন পদার্থ পাওয়া যায়। সুতরাং মোটামুটি মাত্রায় থায়ামিন, এসকরবিক এসিড ও নিকোটিনিক এসিডের সন্নিবেশ সহ বহুভিটামিন-মধুর বিশেষ মিশ্রণ নিয়ে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা হওয়া উচিত। এ ধরনের মধু বহুমূত্র রোগীর পথ্যে বৈচিত্র্য সংযোজন করতে পারে।

মস্কোর মারাত ভিটামিন ও কনফেকশনারি কারখানায় বর্তমান লেখকের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে বহুমূত্র রোগীর পথ্য — বহুভিটামিনযুক্ত কিছু খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়। সেগুলি হল: বহুভিটামিন-মধু, মধু ও কালো আঙ্গুরের পেস্ট, কালো আঙ্গুরের পেস্ট, মধু ও চীনাবাদামের মাখন এবং মধু ও তিলের হালুয়া (bennet Butter)। নিখিল ইউনিয়ন ভিটামিন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা এসব উৎপাদিত সামগ্রীর নমুনা খেয়ে ও পরীক্ষা করে দেখে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন এবং বহুমূত্র রোগীর জন্য শুধু নয়, ছোট ছোট শিশু, স্কুলের শিশু, ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন এমন রোগীদের জন্যেও সুপারিশ করেন।

বহুভিটামিন-মধু ও গ্লুটামিক এসিড: একশ বছরেরও আগে Liebig গ্লুটামিক এসিড আবিষ্কার করেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কেবল সাম্প্রতিককালেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন কোন বৈকল্যের চিকিৎসার ওষুধে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর অপ্রীতিকর স্বাদ এবং মুখে ব্যবহার করলে বমি আসে বলে ঘন চিনির সিরাপ কিংবা জ্যাম, সংরক্ষিত খাদ্য বা ফ্রুক্টো-গ্লুকোজের সাথে তা ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। এদিক থেকে অন্য যে কোন মিস্ট দ্রব্যের তুলনায় মধু অনেক সুবিধাজনক, কারণ এর নিজেরও নানা আরোগ্যকর গুণাগুণ রয়েছে।

বিভিন্ন ভিটামিন ও গ্লুটামিক এসিড যুক্ত মধু মহামূল্যবান হতে পারে। মধু যে শুধু রিবোফ্ল্যাভিন ও গ্লুটামিক এসিডের অস্বস্তিকর স্বাদ দূর করে তা নয়, ভিটামিন C-র কার্যকারিতাও তা সংরক্ষণ করে থাকে। আমরা বহুভিটামিন-মধু ও গ্লুটামিক এসিডের জন্য নিম্নলিখিত

মিশ্রণের অনুমোদন করি*: সেরা একপুষ্পক মধু ১০০ গ্রাম; গ্লুটামিক এসিড ৬ গ্রাম; ভিটামিন C ২০০ মিলিগ্রাম; ভিটামিন B_1 ৪ মিলিগ্রাম; ভিটামিন B_2 ৪ মিলিগ্রাম; ভিটামিন PP (B_5) ২০ মিলিগ্রাম। এই পরিমাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজতত্ত্ব বিষয়ক কমিটি সুপারিশকৃত গ্লুটামিক এসিডের স্বীকৃত প্রতি মাত্রা-পরিমাণও ভিটামিনের মাত্রার ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

কৃত্রিম মধু

'উদ্ভিদ যে সুমিস্ট পদার্থ উৎপন্ন করে তা মধু নয়', লিখেছেন মহান রসায়নবিদ ও অনন্যসাধারণ মৌমাছি পালক (তাঁকে রাশিয়ায় বিজ্ঞানভিত্তিক মৌচাষের জনক বলেও অভিহিত করা হয়) আ. ম. বুতলেরোভ। 'কেবল তখনই তা সত্যিকারের মধুতে পরিণত হবে যখন পতঙ্গের পাকস্থলীর মাঝে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে এবং তার জলীয় অংশের কিছুটা বাষ্পীভবন হওয়ার পর তা ঘনীভূত হবে।' ঠিক তাই। কর্মী মৌমাছির পাকস্থলীর মধ্যে প্রক্রিয়াজাত হবার পরই সুধা মধুতে পরিণত হয়। সেই কারণে কর্মী মৌমাছির অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে পাওয়া 'মধু'কে প্রাকৃতিক (বা মৌমাছির) মধু বলা যায় না, তাকে কৃত্রিম মধু হিসাবে গণ্য করতে হয়।

কৃত্রিম মধু বিভিন্ন ফল থেকে তৈরী করা হয়ে থাকে। ফলের খোসা বা ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তার মাংসল অংশকে আলাদা করে তার পর কোন নিংড়ানো বা রস নিষ্কাশক যন্ত্রের সাহায্যে রস বের করে নিতে হয়। নিংড়ে নেওয়া রস কোন 'মসলিন' বা জালি কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে (খোলা সসপ্যান বা কড়াইতে করে) জলীয় অংশের বাষ্পীভবন করতে হবে যতক্ষণ না তা মধু বা ঘন রাবে পরিণত হয়।

কৃত্রিম মধু খাদ্য হিসেবে পুষ্টিকর। এতে মূলতঃ বিপরীত চিনি থাকে।

সমপরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজকে ইক্ষুচিনি, ফল-ইস্টার (ester)

---

* এই মধু তৈরীর গঠন-উপাদান, মিশ্রণ-নিয়ম ও কৃৎকৌশল সোভিয়েত ইউনিয়নের খাদ্যশিল্প মন্ত্রণালয়ের নিখিল ইউনিয়ন ভিটামিন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞ ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ও রঞ্জক দ্রব্যের সাথে মিশিয়ে ১৮৮৭ সালে Lyle কৃত্রিম মধু তৈরী করেন। Gayner যে বিশ্লেষণ করেন তাতে দেখা যায় যে, মধুর সাথে এর পার্থক্যের কারণ এতে কোন ফসফোরিক এসিড নেই। হলাণ্ডে জনপ্রিয় Beschuit Honig (বিস্কুট মধু)-এর গঠন-উপাদান এই রকম: কৃত্রিম মাখন ৩০ শতাংশ, ইক্ষুচিনি ২৯ শতাংশ, গ্লুকোজ ৪ শতাংশ, ডেক্সট্রিন ৭ শতাংশ, জল ২৯ শতাংশ, সোডা ০·৫ শতাংশ, অন্যান্য উপকরণ (ingredient) ০·৫ শতাংশ। জার্মানীতেও মধুর অনুরূপ এক রকম সিরাপ তৈরী করা হয়, যাকে কৃত্রিম মধু হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। বিশ্লেষণ করে তাতে এই সব উপাদান পাওয়া যায়: ইক্ষুচিনি ২৯·৪০ শতাংশ, বিপরীত চিনি (গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ) ৪০·৮০ শতাংশ, খনিজ লবণ ০·১ শতাংশ, জল ২৯·৭ শতাংশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েক রকমের কৃত্রিম মধু তৈরী হয়ে থাকে। সেগুলি সম্পর্কে নীচে বর্ণিত হল।

তরমুজ মধু: Citrullus vulgaris Schrad-এর ফল থেকে এই মধু তৈরী হয়। তরমুজের মণ্ডে ৮৮ থেকে ৯০ শতাংশ জল, ৫·৫ থেকে ১০·৫ শতাংশ চিনি (মূলতঃ ফ্রুক্টোজ), ০·৯৭ শতাংশ নাইট্রোজেন যুক্ত বস্তু, ০·৬ শতাংশ চর্বি, ০·৪ শতাংশ কোষীয় তন্তু ও ০·৩৬ শতাংশ খনিজ থাকে। তরমুজ মধুতে থাকে ৪১·৬ শতাংশ বিপরীত চিনি (মূলতঃ ফ্রুক্টোজ), ১৪ শতাংশ স্যাকারোজ, ১·৮৬ শতাংশ খনিজ ও ০·৩৪ শতাংশ জৈব অম্ল। ১০০ কিলোগ্রাম তরমুজ থেকে ৭—১০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া যায়।

খরমুজ মধু: Cucumis melo L.-এর ফল থেকে এই মধু পাওয়া যায়। এর মধ্যেকার চিনির পরিমাণ খরমুজের জাতের উপর নির্ভরশীল এবং তা ৪·৫ থেকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য এশিয়ায় দেরীতে পাকে এমন এক জাতের খরমুজে ১৭ শতাংশ চিনি থাকে। মধ্য এশিয়ার ৮০ শতাংশ খরমুজ মধু তৈরীতেই লাগানো হয়। খরমুজ মধুতে ৬০ শতাংশ চিনি থাকে।

পাম্পকিন মধু: পাম্পকিন (Cucurbita pepo L.) ফল থেকে এই মধু তৈরী হয়। পাম্পকিনে চিনির পরিমাণ ১১ শতাংশ। এক হেক্টর পাম্পকিনের আবাদ থেকে ২৫—৩০ সেন্টনার (১০০ কিলোগ্রাম) 'মধু' পাওয়া যায়।

খেজুর মধু: ('মরুভূমির রুটি' নামে অভিহিত) টাটকা খেজুরের রস থেকে এই মধু তৈরী হয়। দুই বৎসরেরও বেশি সময় এই মধু নির্বিঘ্নে মজুত করা যায়, নষ্ট হয় না।

মধু সংরক্ষণ

মধু বহুকাল সংরক্ষণ করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা সংরক্ষণের কথাও আমাদের জানা আছে। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, মধু খুব উঁচু মাত্রায় জলগ্রাহী। ফলে খুব সহজেই তা জল শুষে নেয় এবং তারপর গেঁজে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বাতাস থেকে জলীয় অংশ শুষে নেয় বলে আর্দ্র আবহাওয়ায় মধুর ওজন ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক ফোঁটা মধু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঈস্ট (ছত্রাক জাতীয় জৈব পদার্থ) রয়েছে (প্রধানতঃ Zugosaccharomyces বর্গের ঈষ্ট পাওয়া গেছে)। একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তা মধুর গেঁজে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, মৌচাকে বায়ুর আর্দ্রতা খুব উঁচু মাত্রার হলেও সেখানে মধু গেঁজে যায় না কেন? এর ব্যাখ্যা হল, মৌচাকের মধ্যে ৩০° সে. তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং ঐ তাপমাত্রায় ঈস্ট মধুকে গাঁজিয়ে তুলতে অক্ষম।

মধু গেঁজে যাওয়ার সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা হল ১১° সে. থেকে ১৯° সে.। সুতরাং গুদামে মধু সংরক্ষণ করতে হলে তা ৫° সে. থেকে ১০° সে. তাপমাত্রায় প্রচুর আলো-বাতাস আছে এমন শুকনো জায়গায় রাখা দরকার (মধু ঘটনাক্রমে সহজেই বাইরের যে কোন গন্ধ টেনে নেয়। তাই যে সব জায়গায় এই ধরনের জিনিষ, যেমন হেরিং মাছ, নোন্‌তা টকে-যাওয়া বাঁধাকপি (sauerkraut) কিংবা এই জাতীয় জিনিষ অথবা প্যারাফিন, আলকাতরা, পেট্রোল ইত্যাদির মত কড়া গন্ধের সামগ্রী থাকে, সেখানে মধু রাখা উচিত নয়)।

মধু আধারবন্ধ ও মোড়কবদ্ধ করার কাজেও সাবধানতা দরকার। গুদামে মধু সংরক্ষণের সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে সুবিধাজনক পন্হা হচ্ছে তা কাঁচের জারে কিংবা চকচকে প্রলেপওয়ালা মাটির কলসী বা

জালায় রাখা। দানাদার মধু সংরক্ষণের জন্য মোমের প্রলেপযুক্ত মোটা কাগজ কিংবা পার্চমেন্ট কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে। টাটকা মধুকে দানাদার করতে হলে তাতে এক সহস্রাংশ দানাদার মধুর গুঁড়া মেশালেই হল, তাতে দু-এক দিনের মধ্যেই মধুতে দানা পড়বে।

বিপুল পরিমাণ মধু গুদামে সংরক্ষণ করার জন্যে লাইম, অ্যাসপেন, অলডার, পপলার বা ২০ শতাংশের বেশি আর্দ্রতা ধারক নয় এমন কাঠ দিয়ে তৈরী পিপায় রাখতে হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরল বর্গীয় বৃক্ষের কাঠ ব্যবহার চলবে না। কারণ তাতে করে মধুতে পাইনের গন্ধ ঢুকে যাবে। ওক্ কাঠের পিপাও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, তাতে তার ভেতরের মধু কালো হয়ে যাবে।

ধাতবপাত্রে মধু সংরক্ষণ খুবই বিপজ্জনক। কারণ তাতে মধুর চিনির সাথে লোহা মিশে যায়। দস্তা, মধুর মধ্যেকার জৈব অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। বিভিন্ন রচনা থেকে জানা যায় যে, লোহা ও দস্তার পাত্রে রাখার পর মধুতে ১৯·৭৯ শতাংশ পরিমাণ ঐ সব ধাতু পাওয়া গেছে অথচ সাধারণভাবে মধুতে এগুলো ০·১৬ শতাংশ থাকে।

মধু চিহ্নিত করা ও পাত্রের গায়ে লেবেল আঁটার ব্যাপারটা ব্যবহারকারীদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধুর জাত (লিন্ডেন, বাকউইট, ব্ল্যাক লোকাস্ট ইত্যাদি), উৎপাদনের স্থান ও সময়, রং (উজ্জ্বল সোনালী, কালচে-বাদামী ইত্যাদি), ওজন (মোটামুটি ও প্রকৃত) এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি তথ্য নির্দেশ লেবেলে লেখা থাকা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

ভেষজ ও ভিটামিন-যোজিত মধু প্রাপ্তির ত্বরিত পদ্ধতি

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি
যখন মানুষের উপর জগৎকে
ব্যাখ্যা করার শুধু নয়, তাকে পরিবর্তন ও
উন্নততর করার দায়িত্ব বর্তেছে...
— ই. ভ. মিচুরিন

ত্বরিত পদ্ধতি[18]

১৯৩৯ সালে মে মাসের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে 'তাইগা'র প্রত্যন্তে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় নিকিতোভ্কা গ্রামে আমি এসে পৌঁছালাম। সেখানে বিরাট যৌথখামারে রয়েছে বেশ কয়েক'শ মৌচাক। এখানেই কয়েকটা পরীক্ষা চালাতে হবে আমাকে। মৌমাছি পালক ইভান বেজ্‌রোদ্‌নি এবং আমি দেরি না করেই আমাদের পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করে দিলাম। কয়েকটা মৌচাক ও গড়পড়তা পাঁচটার মত মৌমাছি বসতি বাছাই করা, মধুকোষগুলো সরিয়ে সেখানে খালি ফ্রেম বসানো, খাদ্যাধার প্রস্তুত করা এবং নিজেদের তৈরী দ্রবণ মৌমাছিদের খাওয়ানোর চেষ্টা চালানো — এই ছিল আমাদের তখনকার কাজ।

রাতের বেলা আমি চুপিচুপি একটা মৌচাকের কাছে এলাম। তার দেয়ালে কান চেপে ধরতেই আঁৎকে উঠে শুনি মৌমাছিদের সোচ্চার গুঞ্জন। দ্বিতীয় মৌচাকটার কাছে গেলাম, তারপর তৃতীয়টার কাছে। সেই একই ব্যাপার। মৌমাছিরা উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে, কেউ ঘুমোচ্ছে না। যে সব মৌচাক আমরা ছুঁইনি সেগুলো একেবারে শান্ত। দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এলাম ঘুমোতে।

পরদিন খুব ভোরে ইভান বেজরোদনি ও আমি মৌমাছি উদ্যানে গেলাম।

আমার মাথায় শুধু একটা চিন্তাই তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল — কৃত্রিম দ্রবণ খাওয়ানোতে মৌমাছিদের মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হল তা খুঁজে বের করতে হবে। প্রথম মৌচাকটা খোলার পর আমরা দেখতে পেলাম, খাদ্যাধার একেবারেই পরিস্কার, যেন তা চেটেপুটে খাওয়া হয়েছে। আমরা মধুকোষগুলো সরিয়ে নিতে শুরু করলাম। খোপে মধুর ফোঁটাগুলো অম্বরের মত চকচক করছিল। পরীক্ষাধীন অন্যান্য মৌচাকগুলোও এরপর যাচাই করে দেখলাম; সবগুলোতেই খাদ্যাধার একেবারে খালি আর মধুকোষগুলো টাটকা সোনালী মধুতে ভর্তি। সারারাত তাহলে মৌমাছিরা কোষে কোষে কর্মব্যস্ত ছিল। তাদের গুঞ্জনের ব্যাপারটা এবার বোধগম্য হল। বিশ্রাম না নিয়ে তারা সারারাত ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্রবণকে মধুতে পরিণত করেছে।

তখনই আরও সিরাপ তৈরী করে খাদ্যাধারে ঢেলে দেওয়া হল। মৌচাকের উপরের দিকে লাগানো কাঠের চওড়া খাদ্যাধারটিকে মনে হল সবচেয়ে সুবিধাজনক, কারণ একই সাথে অসংখ্য মৌমাছি সেগুলো থেকে খাবার খেতে পারে। এ ছাড়াও এতে তাদের আরও একটি সুবিধা, শক্তি বেশি খরচ না করে ভার নিয়ে খুব সহজেই তারা মৌচাকে নেমে আসতে পারে।

যখন নিশ্চিত হলাম যে, আমাদের দেওয়া দ্রবণ থেকেই মৌমাছিরা তাৎক্ষণিকভাবে মধু তৈরী করেছে তখন পরীক্ষাধীন মৌমাছি বসতির সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫টি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এগারটা রইলো মৌ-উদ্যানে আর বাকী চারটা নিয়ে যাওয়া হল অফিস ঘরে, যেখানে মৌখামারের কর্মচারীরা কাজকর্ম করেন। সেগুলোকে এমনভাবে রাখা হল যাতে করে মৌচাকের প্রবেশমুখ উদ্যানমুখী একটা জানালার সামনা-সামনি পড়ল। পরীক্ষাটি থেকে আমাদের এই প্রত্যয় জন্মাল যে, লোকজন কাজকর্ম করে এমন জায়গায় মৌচাক রাখলে তাতে লোকজনের কাজকর্মের যেমন ব্যাঘাত হয় না তেমনি মৌমাছিদের ক্রিয়াকলাপও নির্বিঘ্নে চলতে পারে। সুতরাং শহরে, গৃহচত্বরে অর্থাৎ যেখানে বাগান নেই সেখানেও মৌমাছিদের রাখা চলে।

ডিম, দুধ ও গোলাপগোটার (rose hip) নির্যাস মেশানো সিরাপ ঢেলে আমি খাদ্যাধার পূর্ণ করে কয়েক ফোঁটা ছড়িয়ে দিলাম ফ্রেমগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। যথোচিত কায়দায় মৌমাছিরা তাতে সাড়া দিল। পরিদর্শক

মৌমাছির প্রথম দল ফ্রেমগুলোর মাঝখানের জায়গায় হাজির হল, তারপর সেগুলো উড়ে গেল খাদ্যাধারের দিকে। খাদ্যাধারের একেবারে কিনারায় এসে তারা থামল, সাবধানে শুঁড় বের করে এই অসাধারণ বস্তুটি পরীক্ষা করে দেখল। কিছুক্ষণ পরেই তারা উড়ে এসে বসল শুকনো পাতলা কাঠের তৈরী মোম মাখানো ছোট ছোট 'নৌকা'র উপর এবং নতুন ধরনের খাবার পরখ করে দেখল। তারপর 'সুধা' রাখা খাদ্যাধারটার উপর চোখ বুলিয়ে তারা ফের উড়ে এসে বসল মধুকোষের ফ্রেমগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, অন্যান্য মৌমাছিদের জানিয়ে দিল মৌচাকের মধ্যেকার এই অসাধারণ ব্যাপার আর বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা। অন্যান্য মৌমাছিরা গণ্ডায় গণ্ডায় ছুটল তাদের পেছনে। গুনগুনিয়ে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই খাদ্যাধারটিকে ছেঁকে ধরল। এমনকি সব গুলো 'নৌকা' দখল হয়ে গেলেও তাদের নিরস্ত করা গেল না। যারা জায়গা পেল না তারা হয় অন্যদের পিঠের উপর চড়ে বসল না হয় দ্রবণে পৌঁছানোর আশায় আংটার মত পরস্পরের পা আটকে জীবন্ত শেকলের মত ঝুলে রইলো। খাদ্যাধারে এত বেশি মৌমাছি হাজির হল যে, দেখে মনে হল তা যেন ভেলভেটের কার্পেটে মোড়া।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল, তারা স্থির হয়ে বসে আছে। কিন্তু আদতে তাদের ব্যস্ততার সীমা ছিল না। শুঁড়কে পাম্পের মত ব্যবহার করে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই সুধা-দ্রবণ টেনে নিয়ে মধুকোষে নেমে পড়েছে। যারা ভার খালাস করতে পেরেছে তারা আবার ফিরে এসেছে খাদ্যাধারে। দারুণ কর্মব্যস্ততার সাথে হাজার হাজার মৌমাছি তিন-চার ঘণ্টার মধ্যেই খাদ্যাধার খালি করে ফেলল। কিন্তু তবু একেবারে খালি খাদ্যাধারটিতে নিষ্ফল আশায় বেশ কিছু মৌমাছি ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

প্রথমবার পরীক্ষার সময় প্রাথমিক পর্যবেক্ষক মৌমাছিরাই কেবল খাদ্যাধারে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই আমি লক্ষ্য করলাম, ঢাকনা খোলা মাত্রই মৌমাছিরা উপরে, খাদ্যাধারের দিকে উড়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, নবতর জীবনযাত্রায় তারা ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সুধার তালাশে এখন আর মৌচাক ছেড়ে তাদের দূরে যেতে হয় না; মৌচাকের ভেতরেই রয়েছে তাদের খাবারের উৎস। আর তাদের কাজ হল শুধু তাকে মধুতে পরিণত করা। এরপর খাদ্যাধার ভর্তির কাজ ছাড়া আর মৌচাকের ঢাকনা খোলার দরকার পড়ল না। কৃত্রিম সুধা যে

মৌমাছিদের উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৌচাকের অনুপ্রবিষ্ট আলোক রশ্মি, খাদ্যাধার পরিপূর্ণ করার সময় দ্রবণের ছড়িয়ে পড়া গন্ধ — এ সবই উদ্দীপক ও সংকেত হিসাবে কাজ করেছিল।

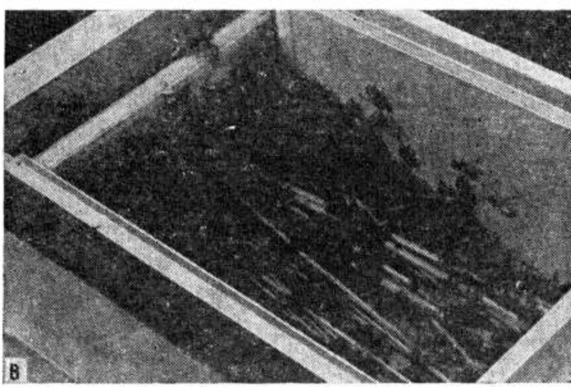
খাবারের যোগান প্রচুর থাকলে মৌচাকের সমস্ত কর্মী মৌমাছি সুধা সংগ্রহের কাজে লেগে গিয়ে তা থেকে মধু তৈরী করে। সমস্ত খোপগুলো মধুভর্তি হয়ে যায় বলে রাণী মৌমাছির ডিম পাড়ার কোন জায়গা থাকে না। আর যে-সব কোষে মধু রাখার কাজ তখনও শুরু হয় নি, এক এক ফোঁটা করে মধু লাগিয়ে রেখে কর্মী মৌমাছিরা সেগুলোও সংরক্ষিত করে রাখে। এই সময়টাতে সেখানে না থাকে কোন কাচ্চা-বাচ্চা, না থাকে আয়া, না থাকে ওস্তাদ। দ্রবণকে মধুতে পরিণত করার সবচেয়ে জরুরী কাজেই শুধু সব কর্মী মৌমাছি তখন ব্যস্ত থাকে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, 'ত্বরিত' পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে সুবিধাজনক ও সহজে ঢোকানোর মত খাদ্যাধার থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে মৌমাছি পালকের কাজ সহজতর হয় এবং মৌমাছিরাও অনায়াসে কৃত্রিম সুধা গ্রহণ করতে পারে। খাদ্যাধার কাঠের অথবা প্লাস্টিকের তৈরী হলে চলে তবে তাতে মোম-প্রলিপ্ত সরু সরু কাঠি বা 'নৌকা' থাকবে যেন সুধা খাবার সময় মৌমাছিরা সিরাপে ডুবে না যায়। প্লাস্টিকের খাদ্যাধারই আমাদের কাছে সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়েছে। পরীক্ষামূলক কাজের জন্যই শুধু নয়, শরৎকালে এবং হেমন্তে, বিশেষ করে হেমন্তে, যখন মৌমাছিরা তাদের শীতনিদ্রার জন্য চিনির সিরাপকে চিনির মধুতে পরিণত করে তখন খাবার দেবার জন্যে তা খুবই ভাল। প্লাস্টিকের তৈরী খাদ্যাধারের যে নকশা আমরা করেছি তা যেমন স্বাস্থ্যসম্মত তেমনি পরীক্ষা চালানোর কাজে এবং রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারের মৌমাছিশালায় উৎপাদনের পক্ষেও তা বেশ উপযোগী। এতে দুই ফ্রেমের ফাঁকে বড়ো জলাধারে আসা-যাওয়ার পথটা মৌমাছিদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। তা ছাড়া প্লাস্টিকের ভেলায় ফালি কাটা থাকে যেন মৌমাছিরা সিরাপ খাওয়ার সময় ডুবে না যায়।

খাদ্যাধারের প্রয়োজনীয় মেরামত সেরে সব সময় তা ভালভাবে পরিস্কার করে রাখতে হবে। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে (সকালে

বা সন্ধ্যায়) তা ভরে দিতে হবে। ভরতে হবে খুব দ্রুত, একটুও না ছড়িয়ে, যাতে করে অন্য মৌচাক থেকে মৌমাছির দল আকৃষ্ট হয়ে ছুটে না আসে।





চিত্র — ১২

A — খাদ্যাধার কৃত্রিম সুধা দ্বারা পূর্ণ করা হচ্ছে

B — কৃত্রিম সুধা পানরত মৌমাছি। এই সুধাকেই তারা প্রত্যাশিত জাতের মধুতে রূপান্তরিত করবে

ত্বরিত পদ্ধতিতে মধু তৈরীর সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে অবশ্যই খুব কড়া নজর রাখতে হবে। মৌমাছি পালকের উচিত সাদা ওভারঅল পরা এবং কৃত্রিম সুধা তৈরীর আগে নিয়মিত সাবান ও পানি

দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলা। কাঁচের বা এনামেলের পাত্রে ফুটন্ত পানিতে চিনি গলিয়ে ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ দ্রবণ তৈরী করে তাকে শীতল করে কক্ষ-তাপমাত্রায় (১৬° থেকে ২১° সে.) আনতে হবে। তারপর কৃত্রিম সুধার অন্যান্য উপকরণগুলি ঐ শীতল সিরাপে মিশিয়ে তা দ্রুত নাড়াতে হবে। যদি চিনির পরিমাণ ৫৫ শতাংশের বেশি হয় (যেমন ৬০ শতাংশ) তবে সিরাপ অতিরিক্ত আঠালো হয়ে যাবে এবং তা থেকে মৌমাছিরা মধু তৈরীতে তেমন আগ্রহী হবে না (অবশ্য অধ্যাপক Karl von Frish, যিনি মৌমাছির পাকস্থলীর ভেতরের সামগ্রী পরীক্ষা করে দেখেছেন, মনে করেন, শতকরা ৬৮ ভাগ দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে)। যখন দুধ, ফলের রস, শাকসবজি ফল ও নানারকম ঔষধি গুল্ম থেকে দ্রবণ তৈরী করা হয় তখন সেগুলোর মধ্যেকার চিনির উপাদান অবশ্যই বিবেচনায় রাখা উচিত। খাদ্যাধারে ঢালার সময় প্রস্তুত দ্রবণ যদি ঈষৎ উষ্ণ থাকে তবে তা অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে।

খাদ্যাধার সিরাপভর্তি করার পর অন্ততঃ ৭২ ঘণ্টা পার না হলে কৃত্রিম সিরাপ থেকে তৈরী মধু মৌচাক থেকে সরানো উচিত নয়, আরো ভালো হয় মধুভর্তি খোপগুলো মৌমাছিরা মোমবদ্ধ করার পর তা সরালে। এর আগে মধু বের করে নিলে তাতে ১০ শতাংশ স্যাকারোজ থেকে যায় কারণ তখন পর্যন্ত মৌমাছিদের পক্ষে সমস্ত চিনিকে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয় না। মধু নিষ্কাশন ও তা মোড়কবদ্ধ করার সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

ত্বরিত মধু অন্ধকার, শুকনো জায়গায় এমনভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে যেন সেখানে কড়া গন্ধের কোন দ্রব্য বা খাদ্য সামগ্রী (যেমন, সাউয়ের ক্রাউট, বাঁধাকপির আচার, কেরোসিন, পেট্রোল, পাইন, আলকাতরা ইত্যাদি) না থাকে।

যে সমস্ত মৌমাছিপালক স্বাস্থ্যগত পরিদর্শন ব্যতিরেকে ঝটিতি পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে মৌমাছির খাবার হিসেবে ওষুধযুক্ত কৃত্রিম সুধা দেওয়ার অনুমতি নেই। মধুর নামকরণ এমন হতে হবে যাতে করে তা কৃত্রিম সুধার মূল উপাদানের নির্দেশক হয়। অর্থাৎ, কৃত্রিম সুধার অধিকাংশ উপাদান যদি গাজরের রস হয় তবে ঐ মধুকে বলতে হবে 'গাজর মধু'। অন্যান্য মধুর নামকরণও অনুরূপ

হবে। এই পদ্ধতিতে ভিটামিন যুক্ত মধু তৈরী ক'রে তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রি করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি এবং বিশ্লেষকের কাছ থেকে মধুর অন্তর্গত ভিটামিনের পরিমাণ ও গুণাগুণের উল্লেখ সহ প্রমাণপত্র নিতে হবে।

ঔষধালয় হিসাবে মৌচাক

মৌচাক আজকাল এক ধরনের ওষুধের দোকানে পরিণত হয়েছে যেখানে অশ্চর্যজনক এক ক্ষুদে ওষুধ প্রস্তুতকারী নিম্নলিখিত জাতের ভেষজ উপাদান মিশ্রিত কৃত্রিম দ্রবণ থেকে ভেষজ মধু তৈরী করে: স্ট্রেপটোসাইড, ফাইটিন, কনভ্যাল্যারিয়া, পেপসিন, ওভারিন, ম্যমিন, স্পারম্যাটোক্রাইন, হেপাটোক্রাইন, এডোনিসাইড, গিটালিন ইত্যাদি। একটি মৌমাছি বসতিকে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে তৎক্ষণাৎ তারা ক্যালসিয়াম মধু তৈরী করল। মৌমাছির মধু-উদরে মধুর মধ্যেকার বিভিন্ন রকমের প্রাণ-রাসায়নিক উপাদানের সাথে জৈবিকভাবে ক্যালসিয়াম মিশে যায় বলে ক্যালসিয়ামের মিষ্ট দ্রবণের তুলনায় ক্যালসিয়াম মধুতে অনেক পার্থক্য থাকে।

মৌমাছিদেরকে ফক্সগ্লাভ (Digitalis purpura), অ্যাডোনিস (Adonis vernalis) ও উপত্যকার লিলির (Convallaria majalis) দ্রবণ খাইয়ে যে জাতের মধু পাওয়া যায় সেগুলোর দু'রকম গুণ থাকে। একদিকে হৃৎরক্তসংবহনতন্ত্রের উপর এগুলোর প্রভাব পড়ে, অন্যদিকে রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সামগ্রিকভাবে সাধারণ বলবর্ধক (tonic) প্রভাবও পড়ে। প্রচুর ফসফরাস সমৃদ্ধ অর্থাৎ ফাইটিন বহুল যে মধু আমরা তৈরী করেছি তা দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, রিকেট ও অন্যান্য এমন সব রোগে প্রয়োগ করা হয় যেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত ফসফরাস প্রয়োজন। ফাইটিন মধু আলাদাভাবে ফাইটিন কিংবা সাধারণ মধুর চেয়ে ভাল কারণ, এতে দু'টোরই গুণাগুণ রয়েছে।

কিছু সংখ্যক মৌমাছিকে কয়েক রকমের ওষুধ মেশানো দ্রবণ দেওয়া হয়; আর যেমন করে ওষুধ প্রস্তুতকারী ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে জটিল ওষুধ বানায়, মৌমাছিরাও তেমনি জটিল সংস্থিতির মধু বানিয়ে ফেলল। কিন্তু ভেষজী মৌমাছির দক্ষতা সে

তুলনায় বেশি, কারণ ডিমের সাদা অংশ, কুসুম, দুধ, রক্ত ইত্যাদির মত পচনশীল জৈব পদার্থ সংরক্ষণের দক্ষতা ও কৌশল তার জানা।

চারটি মৌমাছি বসতিকে বিভিন্ন রঞ্জক বস্তু মেশানো দ্রবণ পরিবেশন করা হয়েছিল। তারা পান্না-সবুজ, বেগুণী নীল, ইয়োসিন (লাল), কারমাইন (গাঢ়লাল) বা অন্যান্য রঞ্জক দেওয়া চিনির সিরাপ ভর্তি খাদ্যাধার দ্রুত খালি করে সেগুলোকে অনুরূপ রঙের মধুতে রূপান্তরিত করল। আমাদের এই সারির পরীক্ষাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সুনির্দিষ্ট আরোগ্যকর গুণাগুণ থাকবে এমন মধু পাওয়া। কোন কোন রঞ্জক নিউরোট্রোপিক (অর্থাৎ স্নায়ুতন্তু অভিমুখী প্রবণতা থাকা) বলে পরিচিত। আর কিছু রঞ্জকের রয়েছে টিউমার কোষ, অণুজীব (বিশেষ করে পুঁজোৎপাদক বিন্দুজীবাণু) বা পিয়োজনিক কক্কোস এবং ম্যালেরিয়ার প্লাজমোডিয়া জীবাণুর প্রতি আসক্তি। তাদের এই গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন ধারণা থেকে তাদেরকে কোন কোন ওষুধের পরিবাহক হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা আসে যাতে বিভিন্ন ওষুধের সাথে যুক্ত হয়ে তারা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী পদার্থকে আক্রান্ত অঙ্গে পেঁাছানোর পথ সুগম করে দেবে। মিথিলীন নীল, গ্লুকোজ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিরাময়কগুলোর পুরো অস্ত্রাগার সমেত নীল মধুর গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ থাকতে পারে। অন্যান্য রঙিন মধু সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে।

তিনটি মৌমাছি কলোনীকে এন্ডোক্রিন ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গ থেকে অন্যান্য মিশ্রণ ,যেমন থাইরয়েড (থাইরয়েড গ্রন্থি), হেপাটোক্রিন (যকৃৎ) ওভারিন (ডিম্বকোষ) ও ম্যামিন (স্তন গ্রন্থি) যুক্ত সিরাপ দেওয়া হয়েছিল। এভাবে স্পারম্যাটোক্রিন, প্যারাথাইক্রিন, প্যান্টোক্রিন, পিটুইট্রিন ইত্যাদি নিয়েও চেষ্টা চালানো হয়।

ত্বরিত পদ্ধতি বর্তমানে মধু সংগ্রহের একটি স্বীকৃত কায়দা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেক গবেষকও এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছেন। এখনকার করণীয় হচ্ছে প্রাপ্ত মধুর ভেষজতাত্ত্বিক গুণাগুণ সমীক্ষা করে দেখা। ফরাসী গবেষক Alin Caillas এই পদ্ধতিতে শুধু যে নতুন ধরনের মধু উৎপাদন করেছেন তা নয় শিশুদের উপর তার প্রতিক্রিয়াও নিদানিকভাবে সমীক্ষা করে দেখেছেন।

গাজর মধু (৫৯ নং): ইউক্রেনীয় মৌমাছিশালার পরীক্ষামূলক স্টেশনে বর্তমান লেখক গাজর মধু উৎপাদন নিয়ে পরীক্ষা চালান। লাল গাজরের রস চিনির সিরাপের সাথে মেশানো হয়। পরীক্ষাকালীন অন্যান্য বারের মত এবারও মৌমাছিরা দ্রুত খাদ্যাধার খালি করে দিল।

গাজর মধু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার কারণ হল এতে অত্যন্ত মূল্যবান পুষ্টিকর গুণাগুণ রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশী পদ্ধতির চিকিৎসায় গাজর মধু বলকারক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ক্যারোটিন বা উপভিটামিন A আবিষ্কারের পর তা নতুন তাৎপর্য পায় এবং সুনির্দিষ্ট ঘন মাত্রার ভিটামিন হিসেবে গণ্য হয়। ক্যারোটিন ছাড়াও গাজরে ভিটামিন B, C, D ও K পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যেকার উপভিটামিনের পরিমাণ রক্তের মধ্যেকার উপভিটামিনের চেয়ে ১৮গুণ এবং ভিটামিন D_2-এর পরিমাণ শূকরের যকৃতের দ্বিগুণ বেশী। এ ছাড়াও এগুলোতে প্রচুর চিনি ও খনিজ লবণ থাকে। মধুর মধ্যেকার বিভিন্ন এনজাইম, অ্যামিনো এসিড, নিরোধক ইত্যাদি সহ এই সব মূল্যবান উপাদানকে মৌমাছিরা গাজর মধুতে সম্মিলিত করে।

দুধ মধু: স্মরণাতীত কাল থেকে সব জাতিই ফুস্ফুসের রোগ, রক্তশূন্যতা ও অবসাদের চিকিৎসায় দুধ ও মধু ব্যবহার করে আসছে। ইব্নে সিনা লিখেছেন, 'গরুর দুধ দোওয়ানের সাথে সাথে তার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তনের সময় না দিয়েই সরাসরি তা ব্যবহার করা সঙ্গত। মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে তা ভেতরের আলসার পরিস্কার করে, সেটাকে দ্রুত পাকতে সাহায্য ক'রে ধুয়ে বের করে দেয়। বৃদ্ধরা যে চুলকানিতে ভোগে তার উপশম, এমনকি নিরাময়ে সাহায্য করে বলে বৃদ্ধদের জন্যেও দুধ বেশ ভাল। তবে বৃদ্ধলোকদের যদি দুধ হজম করতে হয় তবে অবশ্যই তা মধুর সাথে মিশিয়ে পান করা উচিত।'

দুধে রয়েছে পুষ্টিকর ও আরোগ্যকর নানা গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ। যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী মানুষ পেয়ে থাকে তার মধ্যে দুধের স্থান বিশিষ্ট বলে পাভলভ মনে করতেন। এটা বিভিন্ন পদার্থের সহজ যান্ত্রিক মিশ্রণ মোটেও নয়, বরং এটা মায়ের দেহের জীবন্ত কোষকলার অর্থাৎ রক্তের বিকল্প হওয়ার মত সুসমঞ্জস পদ্ধতি। দুধ ও রক্ত দুটোতেই রয়েছে আমিষ, শ্বেতসার শর্করা, চর্বি, খনিজ লবণ ও

ভিটামিন, যা কি না জীবদেহের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য অপরিহার্য। তবে, দুধে একশটির মত বিভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থ রয়েছে বলে তা দ্রুত টক হয়ে যায় এবং ফলে জমা করে রাখা যায় না। ফুটিয়ে রাখলে দুধ আরো বেশি সময় রাখা গেলেও এর ফলে কিছু এনজাইম ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। দুধের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অসুবিধাটি হল এই যে, তাতে জল থাকে। দুধ মেশানো সিরাপ থেকে মধু তৈরী করার সময় মৌমাছিরা তার মধ্যেকার মূল্যবান উপাদান বহাল রেখে তা থেকে প্রচুর পরিমাণ জলজ অপসারিত করে।

দুধ-মধু তৈরী করা খুব সহজ বলে যে কোন মৌমাছি পালক তা পেতে পারেন। টাটকা দুধে দানাদার চিনি মিশিয়ে ঘন দ্রবণ তৈরী করে নিয়ে তারপর সেইসিরাপ মৌমাছিদের খেতে দিলে তা থেকে তারা খুব দ্রুত মধু তৈরী করে। দুধ মধু দেখতে সাদাটে-হলদেটে ও মনোরম সুগন্ধযুক্ত। এর স্বাদ ফলের রসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুধ-মধুর উপর কিয়েভ খাদ্যগবেষণা ইনস্টিটিউটে চালানো রাসায়নিক ও জীবাণুতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলাফল বেশ কৌতূহলজনক: দুধ-মধুর আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·১১২৬ (১৫° সে. তাপমাত্রায়); তাতে ২০·৮ শতাংশ জল, ৭৯·২ শতাংশ শুকনো পদার্থ (১·৬২২ শতাংশ নাইট্রোজেনমূলক পদার্থ — ক্যাসিন বা পনির ছানা, অ্যালবুমিন, গ্লোবুমিন; ১·৩৩ শতাংশ চর্বি; ৩৭·২ শতাংশ গ্লুকোজ ও ল্যাক্টোজ সহ ৭৪·৭ শতাংশ চিনি; ২৫ শতাংশ ফ্রুক্টোজ; এবং ১·৪ শতাংশ খনিজ লবণ)। পিরস ও Boullier's medium-এর মত মাধ্যমে টীকা হিসেবে প্রয়োগ করার পর দুধ-মধুতে কোন রকম আন্ত্রিক রেখাজীবাণু এবং টাইফাস ও প্যারাটাইফাস রোগের কোন ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় নি।

দুধ-মধু খুবই পুষ্টিকর, বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য। সরাসরি কিংবা পানীয় হিসেবে তা গ্রহণ করা যায়। এক গ্লাস জলে (ঈষদুষ্ণ কিংবা ঠাণ্ডা) দু' চামচ দুধ-মধু মেশালে খুব চমৎকার পানীয় তৈরী হয়। দুধ ও মধু — দুয়েরই স্বাদ থাকে তাতে। দীর্ঘদিন ধরে এমনকি খোলা পাত্রে দুধমধু সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মধুর মধ্যেকার সুমিষ্ট মাধ্যম ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন C সংরক্ষণের জন্য খুবই ভাল।

রক্ত (Haematogenous) মধু: মৌমাছিদের এন্টিবায়োটিক

7*

বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৃত্রিম দ্রবণ খাইয়ে যখন নতুন ধরনের মধু আবিষ্কার করা সম্ভব হল তখন প্রশ্ন দেখা দিল, আভ্যন্তরীণ অন্তপ্রবেশের (internal infusion) ক্ষেত্রে মধুকে কাজে লাগানো যায় কি না। পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, ইউরোট্রোপিন মধুর (৪নং) জীবাণুমুক্ত দ্রবণ খরগোশের দেহে শিরাভ্যন্তরীণ ইনজেকশনের সাহায্যে পৌনঃ পুনিক প্রয়োগ হলে ইনজেকশন প্রয়োগের সাথে সাথে শ্বাসপ্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন ব্যাধিজ্ঞ লক্ষণ দেখা যায় না। দেখা গেছে যে, মধুর ঐ দ্রবণ সরাসরি রক্তে অনুপ্রবিষ্ট করা হলে তা খরগোশের সার্বিক অবস্থার উপর হিতকর প্রভাব ফেলে এবং বিশেষ করে লোহিতকণিকার ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

চিনি ও সিট্রেট রক্তের দ্রবণ থেকে তৈরী রক্তমধুর (১৩নং) পরীক্ষামূলক শিরাভ্যন্তরীণ ইনজেকশন থেকে আরও কৌতূহলজনক ফলাফল পাওয়া গেছে। মধুর সাথে লোহিতকণিকা রক্তে অনুপ্রবিষ্ট করা হলে তা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য হিতকর হওয়া উচিত। তাই আমরা অধিকতর কার্যকর হবে এই বিবেচনায় কুকুরের শরীরে গ্লুকোজের ইনজেকশন প্রদানের প্রস্তাব করি, যা সাময়িকভাবে রক্তের গঠন-উপাদান বদলে দিয়ে ও তার পুনরোৎপত্তি ঘটাতে পারবে। ইউক্রেনের বোগোমোলেত পরীক্ষামূলক জীববিজ্ঞান ও রোগতত্ত্ব ইনস্টিটিউটে D. Brusilovskaya-এর তত্ত্বাবধানে এ বিষয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। যে কুকুরটিকে এই মধু দেওয়া হয়েছিল, পরীক্ষান্তে তার অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। একই সময়ে নিয়ন্ত্রণনমুনা হিসেবে কিছু কুকুরকে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। ফলাফলগুলোর তুলনামূলক বিচারের সময় দেখা গেল যে, ১৩নং মধু গ্লুকোজের তুলনায় বেশি করে রক্তের পুনরোৎপাদন সম্পন্ন করেছে। খুবই বোধগম্য ব্যাপার। কারণ, মধুতে রয়েছে জটিল সংস্থিতি ও গঠন সহ পুরো এক প্রস্ত পদার্থ যা কোষ ও তন্তুর কাজে আসে। ভবিষ্যতে খামারের পশুদের চিকিৎসায় যে রক্তমধু শিরাভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োগ করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সম্ভবতঃ একদিন মানুষের চিকিৎসাতেও তা কাজে লাগবে।

ফল ও শাক-সবজির রস এবং ভেষজ পদার্থের মধু: ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে কিরঘিজিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের একটি মৌমাছি উদ্যানে আমরা ফল ও শাক-সবজির নানারকম ভিটামিনযুক্ত

রস থেকে মধু তৈরীর জন্য মৌমাছিদের উদ্বুদ্ধ করি। এই পন্থায় আমরা নিম্নলিখিত জাতের মধুগুলো পেয়েছিলাম:

১. ব্যাকটেরিয়াফ্যাজ বহুভিটামিন মধু (৬৩ নং) — এতে রয়েছে আমাশয়ের জীবাণু ধ্বংসকারী ব্যাকটেরিয়াফ্যাজ এবং ভিটামিন A, B, PP, ও D;

২. পেনিসিলিন বহু-ভিটামিন মধু (৬৪ নং) — এটি পেনিসিলিন এবং ভিটামিন A, B, PP, C ও D-এর দ্রবণ থেকে প্রস্তুত;

৩. গাজর ও বাঁধাকপির মধু (৬৫ নং) — গাজর ও বাঁধাকপির রস থেকে প্রস্তুত;

৪. ডিমের কুসুম-ক্যালসিয়াম-বহুভিটামিন মধু (৬৬ নং) — ডিমের কুসুম, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ভিটামিন C, PP, B ও K-এর দ্রবণ থেকে মৌমাছি দ্বারা প্রস্তুত;

৫. আমিষ বহুভিটামিন মধু (৬৭ নং) — ডিমের সাদা অংশ এবং ভিটামিন C, PP, B ও K-এর দ্রবণ থেকে প্রস্তুত;

৬. চকলেট বহুভিটামিন মধু (৬৮ নং) — চকলেট, দুধ এবং ভিটামিন A, D, ও E-এর দ্রবণ থেকে প্রস্তুত;

৭. গোলাপ গোটা ও বাঁধাকপি মধু (৬৯ নং) — রোজহিপ ও বাঁধাকপির রসের মিশ্রণ থেকে প্রস্তুত।

৮. ব্ল্যাক কুরাণ্ট (কালো আঙ্গুর) মধু (৭০ নং) — ব্ল্যাককুরান্ট-এর দ্রবণ থেকে তৈরী।

তরিতরকারী — ক্ষেতের সবচেয়ে সস্তা ফসল, এমনকি আগাছার রস দিয়ে তৈরী মিষ্টি সিরাপ মৌমাছিদের খেতে দিয়ে উঁচু মাত্রার পুষ্টিকর মধুও আমরা পেয়েছি। এই ধরনের কৃত্রিম দ্রবণে এমন অনেক পদার্থ থাকে যা মৌমাছিদের নিজেদের জন্যও ভাল। মিষ্টি কুমড়ার রসে গাজরের রসের মত প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন C এবং রক্ত বা মায়ের দুধের চেয়ে দশ গুণেরও বেশী ভিটামিন A থাকে। গরুর খাঁটি দুধে যে পরিমাণ উপভিটামিন A থাকে তার প্রায় ১৭ গুণ থাকে বীটের কাণ্ডে। উপভিটামিন A ছাড়াও বাঁধাকপির পাতায় শূকরের যকৃতের তুলনায় চার গুণ বেশী ভিটামিন K (রক্তরোধক) থাকে। নতুন গজানো টাটকা বিছুটি (nettle) পাতায় যে উপভিটামিন A থাকে তা মাখনের তুলনায় দ্বিগুণ ও গরুর খাঁটি দুধের তুলনায় ৫৬ গুণ বেশি

কার্যকর। আপেল, বাঁধাকপির বাইরের দিককার পাতা, তরমুজে, টমেটো, ভুট্টার বোঁটা ও গোলাপগোটার রস থেকে উঁচুমাত্রায় পুষ্টিকর মধু পাওয়া গিয়েছিল। বীটমূলের রস, গোলাপগোটার তরল নির্যাস এবং চেরী পাতার চোলাই রস মেশানো কৃত্রিম সুধা থেকে মৌমাছিরা বীটমূল মধু ও গোলাপগোটা মধু তৈরী করেছিল। চিনির পরিবর্তে নষ্ট খাবার (সুগার গাম্পশন, প্রসেস-কৃত গ্লুকোজ ইত্যাদি) কাজে লাগানো হয়। এই পন্থায় প্রস্তুত ৮২ নম্বর মধু দেখতে লাল, তবে চেরীর মত মনোরম স্বাদগন্ধযুক্ত। খেয়ে অনেকে ভেবেছেন যে, মিষ্টি চেরির রসে তা তৈরী।

জিনসেং (Ginseng) মধু: চীনা ওষুধশাস্ত্রে জিনসেং (Panax ginseng)-এর মূলকে অমূল্য নিরাময়ক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। একে অভিহিত করা হয় 'বিশ্বের বিস্ময় ও অমরত্বের উপহার' বলে। চীনাভাষায় জিনসেং-এর অর্থ হল, 'মানব মূল'। এর অন্য নাম হচ্ছে জিনবাও বা 'স্বর্গীয় ওষধি'। জিনসেং Araliaceae-এর অন্তর্গত এবং দেখতে অনেকটা পার্সনিপ (গাজরবৎ উদ্ভিদ)-এর মত। পরিচিত সব রকমের উদ্ভিদের সাথে এর গুণগত পার্থক্য আছে।

চীনা, কোরীয় ও অন্যান্য এশীয় লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে জিনসেং ব্যবহার করে আসছে। জিনসেং-এর চোলাই করা রস বলকারক, উদ্দীপক ও প্রশান্তিদায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সব রকমের রোগের চিকিৎসায় এর হিতকর প্রভাব রয়েছে। চীন ও তিব্বতে স্নায়ুতন্ত্রের রোগে জিনসেং মধুকে নিরাময়ক হিসেবে সুপারিশ করা হয়। জিনসেং-এর স্বাদ অপ্রীতিকর ও কষালো বলে এর নির্যাসের সাথে মধু মেশানো হলে স্বাদগন্ধ উন্নত হয়। আমাদের চিন্তা ছিল, ত্বরিত পদ্ধতিতে জিনসেং মধু পাওয়া গেলে মধু ও জিনসেং আলাদা আলাদাভাবে জীবদেহে যতটুকু কার্যকর তার চেয়ে জিনসেংমধু অধিকতর কার্যকর হবে।

একটি মৌমাছি বসতিকে জিনসেং সুধা দেওয়া হলে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি তৎপরতার সাথে রাণী মৌমাছি মধু কোষে ডিম পাড়তে লাগল। প্রথম দিকে এটা একটা ঝামেলা বলে মনে হল, কারণ মধুকোষগুলো মধুভর্তি না হয়ে ডিমে ভর্তি হতে লাগল আর মৌমাছিরা মধু তৈরী করার বদলে নতুন নতুন মধুকোষ বানানোর কাজে

ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঐ কারণে আমরা মৌচাক থেকে রাণীকে সরিয়ে দিলাম। কর্মী মৌমাছিরা তখন কয়েকদিন ধরে কৃত্রিম জিনসেং সুধা থেকে মধু তৈরী করল, রাণী যে নেই সেটা তারা খেয়ালই করল না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থা হলে সাথে সাথেই তারা রাণীর অনুপস্থিতি টের পেয়ে যেত এবং তাঁর খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। এ থেকে আমাদের চিন্তায় এল যে, জিনসেং-এ কোন এক ধরনের হরমোন জাতীয় পদার্থ আছে যা সম্ভবতঃ উদ্দীপক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

বন্য জিনসেং-এর মূলে যৌনউদ্দীপক উপাদান আছে বলে ডাঃ I. I. Brechman[19)] যে অভিমত পোষণ করেন তা সম্ভবতঃ সঠিক। Ginsburg-ও ঠিক একই মত পোষণ করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, 'জিনসেং-এ যৌনউদ্দীপক ক্ষমতা রয়েছে এবং তা মরদ ও মাদী ইঁদুরের দেহে শিশুকালেই যৌন অঙ্গের বিকাশকে ত্বরাণ্বিত করে। এই ক্রিয়াশীলতা শীত ও হেমন্তের মাসগুলিতেই অধিকতর কার্যকর হতে দেখা যায়।'[20)]

কৃত্রিম সুধা গ্লুকোজ দিয়ে তৈরী করা হয় বলে মধুকোষের মধ্যেই জিনসেঙ মধুর দানা পড়ে। এই মধু অন্যান্য মধুর মত আঠালো নয়। তা সহজেই কাগজের মোড়কে বা কার্টুনে সংরক্ষণ করা যায়। এর স্বাদ মনোরম ও সৌরভ রুচিকর। একে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হয়। তখন তা মধু ও মোমের পাৎলা বিস্কুটের রূপ নেয় এবং তা চিবিয়ে খেতে হয়।

পাইন মধু: এই মধু তৈরী হয় পাইনের পাতার তরল নির্যাস মেশানো চিনির সিরাপ থেকে। শীতকালে ২১° সে. বায়ু-তাপমাত্রায় কাঁচের চাষঘরে পরীক্ষাগুলো চালানো হয়েছিল। মৌমাছিরা খুব দ্রুত মিষ্ট তরল নির্যাসকে প্রক্রিয়ায় ফেলে মধু তৈরী করে মধুকোষে রাখল। সাতদিন পরে দেখা গেল মধুকোষের একটা অংশ তারা ইতিমধ্যেই মোমবদ্ধ করে ফেলেছে। সচরাচর যেমন করা হয়, কয়েকটি কোষ থেকে মধু সরিয়ে নেওয়া হল। দেখা গেল, সবুজ আভাযুক্ত অম্বর রঙের এই মধুর স্বাদ মনোরম, তবে তাতে রয়েছে পাইন-আলকাতরার ক্ষীণ গন্ধ।

সারা শীতকাল ধরেই মৌমাছিদের কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে হেমন্তের শুরু থেকেই তাদের রাখতে হবে উষ্ণ ঘরে যেন তাদের কাজকর্ম

বাধাপ্রাপ্ত না হয়। একবার যদি কোন মৌমাছি বসতি শীতনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে কিছুতেই আর তাদেরকে শীতকালে মধু বানানোর কাজে লাগানো যাবে না।

পাইনের দ্রবণ খাইয়ে দেখা গেছে যে, পাইন দ্রবণ না দেওয়া নিয়ন্ত্রক মৌচাকগুলোর তুলনায় পরীক্ষাধীন মৌচাকগুলোতে বাচ্চা-কাচ্চা বেড়েছে চারগুণ বেশি এবং মার্চ মাসেই তরুণ কর্মী মৌমাছিদের আবির্ভাব ঘটেছে।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের সূঁচালো পাতাগুলি ঘন ভিটামিন সমৃদ্ধ। পাইনের সরু পাতায় আলুর তুলনায় দশগুণ, আপেলের তুলনায় সাতগুণ ও লেবুর তুলনায় ৪ গুণ বেশি ভিটামিন থাকে। শূকরের যকৃতে যতটা ভিটামিন K থাকে পাইনের পাতায় থাকে তার দ্বিগুণ। এই পাতার উপভিটামিন A শূকরের মাংসের তুলনায় একশ গুণ ও রক্তের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ বেশি। সর্বত্র পাইন, ফার ও স্প্রুস-এর যে প্রাচুর্য তার অর্থ হল ভিটামিন উপাদান সমৃদ্ধ নির্যাস তৈরীর ক্ষেত্রে কোন অসুবিধাই নেই। এটা মৌমাছিদের প্রলুব্ধ ক'রে দ্রুত ও সহজ প্রক্রিয়ায় ভিটামিন সমৃদ্ধ মধু তৈরী সম্ভব করে তুলেছে।

ত্বরিত পদ্ধতির সুবিধা

দ্রুত পদ্ধতি ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক ও জৈব গঠন-উপাদানের যে কোন ধরনের মধু পাওয়া সম্ভব। এমনকি কুইনাইন, এণ্টিবায়োটিক ইত্যাদির অপ্রীতিকর স্বাদ-গন্ধযুক্ত ওষুধ জাতীয় পদার্থ থেকেও মৌমাছিরা মধু তৈরী করবে। ওষুধের স্বাদ ও গন্ধের সাথে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য প্রথম দিকে অল্প করে এগুলি চিনির দ্রবণের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং পরে একটু একটু করে তা বাড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে অপ্রীতিকর মিষ্টি দ্রবণের প্রতি মৌমাছিদের প্রতিবর্তী ক্রিয়া দ্রুত গড়ে ওঠে (বলে আমাদের মনে হয়) এবং তারা চটপট তা থেকে মধু বানাতে শুরু করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর প্রাচ্য, ইউক্রেন, মধ্য এশিয়া, উরাল ও অন্যান্য অঞ্চলে যে-সব পরীক্ষা চালানো হয় তা থেকে দেখা যায় যে, যে কোন আবহাওয়ায়, যে কোন ঋতুতে এবং মৌমাছিদের উপর যতই

চাপ পড়ুক না কেন, সর্বত্রই মধু সংগ্রহের জন্য ত্বরিত পদ্ধতি ব্যবহার করা চলে। এই পদ্ধতি আর্থিক দিক থেকেও সুবিধাজনক ও খুবই পরিমিত ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ, প্রস্ফুটিত সুধাময় উদ্ভিদের তালাশে বের হলে মৌমাছিদের যে পরিমাণ খাবার লাগে এই পদ্ধতিতে মৌমাছিদের তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ কৃত্রিম সুধা দিতে হয়। হেমন্তের মাসগুলোতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শুধু যে প্রয়োজনীয় উপাদান যুক্ত মধু পাওয়া যায় তা নয় উপরন্তু, সারা শীতকাল ধরে মৌমাছিদের খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় টনকে-টন প্রাকৃতিক মধুও বাঁচানো সম্ভবপর হয়। মৌমাছি পালকরা লক্ষ্য করেছেন যে, বিভিন্ন ভিটামিন, ভেষজ, এন্টিবায়োটিক ও ভোজ্য পদার্থ থেকে যে কৃত্রিম সুধা বানানো হয় তা মৌমাছিদের দেহের উপরও হিতকর প্রভাব ফেলে। এর ফলে তাদের কজা করার ক্ষমতা এবং বাইরের ক্ষতিকর উপাদান ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ইর্কুত্স্ক অঞ্চলের মৌমাছি পালকরা ব্যাপকহারে যে-সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯৫৯ সালে R. Chernigovskaya[21)], ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে সেরা খামার কালিনিন যৌথ খামারের মৌমাছি পালক G. S. Timofeev-এর পাওয়া ফলাফলের তথ্য প্রদান করেন। খামারের ৭০টি মৌমাছি বসতির মধ্যে ২০টি কে পরীক্ষায় কাজে লাগানো হয়েছিল। পরীক্ষাধীন মৌচাকগুলোকে প্রতি গ্রুপে পাঁচটি করে মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। তিনটি গ্রুপকে ২০ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত অতিরিক্ত পরিপুরক খাবার দেওয়া হয়। চতুর্থ (নিয়ন্ত্রক) গ্রুপটিকে অতিরিক্ত কিছুই দেওয়া হয়নি। প্রথম গ্রুপকে দৈনিক ২০০ গ্রাম করে পেনিসিলিন যুক্ত চিনির সিরাপ দেওয়া হল (১ কিলোগ্রাম চিনি ও প্রতি লিটার পানিতে ৫০ ০০০ I.U পেনিসিলিন); দ্বিতীয় গ্রুপকে দৈনিক ‘২০০ গ্রাম করে টক খাবার (১:১ অনুপাতে প্রতি লিটারে ৭০০ মিলিগ্রাম সাইট্রিক এসিড যুক্ত চিনির সিরাপ) দেওয়া হল; তৃতীয় গ্রুপটিকে শুধু সমপরিমাণ চিনির সিরাপ খাওয়ানো হল। পুরো শীতকালটায় মৌমাছিদের খাওয়ান বাদ দিয়ে ৭০টি মৌচাকের গড়পরতা ফলন হয়েছিল ৫০·৫ কিলোগ্রাম মধু ও ১·৫ কিলোগ্রাম মোম। পরীক্ষাধীন মৌচাকগুলোর ফলন ছিল এই রকম (পড়ন্ত হিমেল বসন্তকে হিসেবে ধরে): প্রথম গ্রুপ — ৮২

কিলোগ্রাম মধু ও ২ কিলোগ্রাম মোম; দ্বিতীয় গ্রুপ — ৬৩ কিলোগ্রাম মধু ও ১·১ কিলোগ্রাম মোম; তৃতীয় গ্রুপ — ৫০ কিলোগ্রাম মধু ও ১·০ কিলোগ্রাম মোম এবং চতুর্থ গ্রুপ — ২৫ কিলোগ্রাম মধু ও ০·৫ কিলোগ্রাম মোম।

মস্কো পশুচিকিৎসা একাডেমীর প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ ১৯৫৯ সালে ১২টি মৌচাক নিয়ে (৬টি নিয়ন্ত্রক) পরীক্ষা চালানোর সময় এটা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হল যে, ৩০ ০০০ I. U. পরিমাণ এণ্টিবায়োটিক যুক্ত (পেনিসিলিন, বায়োমাইসিন, ডিহাইড্রো-স্ট্রেপটোমাইসিন কিংবা টেরামাইসিন) চিনির সিরাপ সপ্তাহে তিনবার করে মৌমাছিদের দেওয়া হলে মৌচাকপ্রতি মধুর ফলন বেড়ে যায়। নিয়ন্ত্রক মৌচাকে (শুধু চিনির সিরাপ দেওয়া হয়েছিল) মধুর ফলন যখন ১৯ কিলোগ্রাম তখন অন্য মৌচাকগুলিতে তা বেড়ে হল ৪১·৬ থেকে ৫২ কিলোগ্রাম। ১৯৬০ সালে তিমিরিয়াজেভ কৃষি একাডেমীর মৌখামারেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে সাইবেরিয়া ও মোলদাভিয়ায় রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলির মৌমাছিশালার ফলাফলও অনুরূপ ছিল। আরও দেখা যায় যে, এন্টিবায়োটিক দেওয়া হলে মৌমাছিরা দীর্ঘজীবী হয় আর রাণী মৌমাছি সাধারণ অবস্থার তুলনায় বেশি করে ডিম পাড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

ওষুধ ও প্রতিষেধক হিসাবে মধু

তোর ছোট ডানা দুটো ডুবা এই মধুতে
শোভন পালক তোর সিক্ত হোক তাঁর মিস্টতায়
হেথায় আন্‌রে তুই মহান স্রষ্টার
সর্ব প্রাচুর্যময় অমৃত সুধা
তা ঘুচিয়ে দেবে আমার বীরের যন্ত্রণা
তা সারিয়ে তুলবে তার আহত কোষকলা
তা ফিরিয়ে দেবে তোর বহুদিনের হারানো
দৃষ্টি

— কালেভালা

মূল্যবান পথ্য-উপাদান হিসেবে শুধু নয়, নিরাময়কারী ও প্রতিষেধক ওষুধ হিসেবেও বহুকাল ধরে ভেষজশাস্ত্রে মধুর ব্যবহার প্রচলিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ১৫৫৩-১৫৫০ অব্দের মত সুদূর অতীতে মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন ভেষজ প্যাপিরাস লিপিতে ইংগিত পাওয়া যায় যে, তখন ক্ষত নিরাময়ে, প্রস্রাব হওয়ানো ও পেটের আরামের জন্য মধু ব্যবহারের চল ছিল। মেসোপটেমিয়া ও অ্যাসীরিয়াতেও ক্ষত নিরাময়ে মধু ব্যবহৃত হত। অসুর-বাণী-পালের গ্রন্হাগারে প্রাপ্ত ফলকে লিখিত প্রতিষেধকসমূহের মধ্যে মধুর উল্লেখ ছিল।

ভেষজ শাস্ত্রে মনে করা হত যে, ভারতীয় মধু একাধারে নিরামক ও বলবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। 'আনন্দদায়ক' ও 'যৌবন সংরক্ষক' হিসেবে যে-সব টনিক ব্যবহারের সুপারিশ করা হত, মূলতঃ তৈরী হত মধু দিয়ে। আর কোন খাবারে প্রধান খাদ্যবস্তু হিসেবে মধু ও দুধ থাকলে তাকে দীর্ঘায়ুদায়ক খাবার হিসাবে ভাবা হত।

প্রাচীন গ্রীসে মধুকে প্রকৃতির অন্যতম মূল্যবান দান হিসেবে বিবেচনা করা হত। ভালোভাবে বাঁচা ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার উপায় সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হলে পরমাণুতত্ত্বের জনক গ্রীক দার্শনিক

ডেমোক্রিটাস বলতেন, বাইরে তেলের প্রলেপ আর ভেতরে মধুর প্রলেপ দেওয়ার কথা। মহান গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটস বহু রকম রোগে ব্যাপক ভাবে মধু ব্যবহারের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে সফল হয়েছেন। তিনি বলেছেন, অন্যান্য খাবারের সাথে মধু ব্যবহার পুষ্টিকর এবং তা গায়ের রং উজ্জ্বল করে। বিশিষ্ট রোমান চিকিৎসক গ্যালেন মধুকে সর্বরোগহর বলে বিবেচনা করতেন। নানা রকম বিষক্রিয়ায়, আন্ত্রিক প্রদাহে এবং বিশেষ করে পচনশীল মুখবিবরের পীড়ায় তিনি মধু ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন।

পরবর্তীকালে আরব প্রাচ্য চিকিৎসকরা ব্যাপক হারে মধুর ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিত ইব্‌ন সিনা (বা আভিসিনা) তাঁর 'কানোন'-এ যে অসংখ্য ব্যবস্থাপত্র দেন তার উপকরণের মধ্যে মধু ও মোম অন্তর্ভুক্ত ছিল। পন্ডিত ও দার্শনিকরা যে ভেষজ জাউ খেতেন সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'সর্দিতে তা আপনার উপকারে আসবে, আপনাকে প্রফুল্ল করে তুলবে, নিজেকে পুরোপুরি কর্মক্ষম মনে হবে ও তা খাবারের পরিপাক সহজতর করে, পেটে বাতাস হয় না ও ক্ষুধা বাড়ায়। এ যেন ঠিক যৌবন ধরে রাখা। তা স্মরণশক্তি ভালো করে, বুদ্ধিকে তীক্ষ্ন করে, কথায় ফোয়ারা তোলে...'। মধুর শোষণ গুণ রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। ক্ষত নিরাময়ের জন্য তিনি জল ব্যতিরেকে শুধু মধু ও গমের আটা দিয়ে তৈরী একরকম পাতলা বিস্কুট (tapitma) ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। ক্ষতের উপরিভাগে তা লাগিয়ে রেখে বারো ঘণ্টা অন্তর বদলাতে হত। নতুন কোষকলা না গজানো পর্যন্ত এই রীতিতে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হত। ইব্‌নে সিনা আরও লিখেছেন, জীবাণুদুষ্ট গভীর ক্ষতে মধু বেশ ফলদায়ক।

লোকজ ঔষধেও মধুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষেধক বলে বিবেচনা করা হত। হিপোক্রেটস লিখেছেন, 'নিরাময়ের জন্য কোন্ জিনিসটা ভাল তা সাধারণ লোককে জিজ্ঞেস করায় ভয়ের কিছুই নেই; কারণ, আমার বিশ্বাস, ভেষজকলার আবিস্কার মোটামুটি এভাবেই হয়েছে।' পর্যবেক্ষণ ও লোক প্রজ্ঞার (folk wisdom) মধ্য দিয়ে মানুষ কালে কালে বহু মূল্যবান আবিস্কার করেছে যা ভেষজবিদ্যা ও রোগ নিরাময় কৌশলের উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধন করেছে। ফক্সগ্লোভ, আডোনিস,

কুইনাইন, আফিম, অ্যাট্রোফিন, কোকেন ও অন্যান্য রোগবারক ওষুধ দেশীয় ভেষজশাস্ত্র থেকেই এসেছে।

আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, মধুকে রোগ নিরামক হিসেবে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। কী কারণে এটা নিরাময়ক? মূল কারণ হলো এর গ্লুকোজ যা হৃৎসংবহনতন্ত্রকে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও মধুতে রয়েছে অন্যান্য বহু উপাদান যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়।

ক্ষতের চিকিৎসা

লোকজ ওষুধে ও সুদূর অতীত কালে ক্ষত নিরাময়ে মধু ব্যবহৃত হত। প্লিনী লিখেছেন যে, সংক্রমিত ক্ষতে ও মুখের ঘা'য়ে মধু যুক্ত চর্বি বেশ উপকারী। মধ্যযুগে মধু যুক্ত ওয়েফার ব্যবহার করে অভিসিনা (ইব্‌ন সিনা) যে ক্ষত সারিয়েছেন তা আগেই বলা হয়েছে। মধ্যযুগের রাশিয়ায় ক্ষত নিরাময়ে পাইন আলকাতরা ও মধু দিয়ে তৈরী মলম লাগান হত। রোগের প্রতিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাচীন রুশী পাণ্ডুলিপিতে প্রায়ই বলা হয়েছে: 'মধু ক্ষতের দুর্গন্ধ দূর করে।' পরবর্তীকালে ক্ষতের নিরাময়ে ব্যাপকভাবে মধু ও মাছের তেলের ব্যবহার হয়েছে। এতে দশ-বারো দিন পরে ক্ষত নিরাময় হত, তবে ক্ষতচিহ্ন থেকে যেত।

১৯৩৮ সালে সোভিয়েত শল্য চিকিৎসক ইয়া. ম. ক্রিনিৎস্কি সংক্রমিত ও অপচিত ক্ষতে আক্রান্ত ৪৮ জন রোগীকে মধু ও চর্বির মলম দিয়ে ভাল ফল পান।[22] পাঁচ দিন পর ৯০ শতাংশ রোগীর দেহের বিনষ্ট কোষকলা অপসারিত হতে থাকে এবং সে জায়গায় নতুন উপঝিল্লি গজিয়ে ওঠে। এ থেকে ক্রিনিৎস্কির সিদ্ধান্ত, ক্ষতে গ্লুটাথিওনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে মধু ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জারন-বিজারন প্রক্রিয়ায় গ্লুটাথিওনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং তা কোষবৃদ্ধি ও কোষ বিভাজন ত্বরান্বিত করে)।

১৯৪৬ সালে অধ্যাপক স. আ. স্মিরনভ (তোমস্ক মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট) মধু প্রয়োগ করে ৭৫ জন রোগীর গুলিবিদ্ধ-ক্ষতের

চিকিৎসা করে দেখতে পান যে, মধু ক্ষতের কোষকলা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।[23)]

ডাক্তার ও শল্য চিকিৎসকদের আরও বহু অভিজ্ঞতার কথা এখানে উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। বহুশ্রদ্ধেয় ইউক্রেনীয় চিকিৎসক আ. স. বুদাই তাঁর গ্রামীন চিকিৎসায় ৮০ গ্রাম মধু, ২০ গ্রাম মাছের তেল ও ৩ গ্রাম জেরোফর্ম যুক্ত মলম দিয়ে ধীর নিরাময়শীল ক্ষত ও আলসারের চিকিৎসা করেছেন। মধু ও জেরোফর্ম হামানদিস্তায় পিষে মাছের তেল ভালভাবে মিশিয়ে এই মলম তৈরী করা হয়।[24)] খুব সম্প্রতি আমি নিজেও মধু ও সামুদ্রিক বাকথ্রোন-এর তেল মেশানো লবণ লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, তা অধিকতর কার্যকর। তবে মাছের তেল ও জেরোফর্ম অনেকের ক্ষেত্রেই — এলার্জি।

১৯৪৬ সালে A. E. Gel'fman একটি উদবাসন হাসপাতালে তাড়িত সঞ্চারিত (electrophoresis) মধু দিয়ে কিছু রোগীর অবশ ক্ষত চিকিৎসা করেন বলে জানা যায়।[25] গুলিবদ্ধ ক্ষত, অস্থিভঙ্গ ও অস্থিমজ্জাপ্রদাহে জটিল অবস্থায় উপনীত ৩৫ জন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, মধুর তাড়িত সঞ্চারণ ক্ষতাঙ্কুরের বিকাশ তৎপরতাকে প্রভাবিত করে। চিকিৎসার পর দেখা গেল পুঁজময় রক্তশূন্য তুলতুলে কণায় ঢাকা ক্ষত পরিস্কার হয়ে উঠেছে, স্বচ্ছন্দে তাতে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে এবং সেগুলো সেরে উঠতে শুরু করেছে।

মধু প্রশ্বাসন

ঊর্ধ শ্বাসনালীতে মধু প্রশ্বাসনে ভাল নিরাময়িক ফল পাওয়া যায়। ডাঃ ইয়া. কিসেলস্টেইন-এর পর্যবেক্ষণের যে প্রতিবেদন ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে তা বেশ চমকপ্রদ। সাধারণ শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রকে তিনি জলীয় দ্রবণ পরমাণুকনায় পরিবর্তিত করার উপযোগী করে নেন এবং তার সাহায্যে প্রশ্বাসনে মধুর ১০ শতাংশ দ্রবণ ব্যবহার করেন। চিকিৎসার প্রতিটি পর্যায়কাল ছিল পাঁচ মিনিট। ৩২ বৎসর বয়স্ক তাঁর একজন রোগী বহু বছর ধরে গলবিলের শুষ্কতার কষ্ট পাচ্ছিল এবং তার কন্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছিল। তার নাসিকার শ্লেষ্মাঝিল্লি ও গলবিলের পশ্চাদভাগ কমবেশি স্বাভাবিক থাকলেও স্বরযন্ত্রের ঝিল্লি ও

শ্বাসনালীর উপরিভাগ পুঁজোৎপাদী মামড়ীতে ঢাকা পড়ে। সাতবার শ্বাস নেওয়ার পর দেখা গেল, রোগী ভাল বোধ করছে এবং তার মামড়ী ও ফ্যাঁসফেসেভাবে চলে গেছে।

মধু প্রশ্বাসন প্রক্রিয়ায় যে ২০ জনের চিকিৎসা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দু'জনের কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি। মধু প্রশ্বাসন শুরু করার আগেও সংশ্লিষ্ট সব কজন রোগীকে পর্যবেক্ষণে রেখে প্রচলিত সাধারণ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং তাতে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি চোখে পড়েনি।

শ্বাসের সাথে শুধু গ্রহণ করা হলে মধু ন্যাসিকা ও গলার শ্লেষ্মাঝিল্লিতে কাজ করে না, ফুসফুসের বায়ুকন্দরেও (এর মধ্য দিয়েই তা রক্তে প্রবেশ করে) তা কার্যকর প্রভাব ফেলে। এইভাবে তা যেমন স্থানীয়ভাবে ব্যাকটেরিয়া নাশকের কাজ করে, তেমনি (সাধারণভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। ডাঃ কিসেলস্টেইন মধু প্রশ্বাসনের নিরাময়িক কার্যকারিতার কারণ হিসেবে মধুর মধ্যেকার যে ভিটামিনকে ধরে নিয়েছিলেন, তা সঠিক নয়· আর সত্যি বলতে কি এর মধ্যে ভিটামিনের মাত্রাও কম। আমরা তাই ভিটামিন C, B ও A সমৃদ্ধ ৫ ও ১০ শতাংশ মধুর দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। অর্জিত ফলাফল আমাদের প্রত্যাশাকে বিপুলভাবে ছাড়িয়ে গেল আর যে-সব রোগীকে এভাবে চিকিৎসা করা হল তারা আরও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। ১৯৬৭ সালে বুলগেরীয় চিকিৎসক শুমোইর স্লাদেনভ ঊর্ধ্ব শ্বাসনালীর রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় মধু প্রশ্বাসন পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে সফল হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[26] মধু প্রশ্বাসন বাড়িতেও সহজে করা যায়। তবে অবশ্যই ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে তা হতে হবে।

প্রাচীন কাল থেকে সর্দি জাতীয় রোগের সর্বরোগহর দাওয়াই হিসেবে মধুর সুখ্যাতি আছে। তবে এ গুণ আলাদা করে কেবল মধুর নয়, অন্য খাদ্য বা অন্য ওষুধের সাথে মিলিয়েই। কেউ ঠাণ্ডায় কষ্ট পেলে তাকে ঈষদুষ্ণ দুধের সাথে (১ গ্লাস দুধে এক টেবিল-চামচ মধু) কিংবা লেবুর রসের (১০০ গ্রাম মধুর সাথে ১টি লেবুর রস) সাথে মধু খেতে দেওয়া হত। একটি ভাল প্রতিকারক হচ্ছে ১:১ অনুপাতে সজিনার রস ও মধুর সিরাপ।

ঠাণ্ডার জন্যে রোগীকে মধু খেতে দেওয়া হলে রোগীর উচিত বিছানায় শুয়ে, আর না হয় অন্ততঃ বাড়ি থেকে বের না হওয়া। কারণ, মধু খেলে প্রচুর ঘাম হয়। বিশেষ করে লিন্ডেন মধু বেশ ভাল জাতের ঘর্মনিঃসারক। ফুস্‌ফুসের রোগে স্মরণাতীত কাল থেকেই মধুর ব্যবহার চলে আসছে। হিপোক্রাটিস লিখেছেন, 'মধু কফ্ সারায় এবং কাশি প্রশমিত করে'। ইব্‌নে সিনা যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগীকে মধু ও গোলাপ-পাপড়ির মিশ্রণ খেতে দিতেন। মধ্যাহ্নের আগে এটা ব্যবহার করলে বেশি উপকার পাওয়া যায় বলে তাঁর ধারণা ছিল। তিনি আরও মনে করতেন, হেজেল বাদাম ও মধু পুরোনো কাশরোগে উপকারী এবং তা শ্লেষ্মা নির্গমন সহজতর করে।

সপ্তদশ শতকের রুশী ভেষজ চিকিৎসার সংকলনে আমরা পড়েছি, 'মধু স্বর্গীয় শিশির-মেশানো রস। চমৎকার আবহাওয়ায় মৌমাছিরা সুরভিত ফুল থেকে তা আহরণ করে এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় তার নিরাময়কর অনেক গুণ রয়েছে।'

'মধু ক্ষতকে দুর্গন্ধ-মুক্ত করে, অক্ষিগোলকে প্রলেপ হিসেবে দেওয়া হলে লোকে অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পায়, তা মুখের ঘা নিরাময় করে, প্রস্রাব স্বাভাবিক করে, আন্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ সহজ-স্বাভাবিক রাখে, কাশির উপশম ঘটায়, পাগলা কুকুরের কামড় ও বিষাক্ত কামড় নিরাময় করে। গভীর ক্ষতেও তা ভাল কাজ দেয়। উপরন্তু, তা ফুস্‌ফুস্ ও আভ্যন্তরীণ অস্থিসন্ধির রোগেরও প্রতিকারক।'

এই প্রাচীন সারগ্রন্থগুলিতে মধুকে সব বয়েসের লোকের জন্য উপকারী ওষুধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'শিশুদের এবং বৃদ্ধ লোকদের এমনকি গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের বন্য মধু দেওয়াতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ, বন্যমধু গর্ভস্থিত সন্তানের জন্য মোটেও ক্ষতিকর নয়।' রাশিয়ায় লোকজ চিকিৎসায় কোন কোন চর্মরোগে মধুর ব্যবহার ছিল।[27]

ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসায় মধুর কার্যকারিতার যত উদাহরণই দেওয়া হোক না কেন, ঐ রোগের চিকিৎসায় মধুর কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিকারক গুণ নেই। এখানে শুধু উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে বলকারক হওয়ায় মধু যক্ষ্মার সংক্রমণের বিরুদ্ধে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাহায্য করে। ফুস্‌ফুসের পুঁজাশয়ের (abscess) চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ থেকে এবং কিয়েভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ফ. আ.

উদিন্‌ৎসেভ-এর ক্লিনিকে রোগীদের চিকিৎসার ফলাফল লক্ষ্য করে আমরা এই মতে উপনীত হয়েছি[25]। তিনজন রোগীকে দৈনিক ১০০ থেকে ১৪০ গ্রাম মধু দিয়ে বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। তারা আগের চেয়ে ভাল বোধ করতে লাগল, তাদের ক্ষুধা বেড়ে গেল, ওজনও বাড়তে থাকল। রক্তাণু বা হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে লোহিত কণিকার অবক্ষেপণের হার (E. S. R.) হ্রাস পেল। দেখা গেল আগের চেয়ে তাদের কাশি ও কফের পরিমাণ কমে এসেছে, রাতের চেয়ে দিনের বেলা তাদের প্রস্রাব বেড়ে গিয়েছে (মধু প্রয়োগের আগে অবস্থা এর বিপরীত ছিল), পাকান্ত্রিক (gastrointestinal) নালীতেও হিতকর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল।

মধু এবং হৃৎপিন্ড

হৃৎপিন্ডের পেশী নিরন্তর কর্মরত থাকে বলে নিঃশেষিত শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য গ্লুকোজ দরকার হয়। শারীরবৃত্তীয় লবণ-দ্রবণে খুব সামান্য পরিমাণ গ্লুকোজ (০·১ শতাংশ) মিশিয়ে যদি তাতে বিচ্ছিন্ন কোন হৃৎপিন্ড ডুবিয়ে রাখা হয় তবে তা দেহের বাইরে থাকলেও চারদিন ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে পারে।

হৃৎপিন্ডের উপর মধুর কার্যকর প্রভাবের কারণ — তাতে সহজে আত্মীকরণযোগ্য গ্লুকোজ থাকে। লক্ষ্য করা গেছে যে (theobald), বিভিন্ন ধরনের হৃৎরোগে আক্রান্ত দুর্বল হৃৎপেশীর উপর মধু মূল্যবান প্রভাব ফেলে।

জীবদেহে ফ্রুক্টোজ বা মধু অনুবিদ্ধ করে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াকলাপ উন্নত করা হয় বলে বহুমূত্র রোগীদের পক্ষেও মধু খাওয়া সম্ভব। হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াকলাপের উপর যে-সব রোগের নিরাময় নির্ভর করে সে-সব রোগের চিকিৎসায় ডিজিটালিস (ফক্সগ্লোভ উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত ঔষধ — অনুবাদক) দেওয়ার সময় মধুর কথা ভোলা উচিৎ নয়। কারণ, তা দেওয়া হলে হৃৎপিন্ড শুধু উদ্দীপ্তই হয় না, পুষ্টিও পায়। মধু শিরাগুলিকে প্রসারিত করে এবং করোনারি ধমনীর রক্ত সঞ্চালনকে উন্নত করে। দীর্ঘদিন ধরে মধু খেতে দিলে (দৈনিক ৫০ থেকে ১৪০ — গড়ে ৭০ গ্রাম মধু এক থেকে দুই মাস যাবৎ) হৃৎরোগী আপনা-আপনি

বেশ সুস্থ বোধ করে, তাদের রক্তের উপাদান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং হৃৎসংবহন নালিকার পেশীটানের উন্নতি হয়।

মধু এবং পরিপাক

একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে, মধুই পাকস্থলীর সবচেয়ে ভাল সুহৃদ। পরিপাক ক্রিয়ায় মধুর উপকারিতার উল্লেখ চিকিৎসাশাস্ত্রেও দেখা যায়। বিশেষতঃ তা খুব ভাল বিরেচক এবং তা নিয়মিত ব্যবহার করলে পাকান্ত্রিক নালী স্বাভাবিক ও কর্মতৎপর থাকে।

আহারের পর খাদ্য দুই থেকে তিন ঘণ্টা অথবা তারও বেশি সময় ধরে পাকস্থলীতে থাকে। এই সময় তার উপর চলে পাচক রসের ক্রিয়া। পর্যবেক্ষণে[29)] দেখা গেছে যে, শুধু বেরিয়াম সালফেটের চেয়ে খেলে মধু পাকস্থলীর অতি অম্লতা কমিয়ে দেয়। আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণে[29)] দেখা গেছে যে, শুধু বেরিয়াম সালফেটের চেয়ে মধুযুক্ত বেরিয়াম-খাদ্য পাকস্থলীতে এক থেকে দু'ঘণ্টা বেশি থাকে এবং এক্স-রে প্লেটে অঙ্গের পরিলেখও স্পষ্টতর হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র দিয়ে বেরিয়াম-খাদ্যের গমন পথের চিত্র খাঁটি বেরিয়াম-খাদ্য কিংবা চিনি সহ বেরিয়াম-খাদ্যের ক্ষেত্রে যেমন, মধুসহ বেরিয়াম-খাদ্যের ক্ষেত্রেও হুবহু একই রকম। পাকান্ত্রের কয়েক রকম রোগ যেমন: পাকস্থলীর ক্ষত বা প্রদাহের মত অতি অম্লতার লক্ষণ যুক্ত রোগের চিকিৎসায় মধু ওষুধ হিসেবে কিংবা পথ্যের অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ১৯২৪ সালে ডাঃ ভ. প. গ্রিগরিয়েভ-এর চিকিৎসাধধীন নিদানিক পর্যবেক্ষণের পর্যায়ে একজন রোগীর অতিঅম্লতার প্রতিকারে মধুই ছিল একমাত্র ওষুধ।[৪০)] ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ইর্কুত্স্ক মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ক্লিনিকে পাকস্থলীর আলসার রোগে আক্রান্ত ৬০০ রোগীকে মধু দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ম. ল. খোৎকিনা (১৯৫৩) সর্বাধিক লক্ষণ যুক্ত ৩০২টি রোগীর চিকিৎসার কর্মধারা বর্ণনা করেছেন: ৭৬ জনের (৩৪·৩ শতাংশ) অতিঅম্লতা ছিল; ৬৭ জন (৩০·২ শতাংশ) ছিল স্বাভাবিক; ৫৪ জনের (২৪·৭ শতাংশ) অম্লতা ছিল উনমাত্রার (subnormal) এবং ২৪ জনের (১০·৮ শতাংশ) অম্লতার

কোন ব্যাপার ছিল না। প্রচলিত পথ্য ও ওষুধ দেওয়ার পর ৬১ শতাংশ রোগী সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু ১৮ শতাংশের ব্যথা তখনও গেল না; কিন্তু যখন মধু দেওয়া হলো, দেখা গেল ৭৯·৭ থেকে ৮৪·২ শতাংশ রোগী ভাল হয়ে উঠেছে, যদিও চিকিৎসা শেষে ৫·৯ শতাংশের ব্যথা যায় নি। এক্স-রে থেকে পরিস্কার হল, প্রচলিত চিকিৎসায় ২৯ শতাংশ রোগী আল্‌সার থেকে আরোগ্য লাভ করে নিরাময় হয়েছিল, পক্ষান্তরে ৫৯·২ শতাংশ রোগী পীড়ামুক্ত হয়েছে মধু খেয়ে। যাদের মধু দেওয়া হয়েছিল তাদের গড়পড়তা হাসপাতাল-বাসের সময়কালও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাদের সামগ্রিক শারীরিক উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল: যেমন রোগীদের ওজন বেড়ে যায়, রক্তের উপাদানের উন্নতি হয়, আন্ত্রিক অম্লতা স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং স্নায়ুতন্ত্র সুস্থিত হয়। রোগীরা ধীর-স্থির, হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মস্কোর অস্ত্রাউমভ হাসপাতালের খাদ্য-পথ্যবিদ্যা বিভাগের মিউলার ও আর্খিপোভা ১৫৫ জন আলসার রোগীর উপর মধুর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখেন।[31] তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, অম্লতা ও আন্ত্রিক রসের নিঃসারণকে মধু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে, রোগীর বুকজ্বালা ও ঢেকুর তোলা দূর হয় এবং পেশীর খিল ধরা বন্ধ হয় ইত্যাদি।

আলসারের চিকিৎসায় মধুর প্রভাব দু'রকম: ক) স্থানিক প্রভাব — অন্ত্রের মিউকোসার বহির্ভাগ নিরাময়ে সাহায্য করা, আর খ) সামগ্রিক প্রভাব — অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্রের (আন্ত্রিক ও ডুয়োডেনাল আলসার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এগুলির গ্রাহক অঙ্গ যথাযথ ভাবে কার্যক্ষম থাকেনা — এ দিক থেকে স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ) বিকাশ সাধন।

আলসারের চিকিৎসায় আহারের ৯০ মিনিট থেকে দু'ঘণ্টা আগে অথবা তিন ঘণ্টা পরে মধু খাওয়া উচিত। সকালের নাশ্‌তার ও দুপুরের খাবারের দেড় কি দু'ঘণ্টা আগে এবং রাতের খাবারের তিন ঘন্টা পরে মধু খেলে আরও ভাল হয়। খাওয়ার আগে মধু ঈষদুষ্ণ সিদ্ধ জলে মিশিয়ে নেওয়া উচিত। এভাবে খেলে তা পাকস্থলীর ভেতরের শ্লেষ্মাকে তরলায়িত করে ও অম্লতা কমায় এবং তা অন্ত্রের উপদাহ না ঘটিয়ে দ্রুত হজম হয়। পক্ষান্তরে মধুর ঠাণ্ডা দ্রবণ অম্লতা বাড়িয়ে দেয়, পাকস্থলীর খাদ্যবস্তু পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটায় এবং অন্ত্রে

উপদাহ সৃষ্টি করে। আহারের ঠিক আগেভাগে মধু খেলে তাতে আন্ত্রিক রসের নিঃসারণ বৃদ্ধি পায়। জীবদেহের সমস্ত প্রধান প্রধান প্রক্রিয়ায় যেমন, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন ও হরমোন ইত্যাদির রূপান্তর ক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বলে যকৃতকে যথার্থই জীবদেহের রাসায়নিক পরীক্ষাগার বলা হয়ে থাকে। যকৃতেই এনজাইমগুলোর উৎপত্তি এবং এখানেই ক্যারোটিন রূপান্তরিত হয় ভিটামিন A-তে। এখানে ভিটামিন K-এর সহায়তায় প্রোথ্রোম্বিন (রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় একটি পদার্থ) উৎপত্তি লাভ করে এবং এনডোক্রিন গ্রন্থির দ্বারা সৃষ্ট হরমোনগুলো নতুন গুণের অধিকারী হয়।

যকৃতের রোগের চিকিৎসার বহুকাল ধরে লোকজ ওষুধে মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর রাসায়নিক উপাদান বিশেষ করে গ্লুকোজের অবস্থানই এই উপকারীতার কারণ। গ্লুকোজ শুধু যকৃতের কোষকলার খাদ্য যোগায় না, তার গ্লাইকোজেনের সঞ্চয়ও বাড়িয়ে তোলে এবং কোষকলার প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া উন্নত করে। ব্যাকটেরিয়া-বিষের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত করার কাজে যকৃৎ পরিস্রাবকের কাজ করে। সংক্রমণ প্রতিরোধে জীবদেহের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য গ্লাইকোজেন যকৃতের কাজকে আরও সক্রিয় করতে সহায়তা করে। যকৃতের রোগের নিদানিক চিকিৎসায় সাধারণতঃ গ্লুকোজের শিরাভ্যন্তরীণ ইনজেক্শন দেওয়া হয়ে থাকে।

ছানা, জাউ, বাকউইট বা বার্লিসিদ্ধ, আপেল ইত্যাদির সাথে মেশানো মধু কেবল রোগীর জন্যই ভাল খাবার নয়, স্ব্যাস্থ্যবান লোকের জন্যও তা ভাল। যারা মূত্রাশয়ের রোগে কষ্ট পান, ডাক্তাররা তাদের জন্য নীচের ব্যবস্থাপত্রটি দিয়ে থাকেন: মধু ও রোজহিপ-চা (০·৫ লিটার পানিতে ১৫ গ্রাম রোজহিপ) কিংবা মধু ও মূলার রস (দৈনিক ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম)। বৃক্কের পাথুরীতে যাঁরা ভুগ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে জলপাইতেল, মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে এক টেবিল-চামচ মিশ্রণ দৈনিক তিনবার করে খাওয়া, তবে অবশ্যই তা কোন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হতে হবে।

মধু এবং স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের জন্য মধু খুব উপকরাী। নিদানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, স্নায়ুতন্ত্রের কোন কোন রোগের চিকিৎসায় গ্লুকোজের অতিশক্তি দ্রবণ (hypertonic Solution) ফল দেয়। সাধারণতঃ দুটি কি তিনটি ইনজেকশনের পর মাথা ব্যথা কমে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ে ইত্যাদি।

অধ্যাপক ন. ক. বোগোলেপভ ও ভ. ই. কিসেলোভা (১৯৪৯) সেন্ট ভিটাস ড্যান্স নামে পরিচিত শারীরিক আক্ষেপ সমন্বিত বিশেষ ধরনের রোগে আক্রান্ত দু'জন রোগীর চিকিৎসায় মধু ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়। মধু প্রয়োগে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করার পর রোগীরা স্বাভাবিকভাবে ঘুমোতে শুরু করে, তাদের মাথার যন্ত্রণা কমে যায়, শরীরে আগের তুলনায় বেশি বল পায়, খিট্খিটে ভাব কমে যায় এবং তারা ফের হাসি-খুশি ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে।

যাদের স্নায়বিক অবস্থা দুর্বল কিংবা যারা স্নায়রিক অবসাদ রোগে ভুগছেন তাদের উচিত এক গ্রাম জলে একটা লেবুর অর্ধেক অংশের রস ও মধু মিশিয়ে খাওয়া কিংবা রাত্রে ঘুমানোর আগে এক 'টেবিল-চামচ' মধু খাওয়া। ১৯৩৮ সালে অধ্যাপক ই. জান্দের দেখান যে, রাতের বেলা মধু মেশানো এক গ্লাস পানির চেয়ে কম ক্ষতিকর নিদ্রাকারক আর নেই। যে সব পাউডার পাকস্থলীতে উপদাহ সৃষ্টি করে সেগুলোর চেয়ে মধু নিঃসন্দেহে অনেক ভাল।

পানিতে ভেজানো মধুযুক্ত তুষ বা ভুষিকে স্নায়ুতন্ত্রের জন্য চমৎকার বলকারক বলে গণ্য করা হয়; তুষ বা ভুষির পরিবর্তে ভিটামিন B_1 মধু সহযোগে খাওয়া যেতে পারে। বিকিরণ-চিকিৎসা করার সময় রোগীর দেহে যে বিকিরণ পীড়া দেখা দেয় তার চিকিৎসায় প্রায়ই আগে থেকে আমিষ নিষ্কাশিত মধুর মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চিকিৎসা কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায় শুরু হবার আগে ১০ মিলিগ্রাম ২০ থেকে ৪০ শতাংশ দ্রবণ শিরাভ্যন্তরে সিরিঞ্জ দিয়ে ঢোকানো হয়। এই রোগের চিকিৎসায় আমিষ-মুক্ত মধুর কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর মেলকেইন নামে পেটেণ্ট ওষুধ হিসেবে তার ব্যবহার শুরু হয়। আমিষ-মুক্ত মধুতে এক থেকে দুই শতাংশ প্রোকেইন দ্রবণে মেলকেইন তৈরী হয়। সচরাচর প্রোকেইন ও মধু দিয়ে যে-সব রোগের চিকিৎসা করা হত এখন মেলকেইন দিয়ে সে-সবের চিকিৎসা হয়ে থাকে।

অনেক চক্ষুরোগে মধু কার্যকর ওষুধ হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরীয় একটি প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিতে মধু দিয়ে তৈরী মলম ওতার ব্যবহারবিধির বর্ণনা দেখা যায়। ইব্‌নে সিনা চোখের উপকারের জন্য পেঁয়াজের রস, লবঙ্গ, কিংবা উইট ঘাসের সাথে মধু মিশিয়ে চোখে ব্যবহারের পরামর্শ দেন। গেল শতকে কোন কোন লেখক মনে করতেন, মধু পুড়ে যাওয়া ক্ষত, বিশেষ করে চোখের জন্যে ক্ষতিকর এমন পোড়াক্ষত ভালভাবে সারায় এবং চোখের ব্যথার চমৎকার উপশম করে। এখনও মধু সেই গুরুত্ব হারায়নি। নতুন নতুন ওষুধে (সালফোনামাইড, এন্টিবায়োটিক্‌স্‌ ইত্যাদি) একালের চিকিৎসাবিদ্যা অনেক সমৃদ্ধ হলেও চোখের কোন কোন রোগে এখনও মধু বেশ ফলপ্রদ।

আ. খ. মিখাইলভ অক্ষিপট, নেত্রবর্ত্ম ও অক্ষিপটলের স্ফীতিতে, অক্ষিপটলিক ঝিল্লীর ক্ষতে এবং অন্যান্য রোগে ইউক্যালিপটাস মধু ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[32] মধু ও ইউক্যালিপটাস পাতার তরল নির্যাস থেকে মৌমাছিরা এই মধু তৈরী করে (ইউক্যালিপটাসের পাতায় নয়, ফুলে এই আরোগ্যকর গুণ রয়েছে বলে)।

ওডেসা আঞ্চলিক হাসপাতালে অক্ষিপটলের ঝিল্লীর নানারকম ক্ষতের চিকিৎসায় এক ধরনের মধু-মলম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে তিন শতাংশ সালফাপাইরিডাইন মলমে (ভেসেলিন প্রতিস্থাপিত করে) কেবল মধু মেশানো হয়। ধীরগতিতে নিরাময় হয় এমন ক্ষতে এই মলম খুবই কার্যকর এবং তা দ্রুত ক্ষত শুকিয়ে দেয়। অথচ সোডিয়াম সালফানিল এসিটামাইড-এর ৩০ শতাংশ দ্রবণ ফোঁটায় ফোঁটায় দেওয়া হলেও কিংবা ভেসেলিনযুক্ত সালফাপাইরিডাইন মলম দেওয়ার পরও দেখা গেছে যে তাতে কর্ণিয়ার স্ফীতিযুক্ত রোগের উপশম হয় না। পক্ষান্তরে মধু ও সালফাপাইরিডাইন মলম প্রয়োগ করলে বেশ কাজ দেয়। তবে শুধুমাত্র মধুর গুণে অক্ষিপটিল প্রদাহ কিংবা অক্ষিপটলের ঝিল্লীর ক্ষতে আক্রান্ত রোগী খুবই কম আরোগ্য লাভ করে।

ওম্‌স্ক মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের (মাক্সিমেনকো[33]) চক্ষুক্লিনিকে

দাইকুঁড়ি ও ক্ষতময় অক্ষিপটল প্রদাহের চিকিৎসায়, অক্ষিপটলের কিংবা কাঁচীয় (vitreous) দেহের অস্বচ্ছতা বিগলন (resorption) রোগে, অপরিপক্ক বা প্রাথমিক ছানিতে এবং চোখের জন্য ক্ষতিকর দহনের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে মধু ব্যবহৃত হয়। এ সব চিকিৎসায় মধুকোষ থেকে নেওয়া নির্বীজিত মধুই শুধু ব্যবহার করা চলে। তবে তা চিকিৎসক কিংবা চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মধু এবং শিশুরা

শিশুর শারীরিক বিকাশে যুক্তিসঙ্গত খাদ্যের দিকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শিশুদের খাবারের সাথে চিনির চেয়ে মধু দেওয়া অনেক ভাল। তাদেরকে দিনে দুই থেকে তিন বার এক চা-চামচ মধু দেওয়া সঙ্গত তবে তা দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ গ্রামের বেশি যেন না হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কারো কারো জন্যে মধু এলার্জি সৃষ্টি করে। মধু খেলে তাদের পিত্তানি (rash), হাঁপানী, বমিবমি ভাব ও উদারাময় হতে পারে। কোন কারণেই তাদেরকে সামান্য মাত্রায়ও মধু দেওয়া উচিৎ নয়।

ভেষজ রচনায় উল্লেখ আছে, শিশুরা চিনির চেয়ে মধু বেশি পছন্দ করে। শিশুদের 'ইন্দ্রা' বিশ্রামাগারে আমরা একবার এই পরীক্ষাটি করেছিলাম। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় শিশুদের তিন ড্যালা করে চিনি (৩০ থেকে ৩৫ গ্রাম) দেওয়া হত। দেখা গেল, তাদের কেউ তা দিচ্ছে কুকুরকে, কেউ ছুঁড়ে ফেলছে, কেউ ফেলে রাখছে। ফলে কয়েকদিন পরে আমরা পরীক্ষাটির একটু পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। যখন তাদের ৬০ জনকে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এক চামচ করে মধু দিতে লাগলাম তখন ফল দাঁড়াল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কে কার আগে মধুর ভাগ নেবে সেজন্যে তারা উঠে পড়ে লেগে যেত আর তার পরের দিনও এ রকম দেওয়া হবে কি না তা জানার জন্য আকুলি বিকুলি করত।

চিনি যে দাঁতের ক্ষতি করে তাতে দন্তচিকিৎসকদের কোন সন্দেহ

নেই। মুখের মধ্যেকার চিনির অবশেষ যে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে এসিড, বিশেষ করে ল্যাকটিক এসিড তৈরী করে এবং ধীরে হলেও তা যে দাঁত ও মাড়ির ক্যালসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেয় তা এখন প্রমাণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, মধু কার্যকর এণ্টিবায়োটিক গুণের অধিকারী এবং বস্তুতঃ তা মুখগহ্বরকে জীবাণুমুক্ত করে।

ভেষজ গুল্মের সঙ্গে মধু

ভেষজ গুল্মের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

অ্যাগ্রিমনি (Agrimony) (Agrimonia eupatoria L.): দেশী ভেষজ শাস্ত্রে পরম ধন্বন্তুরী হিসেবে বাত, অর্শ, আন্ত্রিক পীড়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর্টেল বাউয়ের ছোট কাপের এক কাপ অ্যাগরিমনি চা ও মধু দৈনিক তিনবার খাওয়ার এবং অ্যাগ্রিমনি নির্যাসকে লোশন হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। দীর্ঘস্থায়ী বাত, থুথুতে রক্ত আসা, মারাত্মক অজীর্ণতা ও গলবিলের স্ফীতিতে অ্যাগ্রিমনি চা ও মধু ব্যবহার করা চলে। উদারময় ও আন্ত্রিক দুর্বলতার প্রতিরোধে সাহায্য করে বলে যকৃৎ ও প্লীহার রোগ উপশমে এটা খুবই কার্যকর। বৃক্ক-বালুকা গলিয়ে দিয়ে তার হাত থেকে জীবদেহকে রক্ষায় অ্যাগরিমনি সাহায্য করে। ক্যান্সার জাতীয় টিউমারের ক্ষেত্রেও এটি উপকারী।

অ্যালো (Aloes): অ্যালো পাতার (Aloe spp.) রেজিন সদৃশ তরুরস প্রায়ই চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই রস গাঢ় বাদামী রঙের এবং তার একটা বিদ্ঘুটে গন্ধ ও তিক্ত স্বাদ আছে। দেশী চিকিৎসায় ফুস্ফুসের যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে টাটকা অ্যালো পাতার রস চর্বি ও মধুর সাথে নিম্নলিখিত অনুপাতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়:

মধু	১০০
মাখন	১০০
শূকর অথবা হাঁসের চর্বি	১০০
টাটকা অ্যালো পাতার রস	১৫
কোকো পাউডার	১০০

এক টেবিল-চামচ মিশ্রণ এক গ্লাস ঈষদুষ্ণ দুধে মিশিয়ে দিনে দু'বার (সকাল ও সন্ধ্যা) সেব্য।

ব্ল্যাক থর্ন (Prunus Spinosa L.): দেশী চিকিৎসায় মৃদু রেচক হিসেবে ব্ল্যাক থর্ন ফুল ব্যবহার করা হয়। এর্টেল ও বাউয়ের-এর মতে, ব্ল্যাক থর্ন ফল্ দিয়ে তৈরী চা শ্বাসনালীর স্ফীতিতে ও তাকে কফমুক্ত করায় খুবই কার্যকর। এক টেবিল-চামচ শুকনো ব্ল্যাক থর্ন্ ফুলকে ২৫০ গ্রাম জলে এক মিনিট সিদ্ধ করে এই চা তৈরী করা হয়। লিকার ঢেলে নেওয়ার পর তাতে মধু মিশিয়ে ফের সিদ্ধ করতে হয়। একটু একটু করে চুমুক দিয়ে দৈনিক এক কাপ সেব্য।

বার্নেট স্যাক্সিফ্রেজ (Pimpinela saxifraga L.): স্যাক্সিফ্রেজের ক্বাথ কিংবা মধুর সাথে স্যাক্সিফেজের তরল নির্যাস (২০০ গ্রাম জলে ১০ গ্রাম মূল) কফ্ নিঃসারক হিসেবে খুবই ভাল এবং তা অসুখের পর বলকারকের কাজও করে। খাওয়ার নিয়ম: এক টেবিল-চামচ করে দৈনিক তিন থেকে পাঁচ বার। মূত্রাশয়ের পাথরের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে রোজহিপ ও মধু সহযোগে দুই গ্লাস স্যাক্সিফ্রেজ চা খেতে পারেন। এ. র‍্যাফের মতে তা মূত্র-পাথরের সত্যিকার নিরামক। সুইজারল্যাণ্ডের ভেষজ লতা গুল্মের বিশেষজ্ঞ আই. কুনজল শিশুদের ডিপথেরিয়া রোগে মধু মেশানো এক টেবিল-চামচ স্যাক্সিফ্রেজ মূলে চূর্ণ করে প্রতি চার ঘন্টা অন্তর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন (তাঁর পঞ্জিকার ২৪ তম সংস্করণে, ১৯৪৫)।

কোল্টস্ফুট: Tussilago farfara L.-এর ফুল ও পাতার পানীয় ও চা কফ নিঃসারক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রোমকরা কোল্টস্ফুটকে কাশি নিরাময়ে উপকারী বলে মনে করত। এর ল্যাটিন নাম Tussilago (tussis অর্থ কফ থেকে) তারই ইংগিতবহ। কোল্টস্ফুটের পাতায় তিক্ত গ্লুকোসাইড (টুসিলাগিন), গ্যালিক এসিড, ইনডুলিন, সুগন্ধি তেল, মিউকাস বা শ্লেষ্মা, ট্যানিন ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ কমিটি সাধারণভাবে ব্যবহার্য নিম্নলিখিত কোল্টস্ফুট ওষুধ অনুমোদন করেছেন:

১ নম্বর চেস্ট চা — এতে থাকে দু'ভাগ কোল্টস্‌ফুট পাতা, দু'ভাগ মার্‌শ্‌ম্যালো মূল ও এক ভাগ মার্‌জরাম।

২ নম্বর ঘর্মনিঃসারক চা — এতে থাকে দু'ভাগ কোল্টস্‌ফুট পাতা, দু'ভাগ রাস্‌প্‌বেরি ও এক ভাগ মার্‌জরাম।

লোকজ চিকিৎসায় মধু সহযোগে কোল্টস্‌ফুটের পাতার তাজা কিংবা চোলাই করা পানীয় (২০০ গ্রাম জলে ১৫ গ্রাম পাতা) কফ নিঃসারক হিসেবে ব্যবহৃত হত। অনেক লেখকের রচনায় ইংগিত পাওয়া যায়, কয়েক ধরনের রোগে কোল্টস্‌ফুট ও মধুর মিশ্রণ খুবই কার্যকর। র‍্যাফ ফুসফুসের যক্ষ্মায় মধু সহযোগে এককাপ কোল্টস্‌ফুট চা দৈনিক একবার খাওয়ার পরামর্শ দেন। এর্টেল ও বো-য়ের মনে করেন, কোল্টস্‌ফুট ও লাংগওয়র্ট (pulmonaria officinalis)-এর পাতা ও ফুল থেকে তৈরী দু'কাপ চা মধু সহযোগে পান করলে স্নায়ুতন্ত্র ও পাকান্ত্রিক নালীর উপকার হয় এবং অবসাদ দূর হয়। একই উদ্দেশ্যে কোল্টস্‌ফুটের পাতার তাজা রস দুধ ও মধু সহযোগে পান করা চলে। ক. আর্পিনিস কাশি নিরাময়ে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন: ৫০০ গ্রাম জলে ১৫ গ্রাম কোল্টস্‌ফুটের শিকড় ও ফুল ৬ মিনিট ধরে সিদ্ধ করুন; ৯০ গ্রাম সেইজ ও ১২০ গ্রাম সেন্টাউরী চার লিটার ফুটন্ত জলে ভিজিয়ে তরল রস ছেঁকে নিন। তারপর তা কোল্টস্‌ফুটের চোলাই রসের সাথে মেশান। মিশ্রণ দৈনিক চার থেকে ছয়বার মধু সহযোগে খেতে হবে।

কাউবেরি (cowberry) বা **লাল বিলবেরি** (vaccinium vitis-idea L.): এই চির সবুজ গুল্ম রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় এবং লোকজ চিকিৎসায় চোলাই করা পানীয় হিসেবে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় বৃক্কের পাথর, বাত, গিঁটে বাতের নিরাময়ে। পাতা থেকে তৈরী তরল নির্যাস (এক গ্লাস জলে ২০ গ্রাম পাতা) কিংবা চা সাধারণতঃ মধু সহযোগে (এক গ্লাস তরল নির্যাস বা চা'তে ১ টেবিল-চামচ মধু) খেতে হয়।

সবুজ রঞ্জক আগাছা (Dyer's greenweed বা Genista tinctoria): লোকজ চিকিৎসায় এই উদ্ভিদ গলগণ্ড, অস্থিভঙ্গ, যৌন ব্যাধি, চর্মরোগ ও চর্মের ক্ষতের প্রতিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে অসেছে। এর বীজে আলকালয়েড সাইটিসিন ($C_{11}H_{14}N_2O$) থাকে যা শ্বসনক্রিয়া সহজতর

করে। স. ই. জেমলিনস্কির বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সবুজ রঞ্জক আগাছার রং দিয়ে তৈরী চা, গলগণ্ডের বৈকল্যে আক্রান্ত রোগীকে দিয়ে নিদানিকভাবে যে পরীক্ষা চালানো হয় তা সফল হয়েছিল। এর্টেল ও বো'য়ের উল্লেখ করেছেন, শক্তিক্ষয় ও নিম্নরক্তচাপ সহ দুর্বলতার ক্ষেত্রে সবুজ রঞ্জক আগাছা দিয়ে তৈরী চা মধু সহযোগে পান করলে উপকার হয়।

এলডার (Elder) ফুল ও বেরি (Sambucus nigra L.) ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মূল খুবই কার্যকর প্রস্রাববর্ধক। এলডারে ট্যানিন, আমিষ, ম্যালিক এসিড, ভ্যালেরিক এসিড, মোম, রেজিন ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। এক গ্লাস জলে এক থেকে দেড় টেবিল-চামচ ফুলের তরল নির্যাস দিয়ে তৈরী চা এক চামচ মধু সহযোগে খেলে তা জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, অস্থিসন্ধির বাতে আক্রান্ত রোগীর দেহে ঘর্মনিঃসারকের কাজ করে। দৈনিক এক টেবিল-চামচ পাঁচ বার করে কিংবা সকাল সন্ধ্যায় আধা গ্লাস করে একমাস খেতে হবে।

এলিক্যামপেইন *(Elecampane)* বা **ইনুলা** (inula) (Inula helenium L.) কফ নিঃসারক ও ফলপ্রদ প্রস্রাববর্ধক হিসেবে লোকজ ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। র‍্যাফ শ্বাসনালীর শ্লেষ্মায় ও খারাপ ধরনের কাশিতে এলিক্যামপেইন শিকড় থেকে তৈরী পূর্ণকাপ চা মধু মিশিয়ে (এক গ্লাস চায়ে এক টেবিল-চামচ মধু) সকাল সন্ধ্যায় পানের পরামর্শ দেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এক টেবিল-চামচ চূর্ণ মূলের দশমিনিট সিদ্ধকরা তরল নির্যাস এক গ্লাস জলে মিশিয়ে খেলে খুবই ফল দেয়। আহারের এক ঘণ্টা আগে এক টেবিল-চামচ করে দৈনিক তিনবার তা খেতে হবে। তরল নির্যাস খাওয়ার পর ডান কাত হয়ে ১৫ মিনিট শুয়ে থাকা বাঞ্ছনীয়। আবখাজীয় ভেষজশাস্ত্রে 'ইউকোমিয়া'র (Eucommia) শিকড় হৃৎপিণ্ডের কাঠিন্যের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'ইউকোমিয়া'র চোলাইকরা তরল ক্বাথ বা নির্যাস বিড়াল ও খরগোশের শিরায় প্রবিষ্ট করে দেখা গেছে যে, তাতে রক্তচাপ কমে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেষজবিদ্যা একাডেমীর পরীক্ষামূলক ও নিদানিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের রোগীদের উপর পরীক্ষা করেও এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে আমরা 'ইউকোমি'র টিংচার মধু সহযোগে পরীক্ষা করি। উচ্চ রক্তচাপের

রোগীদের ২০ ফোঁটা টিংচার এক চা-চামচ মধু সহযোগে দৈনিক তিনবার করে দেওয়া হয়। এতে ভাল নিদানিক ফল পাওয়া যায় এবং রোগীদের রক্তচাপ তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যায়।

লেবুর রস (Citrus medica L.): হাইপারটনিক বা অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় লেবুর রস ও মধু ব্যবহার করা যেতে পারে। এ. র‍্যাফ একটি লেবুর অর্ধাংশের রস ও এক টেবিল-চামচ মধু এক গ্লাস সিদ্ধ জলে মিশিয়ে পানীয় হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। তা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য খুবই ভাল এবং তা প্রশান্তি নিশ্চিত করে। জি. হার্টউইগ গলার শ্লেষ্মার জন্য মধু ও লেবুর রস ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ক. আপিনিস লিখেছেন, লেবুর রসের ক্বাথ ও মধু সর্দি নিরাময়ে সহায়ক। এর্টেল ও বাউউয়ের যকৃৎ ও পিত্তাশয়ের রোগে মধু সহযোগে লেবুর রস ও জলপাই তেলকে কার্যকর প্রতিকারক বলে সুপারিশ করেন।

লিন্ডেন (Linden) বা **লাইম** (Tilia): পরিচিত দেশী নিরামকের মধ্যে সাধারণ লাইমের ফুল প্রাচীন ও জনপ্রিয় ওষুধ। ভেষজ উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ খাটো-পাতা লাইম (T. cordata বা T. cordifolia Mill., T. parvifolia Ehrh.) এবং বড়ো-পতা লাইম (T. cordifolia Bess কিংবা T. platyphyllos Scop.) ব্যবহৃত হয় (সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় ভেষজ কোষগ্রন্থে দুটোই অন্তর্ভুক্ত)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটি নীচের ওষুধগুলি উৎপাদনে সম্মতি দিয়েছেন: সম-পরিমাণ লিন্ডেন ফুল ও র‍্যাসপ্‌বেরি থেকে তৈরী ঘর্মনিঃসারক চা (১ নম্বর); এক ভাগ লাইম ফুল ও দুই ভাগ ওক বাকল দিয়ে তৈরী মুখ পরিস্কারক (১ নম্বর); দুই ভাগ লাইম ফুল ও ৩ ভাগ ক্যামমাইল দিয়ে তৈরী মুখ পরিস্কারক (নম্বর-২)। অনেক রচয়িতাই বিভিন্ন রকমের রোগে মধু যুক্ত লাইম চা ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। এর্টেল ও বাউয়ের বলেন, মধুযুক্ত এক কাপ চা বৃদ্ধ লোকদের জন্য খুবই ভাল কারণ, তা 'ফুসফুসকে কফ্‌মুক্ত করে'; ফুসফুস ও বৃক্কের রোগেও দারুণ উপকারী। D. swiekule মনে করেন, মধু ও মদের সাথে মিশিয়ে লাইম ফুল থেকে তৈরী চা পান করলে তাতে রক্তশূন্যতা দূর হয় এবং যে সমস্ত মহিলার ত্বকের রং ফ্যাকাশে হলুদাভ-সবুজ আভা যুক্ত তাদের গায়ের রঙ

ভালো হয়। জি. হাটউঈগ হামের চিকিৎসায় লাইম চা দুধ ও মধু মিশিয়ে পান করে পিপাসা মেটাতে বলেছেন। তাঁর আরও বিশ্বাস, যে সমস্ত রোগী কাশি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পেশীর খিঁচুনীতে ভোগেন তাদের জন্য সকাল সন্ধ্যায় লাইম ফুলের চোলাই রস (এক কাপ) মধুসহ পান করা ভাল।

লাংগওয়র্ট (Pulmonaria officinalis): দেশী চিকিৎসায় কোষ্ঠবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ. র‍্যাফ ফুসফুসের রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র দেন: ২০-৩০ গ্রাম লাংগওয়র্ট পাতা, মধু ও এক মুঠো গমের ভুষি ১·২৫ লিটার বাদামী বীয়ারে ফুটিয়ে নিতে হবে যেন অর্ধেক জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়। অবশিষ্ট সুরা ভালভাবে ছেঁকে নিয়ে বোতলবন্ধ করতে হবে এবং আহারের আগে খেতে হবে। এর্টল ও বাউয়ের ব্রঙ্কাইটিস বা ক্লোমনালী প্রদাহ, গলা ও মূত্রাশয়ের বৈকল্য, অর্শ ও অন্যান্য রোগ নিরাময়ে ফলপ্রদ ওষুধ হিসেবে শুকনো লাংগওয়র্ট পাতা, প্লানটেইন, সেইজ, সেন্তোর ও ওয়ার্মউড-এর মিশ্রণ থেকে তৈরী চা মধু সহযোগে ব্যবহার করতে বলেছেন।

মারশ্ম্যালো (Althaea officinalis L.): সুপ্রাচীনকাল থেকেই আরোগ্যকর গুণাগুণের জন্য বিখ্যাত (গ্রীক শব্দ althein-এর অর্থ আরোগ্য করা)। ইব্নে সিনা এর খুব উঁচু মূল্য দিতেন। বস্তুতঃ মার্শ্ম্যালোতে যে বিভিন্ন রকম নিরাময়কর গুণ রয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে। শ্বাসযন্ত্র ও মূত্রনালীর প্রদাহে ও উদারাময়ের চিকিৎসায় সাফল্যজনকভাবে তা ব্যবহৃতহয়ে আসছে। শ্বাসনালী ও মূত্রনালীর প্রদাহে মার্শ্ম্যালো ফুল থেকে তৈরী এক টেবিল-চামচ চা (এক গ্লাস জলে এক টেবিল-চামচ ফুল দিয়ে) দিনে কয়েকবার সেবন করা যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ বিজ্ঞান কমিটি বুকের অসুখে ১ নম্বর চা অনুমোদন করেছেন। এতে রয়েছে দুই ভাগ মার্শ্ম্যালোর শিকড়, দুই ভাগ কোল্টস্ফুট, এক ভাগ মার্জর‍্যাম। এক গ্লাস চায়ে এক টেবিল-চামচ মধু মেশালে তার নিরাময় ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়।

মাস্ট্যার্ড (Mustard): ক. আপিনিস বলেন, মাসট্যার্ডের বীজ, মধু ও লিলি ফুল দিয়ে তৈরী চোলাই রস ত্বকের ওপরের ফুটকী দাগ দূর করতে ও ত্বক মোলায়েম করার জন্যে খুবই ভাল।

নেট্‌ল্‌স্‌ (Urtica diotica L.): শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকজ চিকিৎসায় জরায়ু, অন্ত্র ও ফুসফুসের রক্তক্ষরণে এবং অর্শের প্রতিকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলোতে যে ভিটামিন C ও A (ক্যারোটিন) এবং ভিটামিন K থাকে তা এগুলোর রক্তরোধক গুণকেই প্রমাণ করে। অধ্যাপক আ. স. তোমিলিন লিখেছেন: নেট্‌ল্‌ যে রক্তাণু বা হিমোগ্লোবিন পুনরুদ্ধার ও লোহিত কণিকার সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে আর তা যে অন্ততঃ লৌহের সমপরিমাণ এবং শ্বেতসার-শর্করাকে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে। লোকজ ওষুধে নেট্‌ল্‌ সুদীর্ঘকাল ধরে জণ্ডিস, ও রাতের বেলায় যক্ষ্মা রোগীদের ঘর্মাক্ত হওয়া ইত্যাদি রোগের ওষুধ ও রক্তরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফরাসী ডাক্তারেরা বলেন, মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্ত্রিক প্রদাহে ও উদারাময়ের প্রতিকারে এবং যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় নেট্‌ল্‌ খুব কার্যকর। দেশী চিকিৎসায় সর্বরোগহর ওষুধ হিসেবে টাটকা রস, চোলাই রস, নির্যাস ও পাতা থেকে তৈরী চা রূপে নেট্‌ল্‌ পাতার চা-কে রক্তরোধক হিসেবে সুপারিশ করেন এবং যারা দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ, বিশেষ করে তাদেরকে তিনি মধু খাওয়ার উপদেশ দেন।

ওক্‌ (Quercus robur L.): ওকের ফল, বাকল ও পাতা ওষুধের কাজে লাগে। ওকের বাকলে (Cortex Quercus) ট্যানিক উপাদান থাকে প্রায় ২০ শতাংশ এবং তা মূলতঃ কুলকুচি করার জন্য কষালো হিসাবে এবং দাঁতের মাড়ির শিথিলতা, মুখের ক্ষত বা এই ধরনের রোগে ব্যবহৃত হয়। ওক পাতা, ফল ও বাকল থেকে তৈরী চা মধু দিয়ে খেলে তা ফুসফুস, পাকস্থলী ও যকৃতের পীড়ার অব্যর্থ ওষুধ হিসেবে কাজ করে বলে ক. আর্পিনিস দাবী করেন। এর্টেল ও বাউয়ের গলগণ্ড রোগে ওকের বাকল ও ফলের তৈরী চা মধু সহ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

পেঁয়াজ (Allium cepa L.): মধুর সাথে মেশানো পেঁয়াজ হিপোক্রেটস-এর সময়ে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। ইবনে সীনা পেয়াঁজের উঁচু মাত্রার ব্যাকটেরিয়া বিনাশী গুণাগুণের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে রোগনিরাময়ক হিসেবে নানাভাবে পেঁয়াজের ব্যবহার হয়ে থাকে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভেষজ বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটিতে Allilchep (স্পিরিটে ডোবানো মিহি

ও কুচি পেঁয়াজ)-এর উৎপাদন অনুমোদিত হয়। তা আন্ত্রিক রোগে (কোষ্ঠ কাঠিন্যের প্রবণতা সহ মলাশয় প্রদাহ ও অন্ত্রের পেশীক্রিয়া স্বল্পতা) এবং হাইপারটোনিয়া সহ ও হাইপারটোনিয়া বিহীন ধমনীকাঠিন্য রোগে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ক. আপিনিস খারাপ ধরনের কাশিতে পেঁয়াজ ও মধুর নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন: ৫০০ গ্রাম মিহি ও কুচি পেঁয়াজ, ৫০ গ্রাম মধু, ৪০ গ্রাম চিনি, এক লিটার পানিতে মৃদু তাপে তিন ঘন্টা ফুটিয়ে নিয়ে তারপর তা ঠান্ডা করে বোতলে ভরে আঁটোভাবে ছিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। রোগী দৈনিক চার থেকে ছয় টেবিল-চামচ খাবে। র‍্যাফ গলার ঘা-এর চিকিৎসায় মধুর সাথে পেঁয়াজের চোলাই বা সাধারণ রস মিশিয়ে দিনে ৫ বা ৬ বার কুলকুচা করার উপদেশ দেন। বুকের অসুবিধা, কাশি, প্রৌঢ়ত্বে রুক্ষ্মভাবের প্রতিকারের জন্য তিনি পেঁয়াজ ও মধুকে নিম্নোক্তভাবে তৈরী করে নিতে বলেন: একটা পেঁয়াজ পিষে নিয়ে এক গ্লাস ভিনিগারে ভিজিয়ে পশমী কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেবার পর তা সমপরিমাণ মধুর সাথে মেশাতে হবে। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এক চা-চামচ করে খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

এর্টেল ও বাউয়ের বলেন যে, মধুর সাথে পেঁয়াজ ও আপেল গলাফোলা উপশমে সাহায্য করে। পেঁয়াজ ও আপেল পিষে মধুর সাথে মিশিয়ে জাউ বানিয়ে প্রতিদিন খেলে তা দুর্বল মূত্রাশয়ের উপকারে আসে। র‍্যাফ-এর মতে, এক টেবিল-চামচ পেঁয়াজ পানিতে ভিজিয়ে মধুর সাথে খেলে তা ফলপ্রদ প্রস্রাববর্ধকের কাজ করে। তিনি হুপিং কাশের নিরাময়ের জন্য এক চা-চামচ পেঁয়াজের রস মধুতে ফুটিয়ে নিয়ে দিনে কয়েকবার খাওয়ার পরামর্শ দেন। ভ. আ. লুকাশেভ গুরুমস্তিষ্কের ধমনীকাঠিন্য রোগের চিকিৎসায় সাফল্যজনকভাবে পেঁয়াজ ব্যবহার করেছেন।

প্লানটেইন (Plantago): প্রাচীন কালেও এর আরোগ্যকর গুণ জানা ছিল। গ্রীক ও রোমকরা আমাশয়ের চিকিৎসায় এর বীজ ব্যবহার করত। আরব্য ও ইরাণী ভেষজশাস্ত্রে হাজার বছর আগে এটি সর্বরোগহর ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত। ইব্‌নেসিনা শিশুদের চর্মরোগে এর বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ভারতীয় চিকিৎসকরা ব্যাসিলাস জনিত ও এমিবীয় আমাশয়ের চিকিৎসায় প্লানটেইন বীজের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ

করেছেন। ভারতীয় ভেষজ সারগ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। প্লানটেইন বীজে তৈল, মিউকাস, আমিষ, ট্যানিন ও অন্যান্য পদার্থ থাকে।

প্লানটেইন পাতায় প্রচুর পরিমাণ সাইট্রিক এসিড এবং সেইসাথে ক্যালসিয়াম, এনজাইম (ইনভারটেজ, এমালসিন), উপভিটামিন A (ক্যারোটিন), ভিটামিন C, ফাইটনসাইড, তেতো উপাদান, ট্যানিন ও অন্যান্য পদার্থ থাকে। কেটে-যাওয়া, ক্ষত, আঁচড়, চর্মপ্রদাহ, ক্লোমনালী প্রদাহ, মূত্রাশয় প্রদাহ, রক্তক্ষরণ ইত্যাদির চিকিৎসায় দেশী ওষুধ হিসেবে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। প্লানটেইন পাতার তরল নির্যাস (২০০ গ্রাম জলে ৬ গ্রাম পাতা) খুবই চমৎকার কফ্ নিঃসারক; এক টেবিল-চামচ করে দৈনিক ৩ বার খেতে হয়।

অধ্যাপক আ. তোমিলিন লিখেছেন, মারাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী আন্ত্রিক প্রদাহ, আমাশয় এবং যক্ষ্মা ও দীর্ঘস্থায়ী মূত্রাশয় প্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের উদারাময়ের চিকিৎসায় ফরাসী চিকিৎসকরা অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্লানটেইনের পাতা ব্যবহার করতেন। P. Swiekule তাজা প্লানটেইন পাতার (P. major ও P. lanceolata) রসকে ক্লোমনালী প্রদাহ, রক্তক্ষরণ সহ ফুসফুস প্রদাহ ও ফুসফুসের যক্ষ্মায় (এমনকি রক্তময় কাশি সহ) কার্যকর ওষুধ হিসেবে সুপারিশ করেন। প্লানটেইন পাতার মধু মেশানো চোলাই রস বা নির্যাসও এক্ষেত্রে দৈনিক তিন টেবিল-চামচ ব্যবহার করা চলে (৬ গ্রাম পাতা, ২০০ গ্রাম জল ও ৩০ গ্রাম মধু)।

মূলা (Raphanus sativa): অনেক লেখক মধু সহ মূলার শক্তিশালী রোগ নিরাময়ক গুণের কথা বলেছেন। ক. আপিনিস বাত রোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন ৩০০ গ্রাম মূলার রস, ২০০ গ্রাম মধু, ১০০ গ্রাম ভদ্‌কা ও এক টেবিল-চামচ লবণ মিশিয়ে তৈরী মলম নিজে মালিশ করতে। এর্টেল ও বাউয়ের বলেন, মূলার রস ও মধু (১০০ গ্রাম থেকে ৪০০ গ্রাম দৈনিক) বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রথলিতে পাথর গঠন প্রতিহত করে। মূলার রস ও মধু, এ ছাড়াও ধমনীকাঠিন্য, যকৃতে বালুকণা ও শোথ প্রতিরোধে সহায়ক। মূলার রস পাওয়ার একটা ভাল পদ্ধতি হচ্ছে মূলার মাঝ বরাবর ভেতরের মাংস বের করে নেওয়ার পর যে গর্ত তৈরী হয় তা মধু দিয়ে পূর্ণ করে তিন থেকে চার ঘন্টা রেখে দেওয়া। ঘন্টায় বয়স্কদের দুই বা তিন টেবিল-চামচ ও শিশুদের এক

চা-চামচ খেতে হবে। মূলার রস থুথু ও কফ নিঃসারণ করে বলে তা কাশি ও রুক্ষতার ক্ষেত্রে উপকারী। র‍্যাফ কাশির জন্যে এক টেবিল-চামচ মূলার রস ও মধু দৈনিক তিন বার ব্যবহারের সুপারিশ করেন।

রাস্‌প্‌বেরি (Rubus idaeus L.): এটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই রোগবারক গুণাগুণের জন্য পরিচিত। সেকালে শুকনো রাস্‌প্‌বেরি জ্বরের চিকিৎসায় এবং ফুলের তরল নির্যাস সাপের কামড়ের প্রতিষেধক বা বিষঘ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত। জেম্‌লিনস্কির মতে, রাস্‌প্‌বেরিতে রয়েছে ইথারীয় তেল, ম্যালিক এসিড, চিনি, রঞ্জক, মিউকাস, ভিটামিন C ও অন্যান্য পদার্থ।

শুকনো রাস্‌প্‌বেরি সর্দিতে সবচেয়ে কার্যকর ঘর্মনিঃসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন রচনাকর রাস্‌প্‌বেরি রসের বা চায়ের সাথে মধু মিশিয়ে খেয়ে উপকার পেয়েছেন। র‍্যাফ বলেন যে, ঘামের সময় রাস্‌পবেরির রস ও মধু একাধারে ক্লান্তিহর ও বলকারক পানীয়। মুখমণ্ডলের বিসর্প রোগে দৈনিক দুই বা তিন কাপ উষ্ণ রাস্‌প্‌বেরি চা মধু সহযোগে পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

লাল ক্লোভার (Trifolium pratense L.): দেশী চিকিৎসায় লাল ক্লোভার ফুল থেকে তৈরী তরল নির্যাস বা চা কফ্‌ নিঃসারক, প্রস্রাববর্ধক ওবং পোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় প্রলেপ বা পুলটিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। D. Swiekule বলেন, ক্লোভার ফুলের উষ্ণ চা ক্লোমনালী প্রদাহ ও হাঁফানী রোগে কফ নিঃসারক ও প্রস্রাববর্ধক হিসেবে খুবই কার্যকর।

মিস্ট ভাইয়লেট (Viola odorata L.): কাশির চিকিৎসায় ও কফ নিঃসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর্টেল ও বাউয়ের ভাইয়লেট পাতা দিয়ে তৈরী চা মধু সহযোগে ক্ষয়রোগ ও ক্লোমনালীর হাঁফানীতে ব্যবহার করতে বলেন। অন্যান্য লেখক মনে করেন, ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসায়ও তা কার্যকর। তিন চা-চামচ প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য, বিশেষ করে খারাপ ধরনের কাশির ক্ষেত্রে।

থাইম (Thymus vulgaris L.): জেম্‌লিনস্কি বলেন, হুফিং কাশ ও সর্দির চিকিৎসায় থাইম-এর শুকনো পাতা ও প্রস্ফুটিত পল্লব থেকে গ্যালেনীয় মিশ্রণ তৈরী করা যেতে পারে। গ্যালেন ও আভিসীনা মনে করেন, পাকান্ত্রিক নালীর রোগের চিকিৎসায় এর গুরুত্বপূর্ণ আরোগ্যকর

গুণাগুণ রয়েছে। এর্টেল ও বাউয়ের বলেন, মধু সহ থাইম চা ফিতা-কৃমির মহৌষধ। তা চার থেকে ছয় সপ্তাহ দৈনিক পান করার পরামর্শ দেওয়া হয় (২০ গ্রাম থাইম, ২৫০ গ্রাম জল, ৩০ গ্রাম মধু)।

ভ্যালেরিয়ান (Valeriana officinalis L.)। স্নায়ুর দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতিতে যাঁরা কষ্ট পান, ভ্যালেরিয়ানের ফোঁটা প্রশান্তিদায়ক হিসেবে তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ওষুধ। হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসায় সেবাস্টিয়ান নিস্‌স, ভ্যালেরিয়ানের শিকড় ও রু (সবুজ উদ্ভিদ) দিয়ে তৈরী চা মধু সহযোগে খাওয়ার সুপারিশ করেন: প্রতি দু'ঘণ্টায় এক টেবিল-চামচ।

এলডারবেরি (Elderberry) ও **মধু জ্যাম**: যারা বসে থাকায় বা বসে বসে কাজ করায় অভ্যস্ত তাদের জন্য সেবাস্টিয়ান নিপ্‌স (হাইড্রোথেরাপীর অন্যতম সমর্থক) মধু ও এল্‌ডারবেরি দিয়ে তৈরী জ্যাম প্রতিকারক হিসেবে উপকারী বলে মনে করেন। এক গ্লাস পানিতে এক চামচ জ্যাম পানীয় হিসেবে খুব ভাল এবং পাকস্থলী ও বৃক্কের জন্যেও তা উপকারী।

সজিনা (Horseradish) ও **মধু**: র‍্যাফ-এর মতে এটি ক্লোমনালীর হাঁফানীর উপশম করে। সমপরিমাণ পেষাই করা সজিনা ও মধু একসাথে মিশিয়ে দিনের বেলা এক চা-চামচ ও রাতের বেলা আর এক চা-চামচ সেব্য।

গুল্ম চা: শ্বাসনালীর ক্ষতি করে এমন কাশির প্রতিকারে র‍্যাফ ল্যাংগওয়র্ট, কোল্‌ট্‌স্‌ফুট, অ্যালথিয়া ও মধু দিয়ে তৈরী চা উপযোগী বলে মনে করেন। এক টেবিল-চামচ গুল্ম মিশ্রণ এক লিটার ফুটন্ত জলে তিন কি চার মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এক বা দুই গ্লাস চা (কিংবা তরলনির্যাস) এক চামচ মধুসহ দৈনিক পান করা উচিত।

লেবুর রস ও মধু: অতিরিক্ত রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা ও স্নায়বিক দুর্বলতার চিকিৎসায় ভাল প্রতিকারক। ভাল জাতের এক চামচ মধু এক গ্রাম খনিজ পানিতে ঢেলে তাতে একটি লেবুর অর্ধাংশের রস মেশান। এই পানীয় মনোরম ও পুষ্টিকর। বাউয়ের যকৃৎ ও পিত্তাশয়ের রোগে লেবুর রস, মধু ও জলপাইতেল সুপারিশ করেন।

তিসির চা: এর্টেল ও বাউয়ের মৌরী, ফেনেল ও মধু সহ তিসির চা-কে কার্যকর বিরেচক হিসেবে সুপারিশ করেন। তিসির গুঁড়ো,

ফেনেল, ভেষজ শুল্‌ফা (dill) ও ভাল জাতের মধুর এক চা-চামচ মিশ্রণ ২৫০ গ্রাম পানিতে তিন-চার মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে।

মধু সহযোগে চা: ভ. ভ. পোখলেবকিন প্রাচীন লোকজ ওষুধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের সাথে মধু ও চায়ের একটি চমৎকার প্রস্তুত প্রণালী দিয়েছেন।[34] বেশ কড়া উষ্ণ চা, লেবু, কালো গোলমরিচ ও মধু শ্বাসনালীর শ্লেষ্মা নিরাময়ে কার্যকর ঘর্ম নিঃসারক ও প্রস্রাববর্ধক। পোখলেবকিন লিখেছেন, চা-য়ে কম করে হলেও ১২০ থেকে ১৩০ রকম রাসায়নিক পদার্থ আছে। তার মধ্যে সুগন্ধি তেল (০·০২ শতাংশ), ট্যানিন (১৫-৩০ শতাংশ), অ্যালবুমিন (১৬-২৫ শতাংশ), আলকালয়েড (১-৪ শতাংশ), ভিটামিন B_1, B_2, PP, C, R, K ও উপভিটামিন A উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ড. ফ. ম্যাকলীডন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, চা-য়ে ফ্লোরিন রয়েছে এবং ফলে তা দাঁতের ক্ষয় রোধে কার্যকর হতে পারে। কিন্তু মিশিয়ে খেলে চায়ের এই গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং উল্টো তা দাঁতের ক্ষয় বাড়ায়। ম্যাকলীডন সেই কারণে চায়ের মিষ্টতার জন্য চিনির বদলে মধু ব্যবহরের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। পোখলেবকিনও মধু দিয়ে চা পান করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইঅ্যারো (Yarrow) **চা**: র‍্যাফ ৫০০ গ্রাম ফুটন্ত পানিতে ২০ গ্রাম ইঅ্যারো ডুবিয়ে তৈরী চা-কে (এবং তরল নির্যাসে তৈরী হলে তাতে ৫০ গ্রাম মধু মিশিয়ে) ইনফ্লুয়েঞ্জায় খুব উপকারী বলে মনে করেন। এক কফি-কাপ পরিমাণ চা দৈনিক তিনবার পান করা বাঞ্ছনীয়।

প্রবীণা গিন্নিদের জন্য: যে-সব শিশুর দাঁত উঠছে তাদের রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এক চামচ মধু দেওয়া ভাল। তা রক্তে ফসফরাসের পরিমাণ কমিয়ে দেয় ও যন্ত্রণার উপশম করে। সমপরিমাণের মধু শিশুদের বিছানা ভিজানো বন্ধ করে। কারণ তা দেহে পানিবিয়োজন ঘটায় ও রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। রাতের আহারের পরিবর্তে ২ টেবিল-চামচ মধু খেলে তা নিদ্রাহীনতা দূর করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। ঘুমানোর এক কি দেড় ঘন্টা আগে আচালা আটা বা ময়দার রুটি কিংবা রাইরুটি মধু মাখিয়ে (৫০ গ্রাম) খাওয়া সবচেয়ে ভাল। এতে স্নায়ুর উপর প্রশান্তিকর প্রভাব পড়ে এবং অন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হওয়ায় সাহায্য করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাসগৃহে মধু

রান্নার কাজে মধু

ওষুধ হিসেবে মধু খেতে হলে স্বাভাবিক মধু সরাসরি কিংবা জলের সাথে মিশিয়ে (পানীয় জল কিংবা খনিজ জল) কিংবা রুটি, দুধ, অন্ন বা ফলের সাথে খাওয়া সবচেয়ে ভাল। মধু খাবারকে অধিকতর সুস্বাদু করে তোলে এবং তার ক্যালরীগত মূল্য ও পরিপাকক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। মুস (mousse) ও জেলী বানাতে, ফলকে ভাপে সিদ্ধ করতে (stew), ভিটামিন পানীয় সহ অন্যান্য পানীয় তৈরীতে চিনির বিকল্প হিসেবে মধু ব্যবহৃত হতে পারে। মধু কেক্ ছাড়াও মধু দিয়ে তৈরী অন্যান্য কেক্, কুকি ও বিস্কুটের স্বাদ মনোরম হয় এবং চিনি দিয়ে তৈরীর তুলনায় বেশি পুষ্টিকর হয়ে থাকে। ফল ও বেরি (ক্র্যানবেরি, ড্যাম্‌জন্, র‍্যাওয়্যান বেরি ও অন্যান্য) থেকে তৈরী মধু ও জ্যাম বেশ সুস্বাদু। মধু দিয়ে যে-সব খাবার তৈরী করা যায় সেগুলির কয়েকটির রান্নাপ্রণালী এই অধ্যায়ে দেওয়া হল।*

মধুকেক ও মিষ্টান্ন

আপেল কেক

১০০ গ্রাম পরিস্কার মধু
৫০০ গ্রাম আপেল (শীতকালীন হলে ভাল)
১ কাপ সাধারণ ময়দা*
১ টেবিল-চামচ টিনে মাখানোর জন্য মাখন

* রান্না প্রণালীতে 'এক কাপ' বলতে ২০০ গ্রাম তরল বোঝাবে।

১/২ কাপ চিনি
১০০ গ্রাম মাখন
১/২ চা-চামচ খাবার সোডা (সোডিয়াম বাই কার্বনেট)**
২ টি ডিম

মোলায়েম করে নেওয়া মাখনের সাথে মধু, চিনি ও ডিম মিশিয়ে ভালভাবে ফেটান। ময়দা ও সোডা চাল্‌নিতে ভালভাবে চেলে নিয়ে তারপর সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে ময়দার তাল বানান। আপেলের খোসা না ছাড়িয়ে শাঁস বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে ময়দার তালের সাথে মেশান। মাখন-মাখানো বিস্কুটের টিনে কিংবা প্যাডি প্যানে ময়দার তাল ভরে পরিমিত তাপে (৩৫০° ফা.) তন্দুরে সেঁকে নিন।

আর্মেনীয় আরিস্তা

১ কিলোগ্রাম ময়দা	২০০ গ্রাম চিনি
৬০০ গ্রাম মধু	২০ টি ডিমের সাদা অংশ
৭০০ গ্রাম ঘি	১০ টি ডিমের কুসুম

বেশ কিছুটা সান্দ্র না হওয়া পর্যন্ত ডিমের সাদা অংশ ফেটান। ডিমের কুসুমের সাথে চিনি মিশিয়ে ননীর মত করুন। তার পর দুটো এক সাথে মিশিয়ে চালনী-ঝাড়া ময়দার সাথে মাখান। ২০-২৫ মিনিট ভালভাবে মাখানোর পর ময়দার তালকে ছোট ছোট দলা পাকিয়ে ময়দার গুঁড়ো ছেটানো পিঁড়িতে বেলে পাতলা পাতলা রুটি তৈরী করুন। তা ফালি ফালি নুড্‌ল আকারে কেটে নিয়ে ময়দার গুঁড়ো মাখিয়ে ঘিতে ভেজে নিন। ভাজা নুড্‌ল ছাক্‌নিতে রাখতে হবে যেন ঘি নিঙড়ে যায়। ঘি ঝরে গেলে নুড্‌লগুলো ফুটন্ত মধুতে ডুবিয়ে আবার ছাক্‌নিতে রাখুন এবং মধু ঝরতে দিন। এবার একটা প্লেটে তা লম্বালম্বি ও

---

* আপনা-আপনি ফুলে ওঠে-এ রকম ময়দা হলে খাবার সোডা ব্যবহারের দরকার নেই।

** রান্না প্রণালীতে খাবার সোডা ব্যবহার করলে তা এক টেবিল-চামচ ভিনিগার বা স্পিরিটে প্রশমিত করে নিতে হবে।

আড়াআড়ি সাজিয়ে রাখতে হবে যেন দেখতে জাফ্‌রির মত হয়। এবার তা চৌকো করে কেটে নিন।

আর্মেনীয় গোজিনাখ

খোলা-ছাড়ানো আখরোট	৫০০ গ্রাম
চিনি	১০০ গ্রাম
মধু	৫০০ গ্রাম

মধু ও চিনি একসাথে সিদ্ধ করুন। আখরোটের মাংসল অংশ কুচিয়ে কেটে ও হালকা করে ভেজে নেওয়ার পর তা সিরাপের মধ্যে ছিটিয়ে দিন। গরম থাকতেই তা কোন ডিশে ঢেলে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিয়ে উপরের দিকটা সমান করে নিয়ে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত রেখে দিন। তারপর ডিশটা একটু গরম করে গজিনাখ সরিয়ে নিন এবং হীরক আকারে ছোট ছোট টুকরো কেটে তা প্লেটে সাজান। আখরোটের বদলে বাদাম দেওয়াও চলে।

আর্মেনীয় মিষ্টিমাখা পাখলাভা

ময়দা	৭৫০ গ্রাম
খামি (yeast)	৫০ গ্রাম
জল	১ কাপ

পুর:

৩০০ গ্রাম কুচিয়ে কাটা বাদাম	৩০০ গ্রাম চিনি
১৭৫ গ্রাম ঘি	৩ গ্রাম এলাচ

প্রলেপ:

দুটো ডিমের কুসুম

চাটনি:

মধু	১৫০ গ্রাম
ঘি	১১০ গ্রাম

গামলায় ঈষদুষ্ণ জলে খামি গলিয়ে তাতে অল্প করে ময়দা মেশাতে থাকুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট ভালো করে মাখিয়ে ময়দার তাল তোয়ালে দিয়ে ঢেকে ৩০-৪০ মিনিট কোন গরম জায়গায় রেখে দিন। এবার পুর তৈরীতে লেগে যান। আখরোট প্রথমে কুচি কুচি করে কাটুন তার পর তাতে চিনি ও এলাচের গুঁড়ো মেশান। ময়দার তাল উপরের দিকে ফুলে উঠলে তা গামলা থেকে বের করে পিঁড়ি বা তক্তার উপর রেখে ১৪ টি সমান ভাগে ভাগ করে নিন। তক্তার উপর ময়দার গুঁড়ো ছিটিয়ে সবগুলো দলা আলাদা আলাদা করে বেলে নিন এবং তাতে গলানো মাখনের প্রলেপ লাগান। এর পর চর্বিমাখানো রুটি সেঁকার পাতে তিনখানা রুটি একটার উপর একটা রাখুন। সবচেয়ে উপরের রুটিটার উপরে ইতিমধ্যে তৈরী পুর-এর এক পঞ্চমাংশ ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর আরও দু'খানা রুটি চাপিয়ে তা ঢেকে দিন। আবার তার উপর পুর ঢালুন এবং এভাবে প্রক্রিয়াটা আরও তিনবার চালান। সবশেষে আবার তিনখানি রুটি চাপিয়ে তার উপর ডিমের কুসুমের প্রলেপ দিন এবং তাতে হীরক আকৃতির খোপ কেটে নিন। তা ৩০-৩৫ মিনিট তপ্ত চুল্লীতে সেঁকতে হবে। প্রথম দশ মিনিট পর হীরকাকৃতি খোপে গলানো মাখন (১১০ গ্রাম) ঢেলে দিন। পাখলাভা তৈরী হয়ে গেলে তা তন্দুর থেকে নামান এবং ফালি ফালি করে কেটে ফাঁকের মধ্যে উষ্ণ মধু ঢেলে দিন।

আর্মেনীয় মজাদার পাখলাভা

সাধারণ ময়দা	৭৫০ গ্রাম
ডিম	২টি
ঘি	১৭৫ গ্রাম
খামি	৩৫ গ্রাম
জল	২০০ গ্রাম

পুর:

আখরোট	৫০০ গ্রাম
এলাচ	৫ গ্রাম
চিনি	৫০০ গ্রাম
ঘি	১১০ গ্রাম
মধু	১৭৫ গ্রাম

বড়ো গামলায় খামি জলে গলিয়ে নিন। ডিমগুলো ফেটিয়ে তাতে ভালোভাবে মেশান। অল্প অল্প করে তাতে ময়দা ঢেলে ভালভাবে নাড়তে থাকুন। তারপর গলানো ঘি ঢেলে ১০-১৫ মিনিট ধরে ময়দার তাল ভালভাবে মাখান। এর পর ময়দার তাল উষ্ণ জায়গায় ৯০ মিনিট রেখে দিতে হবে। ময়দার তাল ফুলে উঠতে উঠতে সেই ফাঁকে আখরোট কুচি কুচি করে কেটে চিনি ও এলাচগুঁড়োর সাথে মিশিয়ে পুর তৈরী করে ফেলুন। ময়দার তাল তৈরী হয়ে গেলে তা পিঠা বানানোর তক্তার উপরে বের করে নিন এবং দু'ভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগকে পাতলা করে বেলে নিতে হবে। তার পর চর্বি মাখানো রুটি সেঁকার পাতের উপর একটা রুটি রেখে তার উপর তৈরী পুর ছড়িয়ে দিন। অন্য রুটিটি পুরের উপর দিয়ে দুটো রুটির কিনারা গুলো মুচড়ে বন্ধ করে দিন। তারপর তার উপর ডিমের কুসুম ঢেলে তা হীরক আকৃতিতে কাটুন। পিঠা তপ্ত চুল্লীতে ৩৫-৪০ মিনিট সেঁকে নিতে হবে। প্রথম দশ মিনিট গেলে চেরা জায়গার ফাঁকে ফাঁকে গলানো ঘি ঢেলে আবার চুল্লীতে রেখে দিতে হবে। পাখলাভা তৈরী হয়ে গেলে ফাঁকগুলোতে মধু ঢেলে দিয়ে চৌকো করে কেটে নিলেই হল।

আর্মেনীয় ইউগ্যাটারুট

	২০০ গ্রাম ঘি
১ কিলোগ্রাম ময়দা	(১৫০ গ্রাম প্রলেপের জন্য)
১ ক্যাপ গরম দুধ	১-২ গ্রাম খাবার সোডা
৬ টি ডিম	৩০০ গ্রাম মধু

ময়দা চাল্‌নি দিয়ে চেলে গামলায় নিন। ময়দার মাঝখানে একটা গর্ত বানিয়ে তার মধ্যে ফেটানো ডিম, গরম দুধ (যার ভেতরে আগেই সোডা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে) ও ৫০ গ্রাম ঘি ঢেলে দিন। ময়দার তাল ভাল করে মেখে নিয়ে তারপর তা যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলে নিন। এবার গলানো মাখনের প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর সামান্য ময়দা হালকা করে ছিটিয়ে দিন। তার পর রুটিকে চিঠির খামের মত করে ভাঁজ করে আবার বেলে পাতলা রুটি বানান। এরপর আবার তা ঘি মাখিয়ে ময়দা ছিটিয়ে চিঠির খামের মত ভাঁজ করুন। কাজটা এভাবে আরও বার ছয়েক করার পর শেষ বারের ভাঁজ করা রুটি তৈলাক্ত প্যানে করে তপ্ত তন্দুরে ১০-১৫ মিনিট সেঁকে নিন। চৌকো করে কেটে কেটে প্লেটে সাজিয়ে তার উপর গরম মধু ঢেলে দিলেই হল।

বুলগেরীয় মধুকেক

২৫০ গ্রাম মধু	১/৩ কাপ আখরোট গুঁড়ো
১ কাপ সূর্যমুখী তেল	৪-৫ টি মিহি করে পেষা
১/৩ কাপ কিশমিশ	চিনি-ম্যাখান ফল
১ চামচ কোকো	১ চা-চামচ দারচিনি
৪-৫টি লবঙ্গ (গুঁড়ো)	১ চা-চামচ খাবার সোডা
	১/৩ কাপ জল

মধুকে জলে মিশিয়ে তরল করে সূর্যমুখী তেলের মধ্যে ঢালুন। তারপর আখরোটের গুঁড়ো, কিসমিস, চিনি-মাখানো ফল, কোকো, দারচিনি, লবঙ্গ, ও পর্যাপ্ত ময়দা এমনভাবে মেশান যে মাখানো ময়দা নরম হয়। তা দু'সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে নিতে হবে। তৈলাক্ত রুটিসেঁকা পাতে রেখে উপযুক্ত চুল্লীতে তা এক ঘন্টা সেঁকে নিন। তারপর তার উপর ডিমের হিমায়িত জমাট সাদা অংশ বা জমাট বাঁধা চিনির মোটা-পরত আবরণ দিয়ে ঠান্ডা বরফশীতল অবস্থায় পরিবেশন করুন। কোকো, চকলেট বা খাদ্য-রং দিয়েও জমাট আবরণ দেওয়া যেতে পারে।

বৃত্তলেরস্ত মধুকেক

৫ টি ডিমের সাদা অংশ	
মধু (বাকউইট হলে ভাল হয়)	২০০ গ্রাম
দারচিনি	২ গ্রাম
সাধারণ ময়দা	১২০ গ্রাম
হালকা-ভাজা বাদাম	২০০ গ্রাম
৩টি ডিমের কুসুম	
পেষাই করা জায়ফল	২ গ্রাম

এক চিমটি মৌরী

ডিমের কুসুম ও মধুর সাথে ডিমের সাদা অংশ ফেটান। তার সাথে ময়দা ও গরমমশলা মিশিয়ে ভালভাবে মাখান ও তারপর বড় বড় কুচি করে কাটা বাদাম মেশান। এরার সবটা বের করে ১ সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে নিন। তারপর পছন্দসই আকারে কেটে কিংবা গোটাটাই সেঁকে নিন।

পনির কেক

৫০০ গ্রাম ছানা	৫০ গ্রাম পরিস্কার মধু
১/২ কাপ চিনি	২ টি ডিম
৩-৪ চামচ গমের মোটা-দানা সুজি	১ টেবিল-চামচ মাখন (কেকের টিন তৈলাক্ত করার জন্য)

চাল্‌নীতে ছানা ছেঁকে নিয়ে তাতে মধু, চিনি, ডিম ও সুজি ভালভাবে মেশান। ভালোভাবে মাখন মাখিয়ে তৈলাক্ত করা কেকটিনে তা ঢেলে তারপর ৩৫-৪০ মিনিট সেঁকে নিন।

পছন্দসই মধুকেক

৩০০ গ্রাম পরিস্কার মধু	৩/৪ কাপ কড়া চা
১ টি ডিম	১/২ কাপ চিনি
৬০ গ্রাম মাখন	৫৫০ গ্রাম সাধারণ ময়দা
১/২ চা-চামচ খাবার সোডা	১০-১৫ টি লবঙ্গ (চূর্ণ)

২০ গ্রাম মাখন (কেকের টিন তৈলাক্ত করার জন্য)

মধুর সাথে নরম করা মাখন, চিনি, ডিম, চা, লবঙ্গগুঁড়ো ভালভাবে মেশান। তারপর তা সোডা ও ময়দায় অল্প করে ঢেলে ভালভাবে মাখিয়ে তাল বানান। মাখানো ময়দা এবার ভালকরে মাখন-মাখানো টিনে (গুগেলহাফ ছাঁচ বা গোল কেক-টিনে) রেখে মোটামুটি গরম চুল্লীতে (২০০° সে. বা ৪০০° ফা.) তাপে সেঁকে নিতে হবে।

হালভোইতের (নরম মধু-হালুয়া)

৬ কাপ সাধারণ ময়দা	২ কাপ ঘি বা ভেড়ার চর্বিজাত তেল
২ কাপ মধু	৩০ গ্রাম খোলা ছাড়ানো আখরোট
২ কাপ পানি	১০ গ্রাম চিনি (গুঁড়ো করা)

তামার পাত্রে ঘি কিংবা ভেড়ার চর্বিতে ময়দা ভালো করে ভেজে নিন যেন সমস্ত ময়দা হালকা বাদামী রং পায়। তারপর তাতে মধু ও জল মিশিয়ে কয়েক মিনিট ফোটান (পাঁচ মিনিটের বেশি নয়)। তৈরী হয়ে গেলে হালুয়া একটা ডিশ বা বড় থালায় বেড়ে নিয়ে তার উপর গুঁড়ো আখরোট ছড়িয়ে দিন এবং পছন্দমত বিভিন্ন আকৃতি দিন। ২ কিলোগ্রাম নরম আঠালো হালুয়া তৈরী হবে।

মধুবাবা (মধু ও বাদামযুক্ত ভাপা ছানারকেক)

২০০ গ্রাম ছানা	২০ গ্রাম সাধারণ ময়দা
১০০ গ্রাম মধু	৩০ গ্রাম খোলা-ছাড়ানো আখরোট (গুঁড়ো করা)
১ টি ডিম	
২০ গ্রাম মাখন	১০ গ্রাম চিনি

মধু গরম করে তাতে কিছুটা শুকানো আখরোটগুঁড়ো, ডিমের কুসুম, ময়দা ও মাখন মিশিয়ে ভালভাবে ফেটান। চালনীতে ছানা ছেঁকে নিয়ে তা অন্যান্য উপকরণের সাথে মেশান এবং ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে তাতে ঢালুন। তারপর মাখন লাগানো ধাতু-মোচা কিংবা নলাকার টিনের চোঙে চিনি ছিটিয়ে তাতে মিশ্রিত উপাদান ভর্তি করে ভাপ দিতে থাকুন। তৈরী হয়ে গেলে কেকের উপর গরম মধু ঢেলে পরিবেশন করুন। দুটো মধুবাবা তৈরী হবে।

মধু বিস্কুট

১০০ গ্রাম মধু	৫ টেবিল-চামচ চিনি
২-৩ টি ডিম	১ টেবিল-চামচ মাখন
১ চা-চামচ খাবার সোডা	১ চা-চামচ লবঙ্গ গুঁড়ো
১ চা-চামচ দারচিনি	একটি লেবুর ফালি করা শুকনো খোসা

সাধারণ ময়দা (ঘন তাল তৈরী করার জন্য)

চিনি ও মধু মিশিয়ে সিরাপ তৈরী করুন। গরম সিরাপে ময়দা মিশিয়ে দ্রুত ঘুঁটে তা ঘন করে নিন। ঘরের তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করার পর তাতে নরম করা মাখন, সোডা (এক টেবিল-চামচ ময়দার সাথে আগে থেকে মেশানো) ও লেবুর খোসার শুকনো ফালি মেশান। ১৫-২০ মিনিট তা ভালো করে মাখিয়ে তার পর এক সেণ্টিমিটার পুরু করে বেলে নিন। পছন্দসই নক্শা বা ছাঁচ অনুযায়ী কেটে নেওয়ার পর তা তৈলাক্ত রুটি

সেঁকার পাতে বসিয়ে তাতে ডিমের সাদা অংশের প্রলেপ লাগান এবং তার উপর স্বাদের জন্য পোস্তাদানা ছিটিয়ে দিন। মৃদুতাপে চুল্লীতে সেঁকে নিন।

মধুকেক (মিদোভিক)

১ কিলোগ্রাম মধু	১ কাপ চিনি
২-৩ টেবিল-চামচ মাখন	৪ কাপ সাধারণ ময়দা
৪-৫ টি ডিম	১/২ চা-চামচ খাবার সোডা
১/২ চামচ দারচিনি	

স্বাদ হওয়ার জন্য লবঙ্গ

মধু, মাখন ও চিনি মিশিয়ে ফুটন্ত অবস্থায় আনুন। তার পর আগুনের ওপর থেকে সরিয়ে তাতে ময়দা ঢেলে ভালভাবে মাখান। ময়দার তাল ঠান্ডা হলে তাতে ডিম, সোডা, লবঙ্গ ও দারচিনি দিয়ে তা আবার ভালভাবে মেশান। ঠান্ডা জায়গায় ময়দার তাল দু'দিন রেখে দিন। তারপর দুই কি তিন সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে নিয়ে তৈলাক্ত রুটি সেকার পাতে করে মোটামুটি তপ্ত চুল্লীতে সেঁকে নিন।

খোসাযুক্ত মধুকেক

২০০ গ্রাম মধু	১০০ গ্রাম মাখন
১ কাপ চিনি	১ গ্রাম আদা
৩ কাপ ময়দা	১/৪ চা-চামচ দারচিনি
২-৩ টি ডিম	১/৪ চা-চামচ লবঙ্গ গুঁড়ো
৩ চা-চামচ লেবুর খোসার শুকনো ফালি	স্বাদের জন্য লবণ

মধুকে গরম করে গলানো মাখনের সাথে মেশান এবং তাতে চিনি, আদা

ও লবণ ছেড়ে ভালোভাবে মেশান। তার পর তাতে ডিম, লবঙ্গ, দারচিনি ও লেবুর খোসা ছেড়ে অল্প অল্প করে ময়দা মেশান। ময়দার তাল ভালকরে মেখে নিয়ে এক সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে নিন। সাধারণ কিংবা পিঠা কাটার ছুরি দিয়ে পছন্দসই করে কেটে তৈলাক্ত সেঁকার পাতে মোটামুটি তপ্ত চুল্লিতে সেঁকে নিন।

মধু মাজুরকা

৫০ গ্রাম পরিস্কার মধু   ৩/৪ কাপ চিনি

১½ কাপ কুচিয়ে কাটা আখরোট   ১ কাপ কিশমিশ

১ টি ডিম   ১/২ কাপ ময়দা

১/৪ চা-চামচ খাবার সোডা   ১ টেবিল-চামচ মাখন

ডিমের কুসুমের সাথে চিনি মিশিয়ে ননীর মত বানান এবং তাতে মধু, বাদাম,, কিশমিশ, চালনীতে ঝারা ময়দা ও সোডা ভালভাবে মেশান (দানাদার মধু হলে তা জলে মিশিয়ে গরম করে নিতে হবে)। মেশানো হলে তারপর ডিমের ফেটানো সাদা অংশ তাতে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন। এবার বড় একটা রুটি সেঁকার পাতে কিংবা মাখন লাগান টিনে করে তপ্ত চুল্লীতে (১৮০°—১৯০° সে. বা ৩৬০° ফা.) সেঁকে নিন। পছন্দ মত কেটে গরম গরম পরিবেশন করুন। ইচ্ছা করলে তার ওপর ঘন মিস্টি আবরণ লাগাতে পারেন।

মধুওয়ালা বাদাম কেক

২০০ গ্রাম মধু   ১ কাপ ঘন মিস্টি (icing Sugar)

৩ কাপ সাধারণ ময়দা   ১ কাপ কুচানো আখরোট

১ কাপ কড়া চা   ১ চা-চামচ খাবার সোডা

৩ টেবিল-চামচ উদ্ভিজ্জ তেল   ৫-৬ টি লবঙ্গ (গুঁড়ো)

১ চা-চামচ দারচিনি   লেবু বা কমলার শুকনো খোসা

মধুর সাথে চা মিশিয়ে তা পাতলা করে নিন। তারপর একে একে তাতে

ঘন মিস্টি, উদ্ভিজ্জ তেল, সোডা, দারচিনি, লেবু বা কমলার শুকনো খোসার কুচি বা গুঁড়ো, কুচানোআখরোট ও ময়দা মেশান। ভালভাবে নেড়ে নিয়ে তা তৈলাক্ত ও ময়দা-ছিটানো কেকটিনে ঢালুন। মৃদু তপ্ত চুল্লীতে এর পর সেঁকে নিলেই হল। তৈরী হয়ে গেলে টিন থেকে বের করে তার ওপর ঘন মিস্টি আবরণ লাগান ও শীতল করে পরিবেশন করুন।

মধুওয়ালা ওট্‌কেক

১ কাপ ময়দা   ১ কাপ পেষাই-করা ওট্‌

১/২ কাপ চিনি   ১/২ কাপ মধু

১ কাপ অম্লননী (সুমেতানা)   ১ টি ডিম

১০০ গ্রাম মাখন   ১/২ চা-চামচ খাবার সোডা

ময়দা ও সোডা মিশিয়ে চালনিতে চেলে নিন। মাখনের সাথে চিনি মিশিয়ে সাদা ননীর মত না হওয়া পর্যন্ত ফেটান। তারপর তা উত্তপ্ত করার সময় তাতে মধু, অম্লননী, ডিম, পেষাই-করা ওট, ময়দা ও সোডা মেশান। তারপর তা খুব পাতলা করে (৩-৫ মিলিমিটার) বেলে বিভিন্ন আকৃতিতে কেটে নিয়ে তপ্ত চুল্লীতে (২০০°-২২০° সে; ৪০০°-৪২৫° ফা.) ১০-১৫ মিনিট সেঁকে নিন। তৈরী ওটকেকের পরিমাণ হবে ৭৫০-৮০০ গ্রাম।

মধুপুলি *(Puff)*

১০০ গ্রাম মধু   ১০০-১৫০ গ্রাম ঘন মিষ্টি

২ টি ডিম   ১ চা-চামচ খাবার সোডা

২০০ গ্রাম উদ্ভিজ্জ   কয়েকটি লবঙ্গের গুঁড়ো

ঘন মিষ্টির সাথে মধু মিশিয়ে গরম করুন। তারপর তাতে উদ্ভিজ্জ তেল, ডিম, সোডা, ও লবঙ্গ মিশিয়ে ভালভাবে ঘুঁটে নিন। নাড়তে

নাড়তে যতক্ষণ না বেশ ঘন হচ্ছে ততক্ষণ অল্প অল্প করে ময়দা মেশাতে থাকুন। মাখানো ময়দা দিয়ে এবার হেজেল বাদামের চেয়ে কিছুটা বড় আকারের গোল গোল বল তৈরী করে তা মৃদু তপ্ত চুল্লীতে সেঁকে নিন।

বাদামওয়ালা মধুপুলি

৫ টেবিল-চামচ মধু   ১ কাপ ঘন মিষ্টি

১ কাপ কুচানো আখরোট   ৫-৬ টি লবঙ্গ (গুঁড়ো করা)

১ চা-চামচ খাবার সোডা   ১-৪ টি কালো গোল মরিচ (গুঁড়ো করা)

দারচিনি ১/২ চা-চামচ

ঘন মিস্টির সাথে মধু মিশিয়ে তাতে কুচানো আখরোট, সোডা, মশলা ছেড়ে এবং তারপর অল্প অল্প করে ময়দা ছিটিয়ে তাল বানন। তা দিয়ে আখরোট আকারের ছোট ছোট গোলা পাকান। তৈলাক্ত সেঁকার পাতে ময়দা ছিটিয়ে তাতে করে মৃদু তাপে সেঁকে নিন।

হাঙ্গেরীয় মধুবিস্কুট

৩০০ গ্রাম সাধারণ ময়দা   ১৪০ গ্রাম ঘন মিষ্টি

একটি লেবুর শুকনো খোসার কুচি   দারচিনি, লবঙ্গ

মধু   খাওয়ার সোডা

ঘন মিষ্টি ও মধু একত্রে মিশিয়ে তাতে লেবুর খোসা, দারচিনি গুঁড়ো ও স্বাদের জন্য লবঙ্গ দিন। তারপর তাতে এক চিমটি সোডা মিশিয়ে এরপর পর্যাপ্ত মধু ঢেলে তা নরম করুন। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন পাতলা না হয়। এর পর ময়দার তাল বেলে নিয়ে (৫ মিলিমিটার পুরু করে) তা গোল করে কেটে নিন। মাখন লাগানো সেঁকার পাতে সেঁকে নিয়ে তাতে চিনির সিরা অথবা ঘন মিস্টির আবরণ দিন। ও এক চিমটি সোডা মেশান। সব কিছু ভালভাবে মাখিয়ে বেলে নেবার

পর গোল বা পছন্দসই আকারে কেটে নিন। সোনালী বাদামী রং না হওয়া পর্যন্ত তা সেঁকতে হবে। ঠাণ্ডা হলে চকলেট মিষ্টির আবরণ দেওয়া চলে। তার উপরে খোলা ছাড়ানো আখরোটের আধফালি বসিয়ে দিলে আরও শোভন হয়।

মস্কো মধুরুটি

২ কাপ মধু (বাকউইট হলে ভাল হয়)   ৪ টি ডিম

২ কাপ সাধারণ ময়দা   ১ চা-চামচ খাবার সোডা

২ কাপ রাই ময়দা

সমস্ত উপকরণ একত্রে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। ময়দার তাল ১ সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে তৈলাক্ত সেঁকার পাতে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর মোটামুটি তপ্ত চুল্লীতে (২০০° সে. বা ৪০০° ফা.) সেঁকে নিন।

মধুওয়ালা ওটকেক

১/২ কাপ মধু   ১/২ কাপ চিনি

১ কাপ ময়দা   ১ কাপ পেষাই-করা ওট

১/২ কাপ অম্লননী (সুমেতানা)   ১ টি ডিম

১০০ গ্রাম মাখন   ১/২ চা-চামচ খাবার সোডা

মাখন ও চিনি ভালোভাবে মিশিয়ে ননীর মত করুন। তার সাথে মধু ডিম, অম্লননী, ওট, ময়দা ও সোডা মিশিয়ে ভালভাবে মাখানোর পর ময়দার তাল পাতলা করে (৩-৫ মিলিমিটার) বেলে নিন। হীরক আকারে কেটে নিয়ে মোটামুটি তপ্ত চুল্লীতে (২০০° সে. বা ৪০০° ফা.) ১০-১৫ মিনিট সেঁকে নিন।

রুশী আদারুটি (কোভ্রিঝকা)

২৫০ গ্রাম সাধারণ ময়দা   ৫০ গ্রাম জল

১০০ গ্রাম চিনি ৫ গ্রাম সূর্যমুখী তেল

১০০ গ্রাম মধু ৫ গ্রাম খাবার সোডা

১ টি লবঙ্গ (গুঁড়ো-করা) ১ গ্রাম দারচিনি

মধু ও চিনি পানিতে মিশিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করার পর তা ঠাণ্ডা হয়ে ঘরের তাপমাত্রায় আসার জন্য রেখে দিন। এর পর তার সাথে মশলা ও সোডা মিশিয়ে নিয়ে তাতে ময়দা ছেড়ে ভালভাবে মাখিয়ে নরম তাল বানান। তারপর ১ সেন্টিমিটার পুরু করে বেলে তৈলাক্ত সেঁকার পাতে রেখে তাপ মাত্রা ক্রমে ক্রমে ২০০° সে. (৪০০° ফা.) পর্যন্ত বাড়িয়ে তা সেঁকে নিন।

রুশী মধুকেক (প্রিয়ানিকি)

২৫০ গ্রাম সাধারণ ময়দা ৫০ গ্রাম জল

১০০ গ্রাম মধু একটি ডিমের কুসুম

৭০ গ্রাম চিনি এক চতুর্থাংশ লেবুর শুকনো, খোসার কুচি

৩০ গ্রাম মাখন ২ গ্রাম খাবার সোডা

চিনি, মধু ও জল মিশিয়ে সিরাপ তৈরী করে প্রায় ২০০ গ্রাম ময়দা উত্তপ্ত সিরাপে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘুঁটে ঘন পেস্ট বানান। মাখানো ময়দা শীতল হয়ে ঘরের তাপমাত্রায় এলে তাতে নরম মাখন, সোডা (আগে থেকে এক টেবিল-চামচ ময়দার সাথে মিশিয়ে নেওয়া) ও লেবুর খোসার শুকনো কুচি মেশান। মোলায়েম না হওয়া পর্যন্ত ময়দার তাল মাখাতে থাকুন। তারপর ১ সে. মি. পুরু করে বেলে নিয়ে সাধারণ বা পিঠা কাটার ছুরি দিয়ে কেটে পছন্দসই টুকরো করুন। তৈলাক্ত সেঁকার পাতে সেগুলো রেখে তার উপর ডিমের কুসুমের প্রলেপ লাগান এবং মৃদু তাপের চুল্লীতে সেঁকে নিন। এই মধুকেকের স্বাদ-গন্ধ খুবই মনোরম এবং বেশ ভাল থাকে।

তাজিক খইয়ের মোয়া

১ কিলোগ্রাম এই বানানোর ভুট্টা ১ কাপ মধু

খই ভাজার পাত্রে ভুট্টো ভেজে খই বানান। মধুর সাথে খই মিশিয়ে আপেল আকৃতির মোয়া বানান।

তাজিক মধু ও বাদামের হালুয়া

১ কিলোগ্রাম মধু ১/২ কাপ চিনি

১ কিলোগ্রাম খোলা ছাড়ানো আখরোট

মধুকে অনবরত নাড়তে নাড়তে সিদ্ধ করুন। তাতে আখরোটের কুচি ও চিনি মেশান এবং ঘন হয়ে জমাট বাধার (প্রায় শক্ত) উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত চুলোয় রাখুন। তারপর জল ছিটিয়ে নেওয়া তক্তার উপর তা ঢেলে ১০-১৫ মিলিমিটার পুরু স্তর বানান। ঠাণ্ডা হলে চৌকো আকারে টুকরো করে পরিবেশন করুন। আখরোটের বদলে পেস্তাবাদাম, চিনা বাদাম, কিংবা কাগজিবাদাম (almonds) ব্যবহার করা চলে তবে তা আগেভাগে অল্প ভেজে নিতে হবে।

তাজিক মধু মিষ্টান্ন

এক কিলোগ্রাম মিষ্টান্ন তৈরী করতে এক কিলোগ্রাম মধু লাগে। লোহার কড়াইতে ঢেলে অনবরত নেড়ে নেড়ে কালচে বাদামী রং না ধরা পর্যন্ত মধু ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত মধু তৈলাক্ত ট্রে-তে ছড়িয়ে দিন। তারপর চেপে চেপ্টা করে, টেনে টফির মত বিনুনী পাকান এবং তা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আংটি, কুন্ডুলী কিংবা কুশন আকৃতির ছোট ছোট টুকরো বানান।

তাজিক জিলাপী (জুলাবিয়েহ)

১ কিলোগ্রাম সাধারণ ময়দা   ৪ টি ডিম

১½-২ কাপ দুধ   ১/২ চামচ লবণ

১ কাপ মধু   ৬০০-৮০০ গ্রাম রান্নার তেল

ময়দা, দুধ ও ডিম মিশিয়ে খামি না-মেশানো শক্ত ময়দার তাল বানান এবং তা ৪০-৫০ মিনিট রেখে দিন। তারপর একটা গামলায় ময়দার তাল রেখে তাতে অল্প অল্প করে দুধ এমনভাবে মেশাতে থাকুন যাতে তা ঘন ননীর মত হয়। চুলের উপর কড়াইতে বা তামার পাত্রে প্রচুর পরিমাণ উত্তপ্ত তেলের মধ্যে (বা চর্বিতে) ঐ গোলা সরু ধারায় ধীরে ধীরে আড়াআড়ি ধারায় ঢেলে জাফ্‌রির মত বানান। উভয় দিক বাদামী না হওয়া পর্যন্ত তা তেলে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তা মধু ও চিনি দিয়ে আগে থেকে তৈরী সিরাপের মধ্যে জিলাপী (জুলাবিয়েহ) ঢেলে দিন এবং পাঁচ-সাত মিনিট তাপে রাখার পর পরিবেশন করুন। মধু ও ফলের রস সহযোগেও জিলাপী পরিবেশন করা যেতে পারে।

উজবেক হালুয়া (বাদরোক)

২০০ গ্রাম ভেজে নেওয়া ভুট্টা (ভারতীয় শস্য)   ১/২ কাপ মধু

২০০ গ্রাম খোলা ছাড়ানো আখরোট   ১ চামচ ঘি

ভাজা ভুট্টা ও আখরোটের শাঁস পিষে সামান্য ঘি-মাখানো তৈলাক্ত চিনামাটির পাত্রে রাখুন। এলুমিনিয়ামের কোন পাত্রে মধু পাঁচ থেকে সাত মিনিট ফুটিয়ে ভুট্টা ও আখরোটের গুঁড়োর উপর ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর কোন প্লেট বা বড় থালায় ঢেলে চাপ দিয়ে তা ১ সেন্টিমিটার পুরু করুন। হীরক আকৃতিতে কেটে নিয়ে তারপর তা চায়ের সাথে (কালো বা সবুজ) পরিবেশন করবেন।

উজবেক নুডল (চাক-চাক)

৫০০ গ্রাম সাধারণ ময়দা   ১৫০ গ্রাম ভেড়ার চর্বির তেল

৫০০-৬০০ গ্রাম মধু   ৩৫০ গ্রাম উদ্ভিজ্জ তেল (তুলাবীজের তেল হলে ভাল হয়) কিংবা ৫০০ গ্রাম ঘি

৫০০-৬০০ গ্রাম মধ্ন   ১০০-১৫০ গ্রাম চিনি

৫-৬ টি ডিম

ডিম ভেঙ্গে ময়দার মধ্যে দিন এবং মেখে শক্ত তাল বানান। তারপর যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলে তা ৪ বা ৫ সেন্টিমিটার লম্বা সরু ফালি করে কাটুন। থেকে-যাওয়া কিনারাগুলো ভেড়ার চর্বির তেল ও কার্পাস বীজের তেলে (কিংবা চর্বির তেল ও ঘিয়ে) ভেজে নিন। নুড্লগুলো ভেজে বাদামী কাগজে ঠাণ্ডা হওয়া ও তেল সরে যাওয়ার জন্য রেখে দিন। এই ফাঁকে ধাতুর গামলায় করে মধু আগুনের তাপে গলিয়ে নিয়ে তাতে চিনি (নুডলকে শক্ত করার জন্য) মেশান। চিনি পুরো গলে গেলে আগুনের ওপর থেকে গামলা নামিয়ে ফেলুন। এবার গভীর একটা গামলার মধ্যে কয়েক মুঠো ভাজা নুডল ফেলে তার উপর মধু ও চিনির সিরাপ ঢেলে নাড়তে থাকুন। আরো নুডল দিন, তারপর আরও সিরাপ। এরপর দেরী না করে সিরাপ মাখানো নুডল তৈলাক্ত কাগজের উপরে রেখে হাতে (পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে) চেপে চেপে পছন্দসই আকৃতি দিন। 'চাক-চাক' তৈরী হয়ে গেলে ফ্রিজে কিংবা ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিন যেন বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। তারপর রঙিন মিস্টান্ন কিংবা ফলের রসের ফোঁটা দিয়ে তা শোভিত করুন এবং ছোট ছোট পরিপাটী টুকরো করে পরিবেশন করুন।

মুগোল্লাক্ত মধু-হালুয়া

১ কিলোগ্রাম সাধারণ ময়দা   ৪০০ গ্রাম ঘি

৪০০ গ্রাম মধু

ময়দা চালুনিতে ঢেলে ভাজার জন্য কড়াইতে ছাড়ুন এবং তাতে ঘি ঢেলে ভালভাবে নেড়ে সমস্ত ময়দা হলুদ ও ঝরঝরে এবং সমানভাবে ভাজা না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। এরপর তার সাথে মধু মেশান এবং আরও পাঁচ মিনিট ভাজুন। তারপর হালুয়া একটা প্লেটে বেড়ে সমান করে নিয়ে চৌকো করে কাটুন।

মধু-মেশানো ক্ষীর

একজনের খাবার তৈরীর জন্য (২০০ গ্রাম):

৫০ গ্রাম চাল   ৭০ গ্রাম জল

৫০ গ্রাম দুধ   ২০ গ্রাম মধু

১০ গ্রাম মাখন   ১ গ্রাম লবণ

ভাত রান্নার মত করে দুধ ও মাখন দিয়ে ক্ষীর রান্না করুন এবং পরিবেশনের আগে তাতে মধু মেশান।

টাটকা শশা ও মধু

একজনের খাবারের জন্য:

১২০ গ্রাম শশা   ২৫ গ্রাম পরিস্কার মধু

মাঝারি আকারের শশা ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর আড়াআড়ি চাক চাক করে কাটুন। এরপর সেগুলির উপর মধু ঢেলে পরিবেশন করুন। খাবার এতে যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর হয়।

অম্লননী ও মধুসহ কুচানো গাজর

এক ভাগ তৈরীর (১০০ গ্রাম) জন্য:

৬০ গ্রাম কুরে ধুয়ে নেওয়া গাজর   ২০ গ্রাম মধু

২০ গ্রাম অম্লননী (সুমেতানা)

ফালি ফালি করে কাটা কিংবা কুচানো গাজর পরিবেশনের আগে মধু ও অম্লননী মিশিয়ে নিন।

টাটকা টমাটো ও মধু

সদ্য পেকেছে এমন টমাটো বেছে নিন। ধুয়ে নেওয়ার পর সেগুলোকে মাঝামাঝি কেটে দু'ভাগ করুন। প্রত্যেক অর্ধাংশের উপর মধু ঢেলে দিন এবং খাবারের শেষে ফল মিষ্টি হিসেবে পরিবেশন করুন।

মধু ও খামি পেস্ট

সব বয়সী লোক বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য এটা একটা মূল্যবান ও পুষ্টিকর খাবার। রুমানিয়ার বিজ্ঞান একাডেমীর ভূতপূর্ব সভাপতি অধ্যাপক ক. ই. পারহন এই খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর 'বয়সের জীববিজ্ঞান' (বুখারেস্ট, ১৯৫৯) বইতে।

মধুর সাথে সমপরিমাণ রুটিকরের খামি (Baker's yeast) কিংবা এক ভাগ মধুর সাথে দুই ভাগ খামি মিশিয়ে এই পেস্ট তৈরী করা হয়। দৈনিক ৫০-৭৫ গ্রাম খুবই চমৎকার স্বাস্থ্যবর্ধক।

শশার আচার ও মধু

লবণজারিত শশা বা ক্ষীরা আড়াআড়ি করে কেটে চারভাগ করুন। টুকরোগুলোর উপর মধু ঢেলে আহার শেষের ফলমিষ্টি হিসেবে পরিবেশন করুন।

পোলিশ ছানা ও মধু

৪৫০ গ্রাম ছানা ৩ টেবিল-চামচ মধু

চাল্‌নীতে ছে'কে নিয়ে ছানা মধুর সাথে মিশিয়ে তাকে মোলায়েম করে নিন। তারপর ডিশে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

মধু যুক্ত রুশী সালাদ

এক ভাগের জন্য (১০০ গ্রাম):

১০ গ্রাম রান্না-করা গাজর ১৫ গ্রাম রান্না-করা বীটমূল

২০ গ্রাম সিদ্ধ আলু (চৌকো করে কাটা) — ৩০ গ্রাম লবণজারিত শশা কিংবা শশার আচার

১৫ গ্রাম বসন্তকালীন পেঁয়াজ — ১০ গ্রাম মধু

সচরাচর নিয়মে রুশী সালাদ বানান। সব রকম সব্‌জি চৌকো চৌকো করে কেটে একত্রে মেশান (স্বাদের জন্য লবণও দেবেন)। পরিবেশনের আগে সালাদের উপর মধু ঢালুন এবং মিশিয়ে নিন।

শুকনো কুল ও মধুর স্টিউ (তাপসিদ্ধ খাবার)

একজনের জন্য:

৮৩ গ্রাম স্টিউ করার জন্য গোমাংস — ১০ গ্রাম মধু

১৫ গ্রাম কুচানো পেঁয়াজ — ৫ গ্রাম রান্নার চর্বি

১৫ গ্রাম বিচি ছাড়ানো শুকনো কুল — ১ গ্রাম মশলা ও লবণ

স্বাদের জন্য টমাটো

কাঁচা মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে ভেজে নিয়ে ক্যাসেরোল বা তাপ নিরোধক ডিশে রাখুন। টমাটো, বাদামী করে ভাজা পেঁয়াজ ও ভাল করে ধোওয়া বিচি ছাড়ানো কুল তাতে দিন। প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত হালকা আগুনে ফুটতে দিন। পরিবেশনের আগে মধু ঢালুন। ক্যাসেরোল থেকে কিংবা ছোট চিনামাটির পাত্রে করে কিংবা কড়াই থেকে ভাজা মাংসের ঝোল সহ পরিবেশন করুন। প্রয়োজনে স্টিউ করা সব্‌জি দিয়ে প্লেটের চারধার সাজান।

মধুসরবত ও পানীয়

জাতীয় মহাকাব্য, লোককাহিনী, উপকথা ও গানে মধু সরবত ও পানীয়ের উচ্চ প্রশংসা দেখা যায়। তা তৈরী করার প্রণালীর কাহিনী

প্রাচীন কাল থেকেই সুবিদিত, আর কি প্রাচীন কি আধুনিক সব ধরনের কবি ও লেখক এ নিয়ে চমৎকার সব রচনাংশ লিখেছেন। গ্রীক পুরাণে দেখা যায় যে, মধুর উপদেবী মেলিসা, দেবতাদের রাজা ও শাসক জুউসের (Zeus) পরিচর্যা করেছিলেন এবং তাঁকে মধু থেকে সুস্বাদু সুরা তৈরীর পন্থা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মাতা রীয়া (Rhea)-র সাহায্য নিয়ে জুউস তাঁর পিতা ক্রোনাসকে প্রচুর পরিমাণে এই মধুসুরা খাওয়ানোর পর তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে জুইস সিংহাসন অধিকার করে নেন।

ফিনিশ 'কালেভালা'র পঁচিশতম অধ্যায়ে বিয়ে উপলক্ষে ভোজের বর্ণনা এই রকম:

বার্লির বীয়ারের অবিরাম চলেছে জোয়ার,
মধু-পানীয়ের কিছু হয়নি যোগাড়,
ভূতলে ভাঁড়ার ঘরে বীয়ারের সুপ্রচুর ধারা,
প্রবাহিত সবার জন্য, দ্রুততর করে রসনা,
বীয়ার আর মধুসুরা চিত্তে আনে নতুন
প্রাণনা।

স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরত্ব গাথায়, স্কটিশ উপকথায়, ওয়েল্‌সের প্রথারীতিতে মধুসুরার বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। পনেরো শতক পর্যন্ত রাশিয়াতে এবং সাধারণভাবে স্লাভদের মধ্যে মধুপানীয় বা মধুসুরা 'জাতীয়' সুরা হিসেবে গণ্য হত। রুশী মহাকাব্যগুলোতে মধুসুরাতে অতিপ্রাকৃতিক নিরাময় ক্ষমতা আরোপিত হতে দেখা যায়।

'কালেভালা'তে আছে, 'প্রাজ্ঞ ও বিস্ময়কর জাদুকর' ওয়াইনামোইনেন লোহির শিশুদের নয় রকম রোগ নিরাময়ের জন্য উষ্ণ মধুস্নানের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন:

তাপে গরম বেলেপাথর, তার উপরে
দিলাম ঢেলে পবিত্র এই পানির ধারা,
এবার তবে পানিটুকুন যা হয়ে যা এমন মধু,
রোগ সারানোর মলম যাতে বোঝাই করা।
যাদুর পানি, গুণের পানি এবার তরে,

সোনা মানিক সবার গায়ে অঝোর ধারায়
বইতে হবে।

কালো কুর‍্যাণ্ট ও দুধ-মধু

৩ কাপ দুধ   ৩০০ গ্রাম কালো কুর‍্যাণ্ট

৪ চা-চামচ মধু

দুধ ফুটিয়ে নিয়ে তাতে মধু মেশান এবং শীতল হতে দিন। কালো কুর‍্যাণ্টগুলোর বোঁটা ছাড়িয়ে তা ভালভাবে ধুয়ে চাল্‌নীতে ঘষে ঘষে ছাঁকুন। যে ঘন মণ্ড পাওয়া গেল তাতে দুধ ঢেলে দ্রুত নাড়তে থাকুন

মধ্য এশীয় 'বল'

মধ্য এশিয়ার অনেক ভাষায় 'বল' বলতে মধু কিংবা মধু দিয়ে তৈরী পানীয় বোঝায়। এক লিটার 'বল' তৈরীর জন্য দরকার:

১২৫ গ্রাম মধু   ১ লিটার জল

২৫ গ্রাম দারচিনি   ৫ গ্রাম আদা

৫ গ্রাম লবঙ্গ   ১/৪ অংশ লরেল-পাতা

০·২৫ গ্রাম কাল গোলমরিচ

গরম জলে মশলা ও লরেলপাতা ছেড়ে দিয়ে তা ফুটন্ত অবস্থায় নিন। তারপর আগুনের আঁচ থেকে সরিয়ে ভালভাবে মুখ বন্ধ করে ৫ থেকে ১০ মিনিট রাখুন যেন জলে মশলার স্বাদ ও গন্ধ ঢুকে যায়। তারপর তাতে মধু ঢেলে ভালভাবে ছে'কে নিন এবং গরম গরম পরিবেশন করুন।

মধুওয়ালা টেবিল-পানীয়

প্রতি জনের জন্য:

১ কাপ সিদ্ধ জল   ২৫ গ্রাম মধু

১ গ্রাম সাইট্রিক এসিড

গরম জলে মধু মেশান এবং চার মিনিট ধরে ফুটান। তারপর তাতে সাইট্রিক এসিড ঢালুন। ঠান্ডা হলে সেঁকে নিয়ে পরিবেশন করুন।

মধু ও খামিদুধ

সব বয়সী লোকের জন্য এটি খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। এতে প্রয়োজনীয় সব রকম অ্যামিনো এসিড থাকে বলে এবং তা মনোসাক্কারাইড, ভিটামিন, খনিজ, অনুমৌল ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ বলে ক্রমবর্ধমান (শিশু) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সব চাহিদা তা মেটাতে পারে। হৃদরক্তসংবহনতন্ত্র ও পাকান্ত্রিক নালীর উপর হিতকর প্রভাব ফেলে বলে বয়স্কদের জন্যেও এই দুধ বিশেষ উপকারী। মধু ও খামিদুধ তৈরীর প্রণালী নিম্নরূপ:

১ কিলোগ্রাম রুটিকরের টাটকা খামি   ৪০ গ্রাম ঘন মিষ্টি

৩·৬ লিটার (১৮ কাপ) জল   ৩০০ গ্রাম পরিস্কার মধু (বাকউইট শ্রেয়)

২০০ গ্রাম মাখন   ২০০ গ্রাম ময়দা (ভুষিযুক্ত হলে ভাল হয়)

এনামেলের সস্‌প্যানে খামির সাথে চিনি দ্রুত মেশান যেন তা মোলায়েমভাবে মিশে যায়। তারপর তাতে এক লিটার (৫ কাপ) জল মিশিয়ে দু'ঘণ্টা সিদ্ধ করুন। এরপর বাকী ১৩ কাপ জল তার সাথে মিশিয়ে আরও ১৮-২০ মিনিট সিদ্ধ করুন। এবার তাতে ময়দা ও মাখন ঢেলে ফুটন্ত পেস্টে পরিণত করুন। গরম থাকতে থাকতে খামিদুধ ছেঁকে নিয়ে তাতে মধু ঢেলে ভালভাবে নাড়ুন যেন তা সর্বত্র সমান ভাবে মিশে যায়। দুধ ফ্রিজে রেখে দিন। দু'চামচ দুধ গরম করে (ঘরের তাপমাত্রায় এনে) দৈনিক দুই বা তিন বার খাবেন।

মধুসুরা (Mead)

মধু দিয়ে তৈরী সব ধরনের সরবত ও পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে সুস্বাদু হচ্ছে মধুসুরা। তা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় বহু উপাদান সমৃদ্ধ এবং খুবই পুষ্টিকর। দ্রুত তৃষ্ণা মেটানো, খাদ্য পরিপাক ও বিপাকে তা চমৎকার কাজ করে। বিশেষ করে যাঁরা রক্তশূন্যতা কিংবা

পাকান্ত্রিক নালীর (অম্ল স্বল্পতা সহ পাকস্থলী প্রদাহ, শিথিল ক্রম সংকোচ সহ মলান্ত্র প্রদাহ ইত্যাদি) দীর্ঘ রোগে কষ্ট পাচ্ছেন কিংবা আরোগ্য লাভের পর্যায়ে রয়েছেন তাঁদের জন্য মধুসুরা খুবই উপকারী।

মধুসুরা তৈরীর জন্য নিম্নলিখিত উপকরণগুলো দরকার: খাঁটি মধু, হপ লতা (সুগন্ধের জন্য), মশলা (দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ওরিসমূল, আদা, ভ্যানিলা, পুদিনা), ক্র্যানবেরি, জুনিপার বেরি, রাস্‌প্‌বেরি, চেরী, কুর্যান্ট (লাল, সাদা বা কাল) গোলাপের পাপড়ি, লেবু, কমলা কিংবা অন্যান্য ফল, কিশমিশ বা সুলতানা, চোলাইকর বা রুটিকরের খামি।

মধুসুরা তৈরীর জন্য চোলাই রস (must) বা চোলাই সীরা (wout) প্রস্তুত করে নিতে হয়। যদি মধুকোষের মধু ব্যবহার করা হয় তবে হালকা ফুটন্ত প্যানিতে মধুকোষ ডুবিয়ে রাখা উচিত। তা হলে মোম ভেসে উঠবে এবং তা আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া যাবে। যদি সরাসরি মধুকোষ থেকে না নিয়ে অন্য মধু ব্যবহার করা হয় তবে উত্তপ্ত করার সময় যে গাঁজলা ভেসে উঠবে তা ফেলে দিতে হবে। মধু সিদ্ধ না করলে স্বাদগন্ধ অনেক বেশি থাকে, তবে তা সিদ্ধ করা মধুর চেয়ে অনেক আগে টকে যেতে পারে। চোলাই রস তৈরী করতে হলে মধুকে ছ'ভাগ পানির সাথে মিশিয়ে তরল করে নিতে হবে এবং মশলা মিশিয়ে সুগন্ধি করতে হবে। মধুর পরিবর্তে ফলের রসও ব্যবহার করা যেতে পারে। মধু, পানি, মশলা ও ফলের রস মেশানোর সাথে সাথে গাঁজানো শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধ মধু দিয়ে সুরা তৈরী করতে হলে চোলাই রস দুই থেকে চার ঘণ্টা সিদ্ধ করে নিতে হয় যাতে তার রং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর তা শীতল করে গাঁজানোর জন্য রেখে দিতে হয়। হপ ব্যবহার করতে হলে তা সিদ্ধ করার কাজ শেষ হবার ১০-১৫ মিনিট আগে মিশিয়ে দিতে হবে। মধু সিদ্ধ করে শীতল করার পরই কেবল তাতে ফলের রস মেশানো চলে।

চোলাই রস তৈরী হয়ে গেলে তা মসলিনে ছেঁকে নিয়ে গাঁজতে দিতে হবে। উপরটা সাদা ফেনা ও বুদবুদে ভরে উঠতে শুরু করলে বুঝতে হবে যে, গাঁজানো শুরু হয়েছে। ফেনা অদৃশ্য হয়ে গেলে বুঝতে হবে, প্রাথমিক পর্যায়ের গাঁজানো শেষ হয়েছে।

কাঁচা মধুসুরা কোন ফ্রিজে কিংবা ঠান্ডা ভূতল ভাঁড়ারঘরে ধীরে ধীরে গাঁজানোর জন্য দু-এক মাস রেখে দিতে হবে। ঠান্ডা জায়গায়

দীর্ঘতর গাঁজানোর ফলে সুরা পরিপক্ক হলে তা অধিকতর পরিস্কার হয় এবং স্বাদ ও সৌরভ বাড়ে। তা থাকেও ভাল।

১২°-১৫° সে.-এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় মধুসুরা গাঁজিয়ে পরিপক্ক করা ঠিক নয়। চূড়ান্ত রকম গাঁজানোর কাজ যদি ২°-৪° সে. তাপমাত্রায় চলে তবে তা সবচেয়ে ভাল। কারণ, মধুসুরাকে নষ্ট করার মত উপজাত এই তাপমাত্রায় জন্ম নিতে পারে না। গাঁজানো শেষ হয়ে গেলে মসলিন কাপড়ে মধুসুরা ছেঁকে নিতে হবে।

প্রস্তুত পর্ব শুরু হওয়ার ৮ সপ্তাহ পরে পরিপক্ক মধুসুরা বোতলে শ্রেয়ত: শ্যাম্পেন বোতলে ভরে ছিপিবদ্ধ করা হয় এবং ধরার সুবিধার জন্য তা তার দিয়ে বাঁধা হয়। বোতলে ভরার পর পান করার আগে তা আরও সপ্তাহ দুয়েক রেখে দেয়া উচিত।

মধুসুরা-ভর্তি বোতল সবচেয়ে ভালো ভাবে রাখার উপায় হচ্ছে তা বরফের উপর কিংবা বরফবাক্সের হিমায়িত কামরায় কিংবা রেফ্রিজারেটারে রাখা। ঠান্ডায় রাখা হলে মধুসুরা কমপক্ষে তিন থেকে চার মাস ভাল থাকে। ডিমের সাদা অংশ কিংবা মৎস্যজিলেটিন (isinglass) ছাড়াই এই সময় তার রং আরও হালকা হয়ে ওঠে।

খামি ছাড়া মধুসুরা যত ভাল থাকে খামি দিয়ে বানানো মধুসুরা ততটা নয়। খামি দিলে খাঁটি পরিপোষণ (culture; ১৮-২০ লিটার চোলাই রসের জন্য ১০০ গ্রাম) ব্যবহার করা হয় এবং গাঁজানোর মূল প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই তা চোলাই রসে ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। খামি দেওয়া হলে এক থেকে তিন দিনের মধ্যেই গাঁজানো শুরু হয়ে যায় এবং গাঁজানো ও পরিপক্ক হওয়ার পর আরও দু'সপ্তাহ লাগে।

হালকা রঙের মধুসুরা পেতে হলে প্রতি তিন বা পাঁচ লিটার (১ গ্যালন) মধুসুরার জন্য একটি ডিমের কুসুম (কিংবা প্রতি পাঁচ লিটারে ১ গ্রাম মৎস্যজিলেটিন) দিলেই হল)।

সাতজাতীয় মধুসুরা

৫ লিটার পানি	৮০০ গ্রাম মধু
২৫ গ্রাম খামি	২ টি লেবু

পানি ফুটিয়ে তাতে মধু মেশান। তারপর শীতল করে তা ২০° সে. তাপমাত্রায় এনে তাতে খামি, লেবুর রস (কিংবা সাইট্রিক এসিডের সমতুল্য বিকল্প) মিশিয়ে ১০-১২ ঘণ্টা রেখে দিন। শীতল করে বোতলে ভরে ছিপিবদ্ধ করুন।

লেবু মধুসুরা

২ কিলোগ্রাম মধু   ১০০ গ্রাম হপ্

৬-৮ টি লেবু   ১০০ গ্রাম খামি

৩ গ্রাম মৎস্য জিলেটিন

১২ লিটার পানিতে মধু ও হপ ফুটিয়ে নিন। শীতল করা হলে তা হবে মধুর চোলাই রস। খামি মিশিয়ে গাঁজতে দিন। তারপর ঠাণ্ডা জায়গায় (রেফ্রিজারেটার কিংবা ঠাণ্ডা ভূতল ভাঁড়ারে) দুই থেকে তিন সপ্তাহ রেখে দিন। মধুর অবশেষ ছেঁকে বের করে বাকীটা বোতলবদ্ধ করুন। কাজে না লাগা পর্যন্ত ছিপিবদ্ধ বোতল ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিন।

লাল মধুসুরা

৪ কিলোগ্রাম মধু   ২৫ লিটার জল

১০০ গ্রাম হপ   ৬ গ্রাম ওরিস মূল

১ টেবিল-চামচ পোড়া চিনি   ২-৩টি এলাচ দানা

২৩ লিটার তৈরী হবে।

রুশী মধুসুরা

৪ কিলোগ্রাম মধু   ১৫ লিটার জল

২০০ গ্রাম খামি   ২০০ গ্রাম হপ

উপরে বর্ণিত সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করুন। ১৫ লিটার তৈরী হবে।

তাতার মধুসুরা (বল)

৪ লিটার সিদ্ধ পানি ২·৫ কিলোগ্রাম মধু

১০০ গ্রাম খামি

মধুকোষ থেকে মধু নিয়ে তা গরম করে ছেঁকে নিয়ে ছোট ওক-পিপায় (১০ লিটার) ঢালুন। গরম জল ও খামি মেশান। পিঁপাটা ঘরের তাপমাত্রায় আট থেকে দশ দিন রেখে দিন। গাঁজানো শেষ হয়ে গেলে পিঁপাটা ঠাণ্ডা জয়গায় সংরক্ষণ করুন। মধুসুরা বা 'বল' ছয়মাস ভালো থাকবে। ঠাণ্ডা অবস্থায় পরিবেশন করুন। দশ লিটার তৈরী হবে।

সাদা মধুসুরা

৪ কিলোগ্রাম মধু ১০০ গ্রাম হপ

২৫ লিটার পানি ৬ গ্রাম ওরিস মূল

২-৩টি এলাচ দানা

২৩ লিটার তৈরী হবে।

অন্যান্য পানীয়

পোলিশ কাল কুর‍্যান্ট সিরাপ

৫ টেবিল-চামচ মধু ৬০০ গ্রাম কাল কুর‍্যান্ট

২ গ্লাস সোডা জল

বোঁটা ছাড়িয়ে কাল কুর‍্যান্টগুলো ভাল করে ধুয়ে নিন। সূক্ষ্ম চালনের

উপর ঘষে ঘষে রস বের করে তা মধুর সাথে মেশান। কয়েকটা গ্লাসে মণ্ড ঢেলে নিয়ে তাতে বরফ মেশান এবং সোডা জল দিন। তা ফুঁসে উপরে উঠবে।

পোলিশ গুজবেরি ও রাস্‌প্‌বেরি সরবত

১০০ গ্রাম গুজবেরি	৩ টেবিল-চামচ মধু
৩০০ গ্রাম রাস্‌প্‌বেরি	২½ গ্লাস সিদ্ধজল

বেরি ধুয়ে পরিস্কার করে নিয়ে চালনীর মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট করান। ফুটন্ত জলে মধু মিশিয়ে চাল্‌নী-ছাঁকা বেরির সাথে তা মেশান। মসলিনের কাপড়ে মিশ্রিত তরল ছেঁকে নিন। ঠাণ্ডা অবস্থায় গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

পোলিশ গাজর ও লেবুর সরবত

১ কিলোগ্রাম গাজর	২ টেবিল-চামচ মধু
একটি লেবুর রস	১ গ্লাস সিদ্ধ জল
লবণ	স্বাদের জন্য শুলফা

গাজর খুব ভাল করে ঘষে ধুয়ে ফালি ফালি করে চিরে নিন। চিপে রস নিংড়ে নিয়ে শীতল করা সিদ্ধ জল মেশান (চেরা ও রস নিংড়ে নেওয়ার জন্য রস নিঃসারক যন্ত্রও ব্যবহার করা যেতে পারে)। এবার তাতে লেবুর রস, মধু ও স্বাদের জন্য লবণ দিন। পরিবেশনের আগে মিহি করে কুচিয়ে কাটা শুলফা সাথে দেওয়া যেতে পারে।

পোলিশ পুদিনা ও ক্যামমাইল চা

১ চা-চামচ শুকনো পুদিনা	১ চা-চামচ শুকনো ক্যামমাইল
১ গ্লাস জল	স্বাদের জন্য মধু

ফুটন্ত জলে পুদিনা ও ক্যামমাইল ডুবিয়ে দশ মিনিট ঢেকে রাখুন। ছেঁকে মধু মিশিয়ে চায়ের পরিবর্তে পরিবেশন করুন।

রোজহিপ সিরাপ

১ লিটার জল

২-৩ টেবিল-চামচ রোজহিপের মণ্ড (puree)

১ টেবিল-চামচ মধু

জল সিদ্ধ করে নিয়ে শীতল হতে দিন। রোজহিপের মণ্ড (কিংবা সমতুল্য অন্যকিছু) মধু ও ঠান্ডা জলের সাথে একত্রে মেশান। গ্লাসে এক টুকরো বরফ ফেলে ঠান্ডা অবস্থায় পরিবেশন করুন।

রোজহিপ ও ক্যামমাইল চা

১ টেবিল-চামচ শুকনো রোজহিপ

১ চা-চামচ শুকনো ক্যামমাইল

১ গ্লাস জল

স্বাদের জন্য মধু

রোজহিপ ধুয়ে নিয়ে জল ডুবিয়ে পাঁচ মিনিট সিদ্ধ করুন। তারপর তাতে ক্যামমাইল ছেড়ে দিয়ে ১০ মিনিট ঢেকে রাখুন। ছেঁকে মধু মিশিয়ে চায়ের বদলে পরিবেশন করুন।

রুশী মধু ক্‌ভাস

সাধারণ রুশী ক্‌ভাস গাঁজানো তবে অ-সুরাসার (non-alcohlic) পানীয়। তবে মধু দেওয়া হলে গাঁজানোর সময় তাতে সুরাসার তৈরী হয়ে থাকে।

রাই ময়দার সীরা	৩ কিলোগ্রাম
মাঝারি করে পেষা রাই ময়দা	৪ কিলোগ্রাম
মধু (কিংবা ঝোলাগুড়)	১০০ গ্রাম

গাঁজানোর জন্য ময়দা	২০০ গ্রাম
তরল খামি	৩ টেবিল চামচ

ময়দার সীরার সাথে রাই ময়দা একত্র করে ঠাণ্ডা জলে মেশান। ময়দা ভালভাবে মেখে তাল বানান যাতে ভেতরে কোন ড্যালা না থাকে। তারপর এনামেলের ডিশে করে কোন উত্তপ্ত চুল্লী বা স্টোভের পাশে একদিন ফেলে রাখুন। পরদিন তার উপর আরও ২৪ ঘণ্টা রাখুন (অবশ্য ময়দার তাল রাখার আগে চুল্লী নিভিয়ে শীতল হতে দিতে হবে)। দু'দিন পার হবার পর ময়দার তাল মাখানোর গামলায় তা রেখে তার উপর ৩২ লিটার গরম জল ঢেলে অনবরত নাড়তে থাকুন। তরল সীরা ঢেকে দিয়ে উষ্ণ জায়গায় ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা রেখে দিন। এদিকে ২০০ গ্রাম ময়দা, খামি ও এক গ্লাস জল মিশিয়ে গাঁজানোর সীরা তৈরী করে নিন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে দেওয়ার পর তা আগে থেকে প্রস্তুত পিপায় (গরম পানি ও বাষ্প দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নেওয়া) কিংবা এনামেল পাত্রে গাঁজানোর জন্য সাবধানে ঢালুন। সাথে সাথেই তাতে খামির মিশ্রণ ও মধু (কিংবা ঝোলাগুড়) মিশান। খুব ভালভাবে নাড়ার পর উষ্ণ জায়গায় সীরা ১২-১৬ ঘণ্টা গাঁজতে দিন। গাঁজানো শেষ হবার পরও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (মধুসুরা হালকা হওয়ার জন্য) রেখে দিন। হালকা লিকার-বোতলে ভরে রেফ্রিজারেটার বা ঠাণ্ডা ভূতল ভাঁড়ারে রাখুন।

মধু ও সজিনা সহ রুশী কভাস

১ লিটার কভাস ২৫ গ্রাম মধু

৫ গ্রাম সজিনা

সজিনার মূলকে ফালি ফালি করে কাটুন। মধু উষ্ণ করে কভাসের সাথে মেশান। কুচানো সজিনামূল তাতে ফেলে রেফ্রিজারেটারে ২৪ ঘণ্টা রাখুন। তারপর ছেঁকে নিয়ে পরিবেশন করুন (পিপের কভাস না পেলে বোতলবদ্ধ রুশী কভাস ব্যবহার করা চলবে।)

স্ট্রবেরি দুধ

১½ কাপ দুধ　　১ টেবিল-চামচ মধু

১০০ গ্রাম টাটকা বুনো স্ট্রবেরি

দুধের সাথে মধু ও স্ট্রবেরি কাটা মেশান। এক চিমটি লবণ মিশিয়ে মিশ্রণকে ভাল করে ফেটিয়ে মিহি করে নিন।

মধুর আচার ও জ্যাম

আর্মেনীয় আঙ্গুরের আচার

প্রতি কিলোগ্রাম আঙ্গুরের জন্য:

২০০ গ্রাম জল	২০০ গ্রাম ভিনিগার
৫০ গ্রাম চিনি	৫০ গ্রাম মধু
২০ গ্রাম লবণ	৫ টি লবঙ্গ

৫ দানা এলাচ

আঙ্গুর (মাঝারি আকারের গুচ্ছ) ধুয়ে নিয়ে বয়মে থাকে থাকে সাজান। তারপর উপকরণগুলো একত্রে মিশিয়ে তার উপর আচারের তরল বা ম্যারিনেইড ঢেলে দিন। কুল, খুবানি বা অন্যান্য ফল ও বেরি এভাবে আচার বানিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। বেরি প্রথমে ভাপে সিদ্ধ করে নিতে হবে তারপর সিদ্ধ শীতল জলে রেখে শীতল করে নিতে হবে।

কাল কুর‍্যান্ট ও মধু

কাল কুর‍্যান্টে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন (উপভিটামিন A বা ক্যারোটিন, ভিটামিন B_1 বা থায়ামিন, ভিটামিন P বা রুটিন, ভিটামিন C_2) আছে। ভিটামিন C থাকায় সেগুলি রান্না না করে সরাসরি সংরক্ষণ করা উচিত। তা করার নিয়ম এই: বোঁটা ছাড়িয়ে বেরি ধুয়ে নিন। কাঠের মুগুর দিয়ে ছেঁচে তা দিয়ে মণ্ড বানান। তারপর মধুর সাথে ঐ মণ্ড ভাল করে

মেশান (সম অনুপাত ওজনে)। বয়মে ঢুকিয়ে প্যারাফিন মোম দিয়ে বয়ম সীলবদ্ধ করে শীতল অন্ধকার জায়গায় রাখুন। বয়ম আগে থেকে নির্বীজ করে নিলে এবং ধাতুর ঢাক্‌না দিয়ে মুখ বন্ধ করা হলে মিশ্রণ অধিকতর ভাল থাকে।

ক্র্যানবেরি ও আপেল জ্যাম

১ কিলোগ্রাম ক্র্যানবেরি	১ কিলোগ্রাম আপেল
৩ কিলোগ্রাম মধু	১ কাপ আখরোট

ক্র্যানবেরি বাছাই করে ধুয়ে নিন। ঢাক্‌নাবদ্ধ সসপ্যানে আধাকাপ জল দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন। তারপর সিদ্ধ বেরিগুলো বেটে নিয়ে চাল্‌নীতে ঘষে ছেঁকে নিন। এনামেলের পাত্রে মধু সিদ্ধ করে তাতে আপেল (খোসা ছাড়িয়ে, শাঁস কুরে ফেলে ফালি ফালি করে কাটা) ও আখরোট ছেড়ে দিন। এক ঘণ্টা ধরে মৃদু তাপে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর জ্যামের মত করে বোতলে ভরে রাখুন।

মধুর আচার

চিনির বদলে মধুতেও ফল সংরক্ষণ করে রাখা যায়। প্রচলিত পন্থায় ফল সংরক্ষণের জন্য ঠিকঠাক করে বয়মে মধু সিরাপের মধ্যে রেখে বয়মের মুখ সীলবদ্ধ করে রাখলেই হল।

নীচের সিরাপগুলো এজন্যে ব্যবহার করা চলে:

ক) কিলোগ্রাম মধু ও ১০০ গ্রাম দুধ একত্রে মিশিয়ে তার সাথে ডিমের সাদা অংশ (সান্দ্র অবস্থা পর্যন্ত ফেটানো) দিন। তারপর তা সিদ্ধ করে জলীয় অংশ উবে যেতে দিন। তারপর ফলের মধ্যে গরম সিরাপ ঢেলে দিন এবং চিনি দিয়ে সংরক্ষণের অনুরূপ পন্থায় বয়মে সংরক্ষণ করুন।

খ) ১ কিলোগ্রাম মধু ১ লিটার জলে মিশিয়ে ভালোকার সিদ্ধ করুন। তারপর ফলের উপর ঢেলে চিনিতে সংরক্ষণের অনুরূপ পন্থায় বয়মে সংরক্ষণ করুন।

গ) ফলকে বায়ুচাপে বোতলবন্ধ করার সময় আরও ঘন সিরাপ দরকার হয় (প্রতি কিলোগ্রাম মধুতে ৭০০ গ্রাম জল)।

•

মধুতে আইভা (quince)

আইভা ফল সাধারণতঃ কষালো হলেও মধু তাকে স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় করে তোলে। প্রতি কিলোগ্রাম আইভা ফলের জন্য দুই কিলোগ্রাম মধু নিয়ে এভাবে তৈরী করতে পারেন: আইভা ফলের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস কুরে বের করে ফালি করে কাটুন। একটা সসপ্যানে ঠান্ডা জলে তা ডুবিয়ে তারপর নরম না হওয়া পর্যন্ত তা সিদ্ধ করতে থাকুন। সিদ্ধ হয়ে গেলে তা তুলে নিয়ে রস নিংড়ে নিন। সংরক্ষণ পাত্রে মধু ঢেলে তাতে দেড় কাপ নিংড়ানো রস ঢেলে সিরাপ বানান। তারপর ফুটন্ত সিরাপের মধ্যে আইভাগুলো ছেড়ে দিন এবং আইভার টুকরোগুলো স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত মৃদু আগুনে ফুটাতে থাকুন।

মধু প্রসাধন

দেহত্বক বাইরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জীবদেহকে রক্ষা করে বলে সুস্থ ত্বকের যত্ন নেওয়া ও তা সংরক্ষণ করা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ত্বক ক্রমশঃ আর্দ্রতা শোষণ ও ধারণ ক্ষমতা হারাতে থাকে; তার মেদগ্রন্থির কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়; ফলে তা শুষ্ক ও কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। তবে নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে শারীরবৃত্তির প্রক্রিয়াকে মন্থর করে দিয়ে মুখমণ্ডলকে সজীব, কোমল ও মসৃণ করা এবং কুঞ্চিত ও খসখসে চেহারায় পেলবতা আনা সম্ভব।

ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা ও তার কোমলতা বাড়ানোর জন্য যে সব রোগনিবারক উপায় আছে তাতে মধুর স্থান উপরে। মধু যে উল্লেখযোগ্য প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে গণ্য হতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে এর সঞ্চার ক্ষমতা। কারণ, তা ত্বকের পেশীর স্তরে খাবার হিসেবে গ্লুকোজ পৌঁছে দেয়। আর্দ্রতাগ্রাহী গুণাগুণের জন্য তা ত্বক নিঃসৃত রস শুষে নেয়। আবার এর নিরোধক ও ব্যাকটেরিয়া বিনাশী বৈশিষ্ট্য জীবাণুনাশে ক্রিয়াশীল হয়ে ত্বককে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

প্রসাধনসামগ্রী হিসেবে মধু ঘরোয়াভাবে তৈরী মুখের ক্রিম, লোশন ও স্নানের উপকরণে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত বহু ক্রিমে মধু ও মোমের যে-কোনটি কিংবা দুটোই থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এ ধরনের যা-কিছু উৎপাদিত হয় সে-সবের মূল উপাদান সহ তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

মুখশ্রী প্রলেপ (face pack)

সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞরা নানা রকমের মুখশ্রী প্রলেপে মধু ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ত্বককে মোলায়েম ও মজবুত করার জন্যে খাঁটি মধু যুক্ত কিংবা সমপরিমাণ ডিমের কুসুম ও অম্লননীর সাথে মধু যুক্ত প্রলেপ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রলেপ ব্যবহার করার আগে ত্বকের বৈশিষ্ট্যের কথা (শুষ্ক, তৈলাক্ত, স্বাভাবিক) মনে রাখতে হবে এবং তা আগাগোড়া পরিস্কার করে নিতে হবে। তারপর লোমকূপ উন্মুক্ত করা, লসিকা রস ও রক্ত সঞ্চালন বাড়ানো এবং আর্দ্রতা গ্রহণে ত্বকের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দু-তিন মিনিট উষ্ণ সেঁক দেওয়া দরকার। সেঁক দেওয়া হলে তুলোর পাঁজ দিয়ে মুখশ্রী প্রলেপের পাতলা আস্তরণ দিন। ১৫-২০ মিনিট এভাবে রেখে উষ্ণ কিংবা কুসুম কসুম গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ত্বক ভাল করে মুছে নিয়ে তাতে একটু পাউডার বুলোন।

শুষ্ক ত্বকের জন্য মধু ও ময়দার নিম্নবর্ণিত প্রলেপটি যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে তাতে গরম সেঁক লাগান। তারপর মুখ উদ্ভিজ্জ তেল (জলপাই, বাদাম ইত্যাদি) মুখে মাখুন এবং কাঁচা তুলোর (cotton wool) পাতলা আস্তরণ দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলুন (চোখ ও নাকের জায়গা বাদ দিয়ে)। এবার তার উপরে তুলোর পেঁজা দিয়ে মুখশ্রী প্রলেপ লাগান এবং ২০ থেকে ২৫ মিনিট এভাবে থাকতে দিন। তারপর মুখ থেকে প্রলেপ লাগানো তুলো সরিয়ে ফেলুন এবং ত্বকের উপর তিন দফা গরম সেঁক দিন। কুসুম কুসুম গরম জলে (ঘরের তাপমাত্রা) মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মধু ও সুরাসার মুখশ্রী প্রলেপ (বহুল ব্যবহৃত মুখের মধুক্রিম এটাই): ১০০ গ্রাম মধু ও ২৫ গ্রাম সুরাসার (শল্যচিকিৎসার স্পিরিট)

সমপরিমাণ সিদ্ধ কিংবা পরিস্রুত জলে মেশানে। যদি মধু দানাদার হয় তবে সামান্য তাপ দিয়ে নিন। ব্যবহারের আগে ভালভাবে নেড়ে নিতে হবে। ২০ মিনিট লাগিয়ে রাখতে হবে।

মধু ও ময়দার মুখশ্রীপ্রলেপ (শুষ্ক ত্বকের জন্য): ৩০ গ্রাম গমের আটা, ৩০ গ্রাম জল ও ৫০ গ্রাম খাঁটি মধু মেশান। উপরে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী লাগান।

মধু ও গ্লিসারিনের মুখশ্রীপ্রলেপ: এক চা-চামচ মধু, সমপরিমাণ গ্লিসারিন ও একটি ডিমের কুসুম মিহি করে মেশান।

মধু ও জইগুড়োর মুখশ্রী প্রলেপ: একটি ডিমের কুসুম ফেটিয়ে তাতে এক চা-চামচ মধু ও এক টেবিল-চামচ জইগুঁড়ো দিয়ে মিহি করে মেশান।

মধু ও অম্লননীর মুখশ্রী প্রলেপ: সমপরিমাণ মধু, অম্লননী ও একটি ডিমের কুসুম মিহি করে মেশান।

মধুস্নান

আমরা দেখেছি যে, স্নানের জলে ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম মধু মিশিয়ে নিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর হিতকর প্রভাব পড়ে।

মধুজল

মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের ত্বকের অকাল অবনতি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে মধু জল বেশ উপকারী ও কার্যকর এবং তা তৈরী করাও খুব সহজ। মধু জল দিয়ে প্রতিদিন ত্বক পরিস্কার করলে তাতে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা, সজীবতা, ও কোমল-মসৃণ গঠন বজায় থাকে। মধু-জল তৈরী করতে হলে বড় গামলায় (তিন লিটার কিংবা বেশি ধারণক্ষম) এক লিটার উষ্ণ জলে উঁচুমানের দুই চামচ একপুষ্পক বা বহুপুষ্পক মধু মেশান। তাতে আরও দুই লিটার উষ্ণ জল মিশিয়ে তারপর তা দিয়ে ১০-১৫ মিনিট ধরে ঘাড় ও মুখমণ্ডল সাফ করুন। এবার পরিস্কার উষ্ণ জলে ত্বক ধুয়ে নিন।

মধু ও শশার লোশন

১০০ গ্রাম শশার রস   ৫০ গ্রাম স্পিরিট (e. a.)

১০০ গ্রাম উঁচু জাতের মধু

চমৎকার রোগ নিবারক গুণ যুক্ত এটি একটি আর্দ্রকর দ্রবণ। তৈরী করতে হলে ভদকার সঙ্গে (কিংবা ৪০ শতাংশ সুরাসার) শশার রস (টাটকা শশার) মেশান এবং এই মিশ্রণ বোতলে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় ঠাণ্ডা অন্ধকার জায়গায় আটদিন পরিপক্ব (infuse) হতে দিন। পরিপক্ব লিকার পরিশ্রুত করে তারপর মধুর সাথে (একপুষ্পক বা বহুপুষ্পক) মেশালে তা ব্যবহারের উপযোগী হবে।

কুসুম কুসুম গরম জলে (ঘরের তাপমাত্রা) মুখমণ্ডল ও ঘাড় ধুয়ে ফেলুন। এক টুকরো মসলিন কাপড় লোশনে ভিজিয়ে ত্বকে লাগান। দ্রুত তা ত্বকের ভেতরে প্রবেশ করবে। দিনে একবারমাত্র ব্যবহার্য। রাতে ঘুমানোর এক ঘণ্টা কি তারও আগে ব্যবহার করলে ভাল হয়।

মোমের প্রসাধন সামগ্রী

মোম (সচরাচর সাদা) অনেক রকম প্রসাধন প্রস্তুতের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ক্রিম, ঠোঁটপালিশ, মুখের ক্রিম ও লোশনের পুরু বনিয়াদ তৈরী করে। মোম খুব সহজেই দেহত্বকে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তা দেহত্বককে কমনীয়, পেলব ও শুভ্র করে তোলে।

কুঞ্চন নিরোধক ক্রীম

৩০ গ্রাম মোম   ৩০ গ্রাম মধু

৩০ গ্রাম পেঁয়াজের রস   ৩০ গ্রাম সাদা লিলি ফুলের রস

চীনামাটির হামানদিস্তায় উত্তপ্ত করে উপকরণগুলো মেশাতে থাকুন। মোম পুরো গলে যাওয়ার পর তা কাঠের চামচ দিয়ে নেড়ে পুরোপুরি ঠাণ্ডা করুন। ব্যবহারের আগে মুখমণ্ডল উষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। ক্রিমের

পুরু আস্তরণ মুখে লাগিয়ে ২৫-৩০ মিনিট রেখে দিন। বাড়তি ক্রিম টিস্যু কাগজ বা পরিস্কার লিনেন তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলুন। কিছুটা বিরতি দিয়ে মুখে হালকা করে পাউডার বুলোন।

কমালো মুখশ্রী প্রলেপ

১০ গ্রাম মোম — ১০ গ্রাম পীচ তেল

১০ গ্রাম ল্যানোলিন — ৫০ গ্রাম ভ্যাসেলিন

০·৫ গ্রাম জিঙ্ক-সালফেট — ১ গ্রাম বিসমাথ নাইট্রেট

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ক্রীম

৫ গ্রাম মোম — ৫ গ্রাম অ্যামোনিয়া জল

পুষ্টিকর ক্রীম

৩ গ্রাম মোম — ৬ গ্রাম স্পার্ম-তিমির মাথার চর্বি

৪ গ্রাম গ্লিসারিন — ২৪ গ্রাম পীচ তেল

পুষ্টিকর মুখশ্রী প্রলেপ

৫০ গ্রাম মোম — ৭০ গ্রাম মধু

একটি সাদা লিলির কন্দের রস

পীচ ক্রীম

৬ গ্রাম মোম — ০·৫ গ্রাম বোরাক্স

১৬ গ্রাম পানি — ২৭·৫ গ্রাম পীচ তেল

বাণিজ্যিক প্রসাধনী

সোভিয়েত প্রসাধন শিল্প কারখানায় তৈরী কিছু কিছু ক্রীমে মোম

ও মধুর দুটোই কিংবা একটি এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় সক্রিয় পদার্থ থাকে। এগুলোর মূল উপাদান নীচে দেওয়া হল।

বিওক্রেম (স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, পীচ তেল, স্পার্ম-তিমির মাথার মোম, ল্যানোলিন এবং ক্যামমাইল, লাইমফুল, বোতল-ব্রাশ, চোলাই রস ও শুভ্র দ্রাবক।

বিশেষ ধরনের বিওক্রেম (স্বাভাবিক ও শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, ল্যানোলিন, স্পার্ম-মোম, বাদাম তেল, পেনথল এবং ক্যামমাইল, লেবুফুল ও বোতল-ব্রাস-এর চোলাই রস এবং সুগন্ধি (perfume)।

ক্যামমাইল (পাগ্না) **ক্রীম** (দহন প্রতিরোধে): মোম, ল্যানোলিন, স্পার্ম-মোম, বাদাম তেল, ভেষজ ক্যামমাইল-এর জলীয় চোলাই রস ও শুভ্র দ্রাবক।

ইজুম্রুদ (হীরা) **ক্রীম** (শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ চর্বি, পেনথল, জল।

লাক্স ক্রীম: বাদাম তেল, মোম, স্পার্ম-মোম।

মিদোভী (মধু) **ক্রীম**: উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন সুরাসার, ল্যানোলিন, জল।

মিনদালনীয় (বাদাম) **ক্রীম** (শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, ল্যানোলিন, স্পার্ম-মোম, বাদাম তেল, জল।

নেকতার (সুধা) **ক্রীম** (সবরকম ত্বকের জন্য): রাজকীয় জেলী যুক্ত।

নিকোলায়েভ্স্কি ক্রীম (শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, স্পার্ম-মোম, ল্যানোলিন, বাদাম তেল ও শুভ্র দ্রাবক।

আগ্নি মস্কাভি ক্রীম (শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, ল্যানোলিন, স্পার্ম-মোম, নারকেল তেল, সুগন্ধি তেল, কোলেস্টেরল (পিত্তমেদ), পানি ও শুভ্র দ্রাবক।

স্পেরমাসেতোভি (স্পার্ম-মোম) **ক্রীম** (শুষ্ক ত্বকের জন্য): মোম, ল্যানোলিন, স্পার্ম-মোম, নারকেল তেল, সুগন্ধি তেল, জল।

তেত্রাবিতা ক্রীম: মোম, ল্যানোলিন, বাদাম তেল, কোকো, মাখন, উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন সুরাসার, জল।

ভিসনা (বসন্ত) **ক্রীম**: মোম, ল্যানোলিন, স্পার্ম-মোম, ভ্যাসেলিন।

সপ্তম অধ্যায়

মৌমাছির বিষের আরোগ্যকর গুণাগুণ

> সবই বিষ, নির্বিষ কোন কিছুই নেই। আবার সবই ওষুধ। একটা মাত্রাই কোন কিছুকে হয় বিষ না হয় ওষুধ করে তোলে।
>
> — প্যারাসেলসাস

আধুনিক চিকিৎসাকর্মে দেশী ভেষজবিদ্যা থেকে যে-সব ফলপ্রদ ওষুধ এসেছে তার মধ্যে মৌবিষ বা এপিটক্সিন-এর স্থান গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিদানিক ব্যবহারের উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় সঙ্গতভাবেই মৌবিষ আরোগ্যকর বিষ হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাজ্ঞ পরিষদ ১৯৫৭ সালে কোন কোন অসুখের চিকিৎসায় মৌমাছির হুলের মাধ্যমে এই বিষের ব্যবহারবিধি সাময়িকভাবে অনুমোদন করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মৌবিষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রগতি সাধন করেছেন তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শতাধিক বছর আগে ১৮৬৪ সালে সেণ্টপিটার্সবুর্গ বনবিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ম. ই. লুকোমস্কি একটি রচনা প্রকাশ করেন। মৌবিষকে মূল্যবান প্রতিকারক হিসেবে দেখিয়ে তিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আবেদন জানান। সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ই. ভ. লিউবারস্কি বিশ বছর ধরে এমন সব রোগীকে হুল ফুটিয়ে মৌবিষ প্রয়োগ করেছিলেন যাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ওষুধ কোন কাজ দেয় নি এবং তাতে তিনি খুব ভাল ফল পান। ১৮৯৭ সালে কাজানস্কিই টেলিগ্রাফ পত্রিকায় রোগের প্রতিকারক হিসেবে 'মৌমাছির বিষ' নামে তাঁর দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়। এতে

মৌমাছির হুল বিধিয়ে বাত রোগের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় যে নামটির কথা বলতে হয় তা হচ্ছে বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য ম. ব. ক্রোল। মৌবিষের পরীক্ষামূলক মিশ্রণ তাঁর উদ্যোগেই প্রস্তুত হয় এবং তা ১৯৩৬-৩৭ সালে স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্যে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োগ করে সাফল্যজনক ফলাফল পাওয়া যায়। আমাদের অনেক বছরের পর্যবেক্ষণ ও মৌমাছি পালকদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নতালিকার উপাত্ত থেকে দেখা যায় কোন কোন রোগের চিকিৎসায় মৌমাছির বিষ যেমন ফলপ্রদ তেমনি রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন।

তবে এটাও এখানে আমরা উল্লেখ করতে বাধ্য যে, মৌমাছির বিষের ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগের ফলে অপ্রতিকার্য ক্ষতি হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে মৌবিষ চিকিৎসায় যোগ্যতার অভাব রয়েছে এমন লেখকদের অনেক লেখা ও মন্তব্য সাম্প্রতিক কালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তারা মৌমাছির বিষকে সর্বরোগহর হিসেবে দেখেছেন। যথাযথ তত্ত্বীয় ভিত্তি ছাড়াই এবং নিদানিক ও অভীক্ষামূলক প্রয়োগের মাধ্যমে ধারণার সারবত্তা পরীক্ষার তোয়াক্কা না করেই তারা বন্ধ অক্ষিপুটের উপর, হৃৎপিণ্ডের আশেপাশে, ঠোঁটের উপর এবং এ ধরনের নানা জায়গায় মৌমাছির হুল ফুটানোর কথা বলেছেন। এ ধরনের 'সুপারিশ' এবং একই সহকালে এক শ' পর্যন্ত হুল প্রয়োগের ব্যাপারটা শুধু বিপজ্জনক নয় তা মারাত্মকও হতে পারে।

শুধুমাত্র যোগ্য ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণাধীনেই মৌবিষ চিকিৎসা চালানো যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা চালাতে হবে রোগ প্রতিকার ও রোগ প্রতিরোধের জটিল চিকিৎসা পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে (যেমন, ভৌত চিকিৎসা, খাদ্য-পুষ্টি চিকিৎসা, ভেষজ চিকিৎসা ইত্যাদি)।

মৌবিষের গঠন-উপাদান ও গুণাগুণ

মৌবিষ দেখতে স্বচ্ছ; তার তীক্ষ্ন গন্ধে মধুর গন্ধের আভাস থাকে। স্বাদের দিক থেকে তা তিক্ত ও জ্বালাকর। মৌবিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·১৩১৩। লিটমাস কাগজ দিলে তা এসিডের অনুরূপ বিক্রিয়া করে। মৌবিষে যে ফরমিক, হাইড্রোক্লোরিক ও অর্থোফসফোরিক এসিড এবং হিস্টামিন, টিপট্রোফেন, সালফার ও অন্যান্য পদার্থ আছে তা প্রমাণিত হয়েছে। মৌবিষে তার ওজনের ০·৪ শতাংশ পরিমাণ

ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট Mg_3 $(Po_4)_2$ থাকে। এই উপাদানের রোগ প্রতিকারক ক্ষমতা মহামূল্যবান বলে ধারণা করা হয়। মৌবিষে তামা ও ক্যালসিয়ামের ঈষৎ উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও মৌবিষে প্রচুর আমিষ, উদ্বায়ী তেল এবং হায়ালুরোনিডেজ ও ফসফোলিপেজ জ্বালাকর অনুভূতি ও যন্ত্রণার কারণ বলে মনে করেন।

কোন কোন গবেষক মৌবিষের উদ্বায়ী তেলকে মৌমাছির হুলের জ্বালাকর অনুভূতি ও যন্ত্রণার কারণ বলে মনে করেন।

মৌমাছির বিষ দ্রুত শুকিয়ে যায়। এমন কি সাধারণ তাপমাত্রায় তা ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ ওজন হারায়। শুষ্ক মৌবিষ দেখতে আরবী গামের মত স্বচ্ছ বস্তু। তা পানি কিংবা এসিডে দেওয়া মাত্রই দ্রবীভূত হয়। কস্টিক ক্ষারীয় দ্রবণ কিংবা সালফিউরিক এসিডের সাহায্যে মৌমাছির বিষ ২৪ ঘণ্টা পরেও বিশ্লিষ্ট করা যায় না। তবে হাইড্রোক্লোরিক এসিড কিংবা কস্টিকি ক্ষারের সাথে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করলেই তার গুণের পরিবর্তন ঘটে। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও অন্যান্য জারকের সাথে বিক্রিয়ায় তার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। মৌবিষ খুবই তাপরোধক; শুকনো অবস্থায় ১০০° সে. তাপমাত্রায় দশ দিন যাবৎ উত্তপ্ত করলেও তার গুণের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। হিমায়নের ফলেও তার বিষাক্ত গুণের কোন পরিবর্তন হয় না। শুষ্ক অবস্থায় রেখে দেওয়া হলে মৌবিষের বিষক্ষমতা কয়েক বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। মৌমাছির বিষের রাসায়নিক গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা যায়নি বলে এর কোন সিনথেটিক বা সংশ্লেষী বিকল্প এখনও তৈরী হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসাবিজ্ঞান একাডেমীর ম্যালেরিয়া ও ভেষজ পরজীবীবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের একটি পরীক্ষাগারের প্রধান অধ্যাপক জ. ফ. গাউজ মনে করেন, জ্ঞাত এন্টি বায়োটিক পদার্থগুলোর মধ্যে মৌমাছির বিষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ এন্টিবায়োটিক। তিনি লিখেছেন, 'তৃতীয় বর্গের এন্টিবায়োটিক পদার্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নাইট্রোজেন ও সালফার সমৃদ্ধ পদার্থ, প্রধানতঃ মৌমাছি ও সাপের বিষ... ছত্রাক Gliocladium গঠিত এক রকম ব্যাকটেরিয়া বিনাশী পদার্থ তথা গ্লিওটক্সিন-এর গঠন-উপাদানও ঠিক অনুরূপ... এক মিলিগ্রাম গ্লিওটক্সিনের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ কোন জীবাণু পরিপোষক

মাধ্যমে রাখা হলে তা গ্রাম-পজিটিভ অণুজীবের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। আমাদের জানা সবচেয়ে শক্তিশালী এন্টিবায়োটিকগুলির মধ্যেই গ্রিওটক্সিন, মৌবিষ ও সর্পবিষের স্থান'।[35]

সোভিয়েত গবেষক কামারভ ও এরস্তেইন[36], বালান্দিন[37] ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে, মৌমাছি বিষের জলীয় দ্রবণ নির্বীজিত (অর্থাৎ তাতে অণুজীব থাকে না), এনমকি ১:৫০ ০০০ দ্রবণমাত্রাতেও। ১:৫০০ ০০০ ও ১:৬০০ ০০০ দ্রবণশক্তিতে তা Paramoecium-এর বংশবৃদ্ধিকে উজ্জীবিত করে। তাই 'কুপ' সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জাত এন্টিবায়োটিকের তুলনায় মৌমাছির বিষ কোন অংশেই কম মনযোগ দাবী করে না।

মৌবিষের ক্রিয়াপদ্ধতি

বহু শতাব্দীর পর্যবেক্ষণ ও সাম্প্রতিক গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে এটা সঙ্গতভাবেই মেনে নিতে হয় যে, স্নায়ুতন্ত্রের উপর মৌবিষের নির্বাচিত ক্রিয়াপ্রসূতা রয়েছে।

বিষের ক্রিয়াফল সম্পর্কে ক্লিওপেট্রার খুবই কৌতূহল ছিল। যন্ত্রণাহীন বিষ খুঁজতে গিয়ে তিনি সমস্ত জাতের বিষাক্ত পদার্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের উপর। সবচেয়ে কম যন্ত্রণাকর প্রমাণিত হয়েছিল বোলতার বিষ (মৌবিষ পরীক্ষা করে দেখা হয় নি, কারণ মৌমাছিকে পবিত্র বলে গণ্য করা হত)। একজনকে বোলতার বিষের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেল যে, সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। তার সারা মুখমণ্ডল গুটি গুটি ঘামে ভরে গেল আর সে দ্রুত যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। লোকটাকে ঐ অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলে দেখা যেত, গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত অভিব্যক্তি করেই সে তাতে বাদ সাধছে।

জার্মান প্রকৃতিবিদ কার্ল ক্রেপেলিন লিখেছেন, 'বেলে বোলতারা (Sand wasp) নিষ্ঠুর একরকম কায়দায় তাদের শিকারের উপর হামলা চালায়। ছোট প্রজাপতিদের গুটিপোকার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের স্নায়ুগ্রন্থিতে তারা বিষ ঢুকিয়ে দেয়, ফলে গুটিপোকাগুলো অসাড় হয়ে পড়ে। বোলতারা একাকী বা দলবদ্ধভাবে নিঃসাড় গুটিপোকাকে টেনে

হিঁচড়ে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে শাবকদের হাতে তুলে দেয়। বর্ধিষ্ণু শূককীটগুলো এই সব গুটি পোকা খেয়ে বাঁচে আর এক সময় এদের জীবন্ত খেয়ে ফেলতে সক্ষম হয়ে ওঠে।'[38]

বোলতার বিষের ক্রিয়ার সাথে মৌবিষের ক্রিয়ার সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জার্মান গবেষণাকর্মী নিউমান ও হুবারমান[39] ১৯৫৪ সালে একটি চিত্তাকর্ষক লেখা প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা দেখান যে, মেলিটিন (mellitin) — মৌমাছির বিষ থেকে নিষ্কাশিত আমিষ — রক্তচাপ ও লোহিতকণা নাশ (হেমোলাইসিস) কমিয়ে দেয়, রেখাঙ্কিত ও মসৃণ পেশীর কুঞ্চন হ্রাস করে এবং স্নায়ুপেশী ও স্নায়ুসন্ধি অবরোধ করে। তাঁদের দেওয়া উপাত্ত থেকে দেখা যায়, মৌবিষ থেকে পৃথক করে নেওয়া হায়ালিউরোনাইডেজ (Hyaluronidase) এনজাইম কৈশিক সঞ্চারক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রক্তনালীর সঞ্চারক্ষমতার অবস্থার দিকটা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বয়োবৃদ্ধি বা অসুস্থতার কারণে জীবদেহে রক্তসংবহনতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত ঘটলে সঞ্চারক্ষমতা কমে যায়। ফলে অঙ্গ ও কোষকলার মধ্যেকার আদান-প্রদানগত অবস্থার অবনতি ঘটে। এটা এখন প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সংযোজক কোষকলা ও কৈশিকায় অবস্থিত ভিত্তিমূল পদার্থের সঞ্চারক্ষমতা তাৎপর্যজনক মাত্রায় এনজাইমতন্ত্রের অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং তা তার অঙ্গ উপাদান হায়ালিউরোনিক এসিডকে ধ্বংস করে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাত্রায় যুক্ত হলেও হায়ালিউরোনিডেজ যুক্ত মিশ্রণ (মৌমাছির বিষ, হিরুডিন, রোনিডেজ, শুক্রাশয় নির্যাস, স্পার্মাইন ইত্যাদি) ঐ সব ভিত্তিমূল পদার্থের সঞ্চারক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায়। ফরাসী গবেষক ই. এ. গোর্তে ও জি. ডেরি ১৯৫৮ সালে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে, স্ট্যাফিলোকক্কাস α — অধিবিষ (toxin) ও টিটেনাস অধিবিষের উপর মৌবিষের বৈরিতামূলক ক্রিয়াফল দেখা যায় এবং মৌবিষের মধ্যেকার ফসফোলাইপেজ-A উপাদানের অস্তিত্ব এই সত্যকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে।

বহু বছরের পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, মৌমাছির হুল কিংবা মৌবিষের ইনজেকশন মৌবিষের বিরুদ্ধে শুধু নয়, আরও কিছু সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।[40]

নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা হলে মৌবিষ কেবল বিশেষ অঙ্গে বা বিশেষ রোগে ক্রিয়াশীল নয়, উপরন্তু তা রোগ প্রতিকারক ও রোগ প্রতিরোধী হিসেবে সামগ্রিকভাবে জীবদেহে কার্যকর হয়। মৌবিষ শরীরে প্রবেশ করলে তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সার্বিক প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সংহত করে থাকে। মৌউদ্যানে দীর্ঘকাল কর্মরত মৌপালকদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন সেটাই প্রমাণ করে। মৌবিষ নানা ধরনের রোগের বিরুদ্ধে শরীরে অনাক্রম্যতাও (immunity) গড়ে তোলে। মৌবিষ অনুবিদ্ধ করে পরীক্ষাগারে ও গৃহে পালিত যে-সব প্রাণিদেহে কৃত্রিম অনাক্রম্যতাকরণ সম্ভব হয়েছে সে-সব প্রাণীর রক্তমস্তুর (sero) রোগবারক ক্ষমতা সমীক্ষা করার সময় এসে গেছে। এই পদক্ষেপের ফলে নিঃসন্দেহে ফলপ্রসূ জীবজ ওষুধের ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে।

মৌবিষের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা

হুল ফুটিয়ে মৌমাছি একবিন্দু বিষ ত্বকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এই বিষটুকুতে রোগ প্রতিকারক গুণাগুণ রয়েছে। এর চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি মাত্রায় হলেই তখন তা পূর্ণ বিষাক্ত হবে। মৌবিষের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতায়ও তারতম্য দেখা যায়। মহিলা ও শিশুরা এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সংবেদনশীল। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্যবান লোক অনায়াসে এক থেকে পাঁচটি এমন কি দশটি পর্যন্ত হুল সহ্য করতে পারে। মৌমাছির হুল স্থানিক প্রতিক্রিয়াই শুধু ঘটায় (ত্বক রক্তিম হওয়া, ফুলে যাওয়া, জ্বালা-পোড়া করা ইত্যাদি)। তবে ২০০-৩০০ হুল যুগপৎ ফুটলে তা জীবদেহকে বিষাক্ত করে ফেলে এবং হৃদরক্তসংবহন ও স্নায়ুতন্ত্রে ব্যাঘাতের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ (শ্বাসকষ্ট, দেহের নীলায়ন, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, স্নায়বিক আক্ষেপ বা খিঁচুনী, পক্ষাঘাত) দেখা যায়। ৫০০ কিংবা তারও বেশি হুল বিঁধলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্বাসকেন্দ্রের পক্ষাঘাতের কারণে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। তবে মৌমাছির বিষের প্রতি অস্বাভাবিক সংবেদনশীল লোকও দেখা যায়। একটামাত্র হুলেই তাদের সাধারণ অসুস্থতা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, বিছুটি লাগার মত চুলকানি, বমি ও উদরাময় হতে পারে।

অধিকাংশ লোকের দেহই মৌমাছির হুলে অভ্যস্ত হয়ে যায়, কখনো কখনো প্রতিক্রিয়া হয়তো হয় তবে তা খুবই সামান্য। অসংখ্য পর্যবেক্ষণ

থেকে দেখা গেছে যে, দীর্ঘদিন যাবৎ যাঁরা মৌমাছিদের নিয়ে কাজ করেন তাদের দেহে হুল সহ্য করার ক্ষমতা জন্মায় এবং হুলে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। দীর্ঘদিন মৌমাছিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন এমন কিছু মৌমাছি পালকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, হাজারো মৌমাছির হুল ফুটলেও বিষ ক্রিয়ার কোন লক্ষণ তাদের শরীরে দেখা যায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের মৌশালাগুলোতে বিলি করা প্রশ্নতালিকার উপাত্তে দেখা যায় যে, কাজে যোগদানের এক বছরের মধ্যে ২৮·২ শতাংশ, দুই বছরের মধ্যে ৩৪·৬ শতাংশ, তিন বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ মৌমাছিপালক মৌবিষের ক্ষেত্রে অনাক্রম্যতা অর্জন করেছেন; যারা আদৌ আনাক্রম্যতা অর্জন করতে পারেন নি তাদের সংখ্যা খুবই সামান্য (৫·৭ শতাংশ); কিছু লোকের ক্ষেত্রে (৪·২ শতাংশ) অনাক্রম্যতা জন্মগত।

যে-সব মৌমাছিপালক দীর্ঘদিন যাবৎ মৌমাছিদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে মৌমাছির হুল বিদ্ধ হয়েছেন তাদের দেহের রক্তে মৌবিষকে প্রতিহত করার মত সুনির্দিষ্ট রক্তরক্ষী (antibody) গড়ে ওঠে, তা পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। মৌমাছিপালকদের কাছ থেকে নেওয়া সীরামের অভীক্ষা ছিল এই রকম: ০·২ মিলিলিটার রক্তমস্তুর ১:১০০ ও ১:৪০০ অনুপাতের তরল দ্রবণে সমপরিমাণে মৌমাছির বিষ মেশানো হয় এবং তা খরগোশের ত্বকে ইনজেকশন করা হয়। কখনো মৌমাছির হুল ফোটেনি এমন একজনের দেহের রক্ত ও মৌমাছির বিষের মিশ্রণ একটি নিয়ন্ত্রণ-প্রাণীর দেহে একই ভাবে ঢুকানো হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, মৌমাছি পালকের শরীর থেকে নেওয়া রক্তমস্তু মৌবিষের ক্রিয়াকে প্রতিহত করেছে। পক্ষান্তরে সাধারণ রক্তমস্তুতে সেই গুণ অনুপস্থিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঘন ঘন হুল ফোটানোর ফলে মৌমাছিপালকদের দেহে সুনির্দিষ্ট রক্তরক্ষী গড়ে ওঠে এবং ফলে স্থানিক ও সাধারণ দেহরসগত অনাক্রম্যতা বিকশিত হয়। কোন কোন লেখক মনে করেন যে, মৌমাছির হুলে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তির দেহের লালা প্রতিবিষ (antitoxin) তথা মৌবিষের বিষঘ্নের (antidote) কাজ করে।

প্রায় দেখা গেছে হুল ফুটলে মৌমাছি পালকের পরিবারের সবার একই রকম প্রতিক্রিয়া হয় না। অথচ জন্মগত অনাক্রম্যতার কোন ঘটনার

উল্লেখও কোন লেখায় আমরা দেখি নি। এই প্রসঙ্গে এখানে আমরা জন্মগত বা অর্জিত অনাক্রম্যতা সম্পর্কিত কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

১৯৪৭ সালে নিজের এক বছর বয়সী ছেলেকে এক ঝাঁক মৌমাছি (কমপক্ষে ৩০০) কীভাবে আক্রমণ করেছিল, একটি চিঠিতে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন মৌমাছিপালক ই. প্র. পোজেদ্‌নিয়াকভ (কুস্কর্ অঞ্চলের সোপ্রন গ্রামের)। শিশুটির মুখমণ্ডল ও সারা শরীর ফুলে গিয়েছিল। সবাই ভয় পেয়েছিল যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিশুটি মারা যাবে। কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই শিশুটির শারীরিক স্ফীতি একেবারে মিলিয়ে গেল। ষষ্ঠ দিনে দেখা গেল, শিশুটি আবার পুরোপুরি ভাল হয়ে উঠেছে। পরে জানা গেল যে, মৌমাছি পালকের স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় মৌমাছি হুল ফুটিয়েছিল। এ থেকে এই ধারণা করা যায় যে, শিশুটি মৌবিষের ক্ষেত্রে অনাক্রম্যতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। তাই অসংখ্য হুল ফোটা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠেছিল। মৌমাছিপালক পিতা আরও লক্ষ্য করেছেন যে, পরবর্তী বছরগুলোতে শিশুটির অন্যান্য সমবয়সীরা হাম, স্কারলেট বা জ্বরে খুব কমই অসুস্থ হয়েছিল।

মৌমাছিপালক ও. ম. লামোনভা আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর এক বন্ধুর যখন হাম হয় তখন তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার নিজের সাত বছরের কন্যার হাম হয়নি। এর কারণ, প্রায়ই সে মৌমাছির হুলবিদ্ধ হয়েছে। মৌমাছির হুল বিদ্ধ কিংবা মৌবিষের ইনজেকশন প্রাপ্ত প্রাণী ও মানুষের শরীরের রক্তে প্রতিবিষ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কোন কোন লেখকের বিশ্বাস, মৌবিষের যথার্থ অনাক্রম্যতা আসলে নেই। উদাহরণ হিসেবে তারা এই সত্যের উল্লেখ করেন যে, মৌমাছিদের সংস্পর্শে না থাকলে অনেক মৌমাছিপালক শীতকালে তাদের অর্জিত অনাক্রম্যতা হারান। মৌবিষের অনাক্রম্যতার যে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের সাথে মৌমাছির বহু শতাব্দী ব্যাপী সান্নিধ্যের মাধ্যমে সঞ্চিত তথ্য প্রমাণ করেছে যে, অনাক্রম্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মৌমাছির হুল বিদ্ধ হওয়াটা স্বাস্থ্যবান লোকের জন্যেও খুব ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে মৌবিষের প্রতি অতিসংবেদনশীল হলে এরকম

হয়। সর্বসম্মতভাবে খুব কদাচিৎ নথিবদ্ধ হলেও একটিমাত্র মৌমাছির হুল রীতিমত স্বাস্থ্যবান লোকের মৃত্যুর স্বতন্ত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। এখানে আরও আমরা বলতে বাধ্য যে, মৌমাছির বিষের অণুবৎ বিন্দু কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন স্বাস্থ্যবান লোকের মৃত্যু ডেকে আনে যা ময়নাতদন্তেও সব সময় সুস্পষ্ট হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য অধ্যাপক ই. ন. পাভলোভস্কির বিশ্বাস, মৌবিষের প্রতি এলার্জি এবং হুল ফোটানোর বিশেষ স্থানের কারণেই এ রকম ঘটে থাকে।[41] স্পষ্টতঃ, হুল সরাসরি রক্তনালীতে ঢুকে গেলে তৎক্ষণাৎ বিষ রক্তপ্রবাহের সাথে মিশে যেতে শুরু করে। ফলে, সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া খুবই দ্রুত পরিলক্ষিত হয় (কয়েক মিনিটের মধ্যে)।

মৌমাছির হুলের প্রতিষেধক হিসেবে নানা পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে, তা থেকে বোঝা যায়, আরও নির্ভরযোগ্য পন্থা খুঁজে বের করার এখনও বাকী রয়েছে। 'মুক্ত আর্থনীতিক সমাজের সাপ্তাহিক বার্তা' নামে একটি রুশী সাময়িক পত্রিকা ১৭৮৮ সালে 'মৌমাছির হুলের প্রতিরোধে' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশ করে। তাতে লেখা হয়, 'মৌমাছির হুল নিরাময়ের সাধারণ উপায় খোঁজ করাটা একেবারে নিরর্থক, মৌমাছি বিষয়ক বইতে খুঁজেও কোন লাভ নেই। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস যদি এই রকম থেকে যায় তবে কি ভিনিগার, কি খাঁটি ঠাণ্ডা মাটি, কি প্রস্রাব, কি পার্সলি শাক, কি মৌমাছি বাটা, কি কাঁকড়া বিছার তেল, কি এই ধরনের টোটকা দাওয়াই — যাই লাগানো হোক কিছুতেই ফোলা কমবে না।'

এর একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রতিকার হচ্ছে বিষথলি সহ হুল টেনে বের করা। যত বেশিক্ষণ হুল ত্বকের মধ্যে থাকে তত বেশি পরিমাণ বিষ রক্তে মিশে যায়। কাউকে হুল ফোটানোর পর প্রবৃত্তিবশতঃ মৌমাছি উড়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু হুলের সুঁচালো খাঁজ ত্বকের ভেতরে দৃঢ়ভাবে ধরা থাকে। ফলে বিষগ্রন্থি, বিষ থলি এবং উদরীয় স্নায়ু সংযোগ সূত্র সহ হুল ফোটানোর অঙ্গ ছিঁড়ে যায়। হুল ফোটানোর অঙ্গ মৌমাছির শরীরের বাইরে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুবিস্তার ও সংকোচন নিশ্চিত করে বলে বিষ রক্তে নিরন্তর ঢুকে পড়ে। মৌমাছি পালকরা যে ত্বক

থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হুল টেনে তোলার পরামর্শ দেন তা এদিক থেকে পুরোপুরি নির্ভুল। তবে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ আঙ্গুল দিয়ে হুল টেনে তুলতে চেষ্টা করেন বলে আঙ্গুলের চাপে হুল ফোটানোর অঙ্গ থেকে সমস্ত মজুত বিষ ত্বকের মধ্যে চলে যায়। বিশেষ ধরনের চিমটা ব্যবহার করে দ্রুত আলতোভাবে ও সাবধানে বিষথলি থেকে সামান্যতম বিষও না খুইয়ে হুল অপসারণ করা সম্ভব। হুল বের করে নেওয়ার পর নিরাময় হিসেবে ক্ষতে ক্যালেনডুলা, সার্জিক্যাল স্পিরিট, ও ভ্যাসেলিন বা ল্যানোলিনযুক্ত ক্রীমের প্রলেপ লাগাতে হবে। ক্যালেনডুলা ও স্পিরিটের সমন্বয় যন্ত্রণা ও জ্বালাকর অনুভূতি দ্রুত দূর করে এবং তা মৌবিষের মধ্যেকার হিস্টামিন ও অন্যান্য সক্রিয় উপাদানের কার্যকারিতা বাহ্যত প্রশমিত করে।

মৌবিষের বিষক্রিয়া ঘটলে এক গ্লাস মধু-ভিটামিন-এলকোহল মিশ্রণ (৫০-১০০ গ্রাম মধু, ২০০ গ্রাম ভদ্‌কা, ১ গ্রাম এসকরবিক এসিড ও ১ লিটার সিদ্ধ পানি) তিন বা চার ঘণ্টা অন্তর পান করা বাঞ্ছনীয়। সব ধরনের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও অন্যান্য অঙ্গের উপর মধু হিতকর ও উদ্দীপক প্রভাব ফেলে। পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা দেখেছি যে, মৌবিষের প্রতিরোধে এলকোহলের সুনির্দিষ্ট প্রতিবিষ গুণ রয়েছে। এই কারণে এপিটক্সিন থেরাপী বা মৌবিষ দিয়ে চিকিৎসার সময় রোগীর জন্য এলকোহল পান নিষেধ। মৌবিষ আকস্মিক ও তীব্রভাবে অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিতে এসকরবিক এসিডের স্তর কমিয়ে দেয় বলে এই ভিটামিনটিও খুব প্রয়োজনীয়। এসকরবিক এসিড হিস্টামিনের ক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে বলে এলার্জি-লক্ষণ দেখে অধিকতর মাত্রায় ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়াও তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়, জীবাণুজাত বিষ প্রতিরোধ করে এবং প্রতিবিষ গঠনে লিপ্ত হয়। তা এনজাইমগত প্রক্রিয়া এবং অ্যাড্রেনালিন ও কোলিন-এর মত পদার্থের ক্রিয়াকে সংহত করে। তীব্র বিষক্রিয়ায় হৃদরক্তসংবহন ও স্নায়ুতন্ত্র গুরুতরভাবে আক্রান্ত হলে রোগীকে সাথে সাথেই হাসপাতালে নেওয়া উচিত। ভুল এপিটক্সিন থেরাপীতে কিংবা মৌমাছির হুল বিদ্ধ হওয়ার পর এলার্জির লক্ষণ দেখা গেলে কোন কোন লেখক অ্যাড্রিনালিন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ব্রোমাইড ইত্যাদি প্রয়োগের পরামর্শ দেন। তবে অবশ্যই তা কোন চিকিৎসককে দিয়েই করাতে হবে। এবং প্রতিটি

রোগীর ক্ষেত্রে বিষের প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র ধরনের বলে চিকিৎসককে অবশ্যই কঠোরভাবে স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হতে হবে। রোগীর ক্ষেত্রে এপিটক্সিন চিকিৎসা বা থেরাপী প্রয়োগ সম্ভব কিনা তা প্রথম (পরীক্ষামূলক) হুল থেকে পুরোপুরি বোঝা যায়। সেই কারণে এই চিকিৎসায় এলার্জি জাতীয় জটিলতা নিশ্চিতভাবে পরিহার করা সম্ভব।

এপিটক্সিন চিকিৎসা প্রয়োগে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মৌবিষ সংবেদী স্নায়ুর পরিবাহিতায় বাধা দেয় এবং এভাবে তা শুধু যে স্নায়ুশূল ও বাতবেদনা কমায় তা নয়, এসব রোগ প্রতিরোধও করে। তা ছাড়া তা সূক্ষ্ম রক্তনালীকে প্রশস্ত ক'রে তা কোষকলায় রক্ত সংবহনকে উন্নত করে। এপিটক্সিন বা মৌবিষ এ ছাড়াও নতুন রক্তকোষ গঠনকে উদ্দীপ্ত করে; ৭০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ ০০০ থেকে ৫০০ ০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে; ৬৫ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া রক্তে কোলেস্টেরল বা পিত্তমেদের স্তরেরও অবনমন ঘটে।

মৌবিষের সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা

বাতরোগ: ১৮৮৮ সালে ভিয়েনীয় রোগপরীক্ষক (clinician) এফ. টার্শ মৌমাছির হুল বিদ্ধ করে ১৭৩ জন রোগীর বাতরোগ সারানোর বর্ণনা দিয়েছেন।[42] তিনি নিজেই বাতের রোগী ছিলেন এবং ঘটনাক্রমে মৌমাছির হুল ফোটায় সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। আর তাই পরবর্তীতে তিনি মৌমাছি ও তার বিষের উপশম-গুণ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তা বাতের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে রুশী সামরিক চিকিৎসক ই. ভ. লিউবার্স্কি, যাঁর সম্পর্কে আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, মৌমাছির বিষ বাতরোগের একটি মহৌষধ। ১৯১২ সালে টার্শ তনয় রুডল্ফ মৌমাছির হুলের সাহায্যে ৬৬০ জন বাতরোগীর চিকিৎসার বিবরণ দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[43)] এদের মধ্যে ৫৫৪ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছিল, ৮৯ জনের অবস্থার উন্নতি হয় আর শুধুমাত্র ১৭ জনের অবস্থা অপরিবর্তিত

ছিল। লেখক শেষোক্ত রোগীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন: চূড়ান্ত রকমের অবহেলিত বাতরোগী ও চিকিৎসা সম্পূর্ণ করে নাই এমন বাতরোগী।

নিদানিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মৌবিষ জটিল হৃদপ্রদাহ বাত বা সোকল্স্কি-বইলউ (Sokolsky-Bouillaud) রোগে একটি কার্যকর ওষুধ। রোগীরা অনায়াসেই মৌমাছির হুল প্রয়োগের চিকিৎসা সহ্য করতে পারে। সিফিলিস, গনোরিয়া বা যক্ষ্মার ফলে সৃষ্ট সংক্রামক সন্ধিবাতের চিকিৎসায় মৌবিষ ইনজেকশন দিলে স্থানিক ও সার্বিক জোরালো প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষকরা তাই বাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্যে মৌমাছির হুলকে রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রস্তাব দেন।

বাতরোগে মৌবিষের কার্যকারিতার পদ্ধতি এখনও পর্যাপ্তভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। তবে অনুমান করা যায় যে, এই রোগের কারণ ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে তা হিতকর প্রভাব ফেলে এবং মৌবিষ প্রয়োগের ফলে বাতরোগীদের এলার্জি জনিত সক্রিয়তার পরিবর্তিত লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়।

স্নায়ুপ্রদাহ ও স্নায়ুশূল: অধ্যাপক ম. ব. ক্রোলে-এর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে খ. ই. এরুসালিম্‌চিক ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মস্কো চিকিৎসা ইনস্টিটিউটে স্নায়ু বৈকল্যের চিকিৎসায় (কটি, ঊরু ও অন্যান্য স্থানের স্নায়ু) রোগ পরীক্ষার অবস্থায় মৌবিষ ব্যবহার করেন।[44] অধিকাংশ রোগীরই আগে থেকেই বাত ছিল এবং মৌ-অধিবিষ দিয়ে চিকিৎসার আগে তাদের সবাইকেই নিয়মমাফিক ওষুধ ও ভৌত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। মৌবিষের দুই শতাংশ দ্রবণ (০·৫ থেকে ২·০ কিউবিক সেন্টিমিটার মাত্রায়) সর্বাধিক যন্ত্রণা জর্জরিত জায়গায় ত্বক-নিম্নে প্রয়োগ করা হয়। একটা কি দুটো ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যথা কমার লক্ষণ দেখা যায়। তিন কি চারটি ইনজেকশনের পর রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আটটি ইনজেকশনের পরে রোগী পুরোপুরি স্বস্তি লাভ করে।

এরুসালিমচিক এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল যেমন লক্ষ্য করেন নি তেমনি লিপিবদ্ধও করেন নি। ফলে ঐ চিকিৎসা যে স্থায়ীভাবে ফলদায়ক

হয়েছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ নেই। স্নায়ুপ্রদাহে বিশেষ করে ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুপ্রদাহে আক্রান্ত অনেক রোগীর এমন হয়েছে বলে জানা যায় যে, মৌমাছির হুলের সাহায্যে চিকিৎসা করার পর তারা নিজেদের সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ভেবেছেন অথচ কিছুদিন পরেই (২ থেকে ৩ মাস) তারা ঐ রোগে পুনরাক্রান্ত হয়েছেন, আর পরে আবার মৌ-অধিবিষ চিকিৎসায় আরোগ্যকর কোন ফল হয় নি।

কয়েকটি চক্ষুরোগ: লোকজ চিকিৎসায় কোন কোন চক্ষুরোগ সারানোর জন্য মৌবিষের ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। একটা উদাহরণ: একজন রোগী দু'বছর যাবৎ নেত্রস্বচ্ছ-নেত্রবর্ম প্রদাহে (keratoconjunctivitis — নেত্রস্বচ্ছ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ) কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন আকস্মিকভাবে মৌমাছি তাকে হুল বিঁধিয়ে দেবার পর থেকেই তিনি অবস্থার কিছু উন্নতি বোধ করতে লাগলেন। মৌমাছির হুলের সাহায্যে চিকিৎসা করা হলে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আধুনিক চিকিৎসায় ইরিটিস (iritis) বা কনীনিকা প্রদাহ ও ইরিডোসাইক্লিটিস (iridocyclitis) বা কনীনিকা ও নেত্রলোম প্রদাহের মত রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক ও সাফল্যজনক ভাবে মৌবিষ ব্যবহৃত হয়। নভোসিবির্স্ক চক্ষু ক্লিনিকের অধ্যাপক ও. ই. শেরশেভ্স্কায়া মৌমাছির হুল রূপে মৌবিষ ব্যবহার করে উত্তম ফলাফল পেয়েছেন। তীব্র কনীনিকা প্রদাহে আক্রান্ত একজন রোগীর দৃষ্টি ক্ষমতার অবনতি হয়ে তা যখন ০·০০০১-এ দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে ফলাফল ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। প্রদাহ কমে যায় এবং তিন-চার দিনের মধ্যে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পায়।[45]

তবে একথা ভুললে চলবে না যে, বন্ধ চোখের পাতায়ও হুল প্রয়োগ করা ভয়ংকর বিপজ্জনক। অক্ষিগোলক থেকে হুলের অতিক্ষুদ্র অংশ বের করতে হলেও দ্রুত কয়েকটা অস্ত্রোপচারের দরকার হতে পারে। এমনকি মৌমাছি যদি চোখের পাতাতেই শুধু হুল ফোটায় তবুও হুলের প্রসারণরত প্রান্তভাগ নেত্রস্বচ্ছের ক্ষতি করতে পারে এবং এভাবে চোখের উপরিভাগেই নেত্রস্বচ্ছ প্রদাহ ঘটতে পারে। কখনো কখনো তা এমন গুরুতর ব্যাধির জন্ম দিতে পারে যাতে পুরো চোখই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

গোর্কি'র কিরোভ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের চক্ষু ক্লিনিকে চেকোস্লোভাক মলম 'ভিরাপিন' রূপে মৌবিষ (সাধারণ চিকিৎসার সাথে সাথে) সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয় এবং তা দাহকুড়ির নেত্রস্বচ্ছ প্রদাহ (herpetic keratitis), কনীনিকা প্রদাহ বাত (rheumatic iritis), শ্বেত বলয় প্রদাহ বাত (rheumatie scleritis) ও উপশ্বেতবলয় প্রদাহ (episcleritis) রোগের ক্ষেত্রে উন্নতি ত্বরান্বিত করে। আমাদের সুপারিশকৃত কর্মপ্রণালীই সেখানে অনুসৃত হয়েছিল: প্রথম দিন বাম কাঁধে মলম লাগানো হয়; দ্বিতীয় দিন সকালে ডান কাঁধে, দুপুরে বাম নিতম্বে ও সন্ধ্যায় ডান নিতম্বে; তৃতীয় দিনে কাঁধের ও নিতম্বের যে-সব স্থানে বহির্ভাগে মলমের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল সে সব জায়গার আগের চেয়ে দ্বিগুণ মাত্রায় মলম প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থ দিন কোন মলম লাগানো হয় নি; পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে তৃতীয় দিনের কার্যপ্রণালীর পুনরাবৃত্তি করা হয়। তবে সবার আগে ত্বক সাবান ও গরম জলে ধুয়ে নেওয়া হয়েছিল।

চর্মরোগ: বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ নিরাময়ের লোকজ চিকিৎসায় মৌমাছির বিষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। মৌমাছি পালক জ. কোভালভ জানান যে, তাঁর ছেলে মুখের ত্বকের ক্ষয়রোগ — লিউপাসে পাঁচ বছর যাবৎ ভুগছিল। মৌখামারে হঠাৎ একদিন মৌমাছি তার আক্রান্ত চোয়ালে হুল ফুটিয়ে দেয়। তাতে হুলবিদ্ধ জায়গার চারপাশটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তখন ঠিক হলো যে, তাকে হুল প্রয়োগ করে চিকিৎসা করানো হবে। কয়েকদিনের চিকিৎসাতেই তার ত্বক স্বাস্থ্যপ্রদ রঙের হয়ে উঠল এবং ছ'সপ্তাহের ভেতর ছেলেটা পুরোপুরি সেরে উঠল।[47] দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারে আর কোন তথ্য আমরা পাই নি। যে সব চর্মরোগের কোন কার্যকর ওষুধ এখনও বের হয় নি বিশেষ করে সে-সব রোগের জন্য ত্বক বিশেষজ্ঞরা যদি মৌমাছির বিষ নিদানিক ভাবে পরীক্ষা করে দেখেন তবে তা কাজে লাগবে।

রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল (পিত্তমেদ) স্তরের উপর মৌমাছির বিষের ক্রিয়াপ্রসূতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য অধ্যাপক ন. ন. আনিচকভের অভিমত হচ্ছে ধমনীস্থূলতা (atherosclerosis) বা

বার্ধক্যের রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে ধমনীস্থূলতা বা ধমনীতে মেদ সঞ্চার। এ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখিত ইরুসালেমচিকের পর্যবেক্ষণ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। কারণ তারা প্রমাণ করেন যে, মৌবিষ দিয়ে চিকিৎসা করার ফলে কোন কোন রোগীর রক্তের কোলেস্টেরল স্তর নেমে গিয়েছিল। যে সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে মৌবিষ উপকারে আসে নি তাদের হাইপারকোলেস্টেরোল্যামিয়া (hypercholesterolaemia) বা রক্তে কোলেস্টেরল আধিক্য ঘটে। এই পর্যবেক্ষণগুলো খুবই মূল্যবান কারণ প্রত্যেকটি রোগীর উপর মৌবিষের কি প্রতিক্রিয়া তা আগেভাগে অনুসন্ধান করে না দেখে তা ব্যবহারের ব্যাপারে সেগুলো সতর্ক সংকেত হিসেবে কাজ করছে।

১৯৩৬ সালে কে. ডিয়ের এবং জি. গ্রাবের জানান যে, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, সন্ধির বৈকল্যে আক্রান্ত রোগীদেরকে মৌ-অধিবিষ চিকিৎসা প্রয়োগ করা হলে (ফোরাপিন মলম হিসেবে) তাদের প্রায় সবারই কোলেস্টেরল স্তর বেড়ে যায় অথচ স্নায়ুপ্রদাহে আক্রান্ত রোগীদের রক্তের কোলেস্টেরল স্তরে মৌমাছির বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা যায় না। কে. এ. ফর্স্টার দেখিয়েছেন যে, মৌবিষ কোন কোন রোগীর রক্তের কোলেস্টেরল উপাদানের বৃদ্ধি ঘটায়; ই. ম. আলেস্‌কের উল্লেখ করেন যে, সন্ধিবাত ও স্নায়ুপ্রদাহে আক্রান্ত যে ১০০ জন রোগীকে মৌ-অধিবিষ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল তাদের রক্তের কোলেস্টেরল স্তর মৌবিষে প্রভাবিত হয়েছিল কিনা সে বিষয় তিনি নিশ্চিত হতে পারেন নি।

মৌবিষ রক্তচাপ কমিয়ে দেয় বলে জানা যায়। কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, একটিমাত্র মৌমাছির বিষ শিরাভ্যন্তরে ইনজেকশন করলে রক্তচাপ সামান্য কমে, পক্ষান্তরে কয়েকটি মৌমাছির বিষ ইনজেকশন করলে রক্তচাপ আকস্মিকভাবে নেমে যায় (বিষের মধ্যেকার হিস্টামিনের প্রভাবে বহির্ভাগস্থ রক্তনালী সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে)।

চীনা চিকিৎসক ফান চু উচ্চ রক্তচাপের ১২ জন রোগীকে মৌবিষ দিয়ে চিকিৎসা করেন এবং তাতে একজনকে আরোগ্য লাভ করতে দেখেন। চারজনের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তিনজনের ক্ষেত্রে মোটামুটি উন্নতি দেখা গেল, কিন্তু তিন জনের মধ্যে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় নি। বাকী রোগীটির চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে, মৌখামারে কাজ শুরু

করার পর (সেখানে তাদেরকে মৌমাছির হুল বিদ্ধ হতে হয়) উচ্চ রক্তচাপের অনেক রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়। তাদের মাথা ব্যথা সেরে যায়, কর্মক্ষম হওয়ার অবস্থার উন্নতি হয় এবং তাদের রক্তচাপ বলতে গেলে স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসে।

এখানে আরও বলা দরকার, মৌমাছির বিষের কার্যকারিতা ছাড়াও রোগীর অবস্থার ওপর গ্রাম এলাকার শান্ত পরিবেশ ও মৌউদ্যানের স্বাস্থ্যপ্রদ বাতাস হিতকর প্রভাব ফেলে।

মৌবিষ ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাবলী

কিছু মৌমাছিপালক, এমনকি কিছু চিকিৎসাকর্মী মনে করেন যে, বিষ দিয়ে সব রকম রোগীই সারানো যায়। তারা স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ, এমনকি কোন কোন যৌনব্যাধিতে মৌবিষ ব্যবহার করেন। কিন্তু এমন অনেক রোগ আছে যা মৌবিষ দিয়ে চিকিৎসা সম্ভব নয়। লোকজ চিকিৎসার নানা অভিজ্ঞতা, আধুনিক রোগপরীক্ষা কেন্দ্রে (ক্লিনিক) নানা পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা নিশ্চিত যে মৌমাছির বিষে কিছু উপশমকারী গুণ রয়েছে, বিশেষ করে সন্ধি ও পেশীর বাত রোগ, সেন্ট ভিটাস নৃত্য (st. 'vitus' dance) রোগ, কটি, মুখমণ্ডলীয় ও অন্যান্য স্নায়ু প্রদাহ, উচ্চ রক্তচাপ (প্রাথমিক ও গৌণ পর্যায়ের), অর্ধশিরশূল, বেইজডোজ (basedow's) রোগ ও আরও কিছু রোগে এই বিষ বিশেষভাবে কার্যকর।* যা হোক, মৌবিষ খুব সাবধানে এবং শুধু মাত্র চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানেই প্রয়োগ করা চলবে, বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের বেলায় এই সাবধানতা বেশি দরকার কারণ তারা এর প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল।

যক্ষ্মা, হৃদ-নিষ্ক্রিয়া, বহুমূত্র, ধমনীস্থূলতা বা যৌন রোগে মৌবিষ ব্যবহার করা চলবে না। প্রথমবার হুল ফোটানোর পর রোগী যদি

---

* 'কোন কোন রোগের চিকিৎসায় জীবন্ত মৌমাছির হুল আকারে মৌ-অধিবিষ চিকিৎসা (মৌমাছির বিষের সাহায্যে চিকিৎসা) প্রয়োগের সাময়িক নিয়ম-নির্দেশ' ১০ই মার্চ ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালয়ের প্রাজ্ঞ কাউন্সিলের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত (কার্যবিবরণী নম্বর-১৭)।

সাধারণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন (মাথা ব্যথা সহ প্রবল জ্বর, খুব দুর্বল বোধ করা, বিছুটি লাগার মত চুলকানি, কান ঝাঁই-ঝাঁই করা এবং উদরাময় ইত্যাদি) তবে সাথে সাথেই চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে।

মৌবিষ প্রয়োগ করার পদ্ধতি

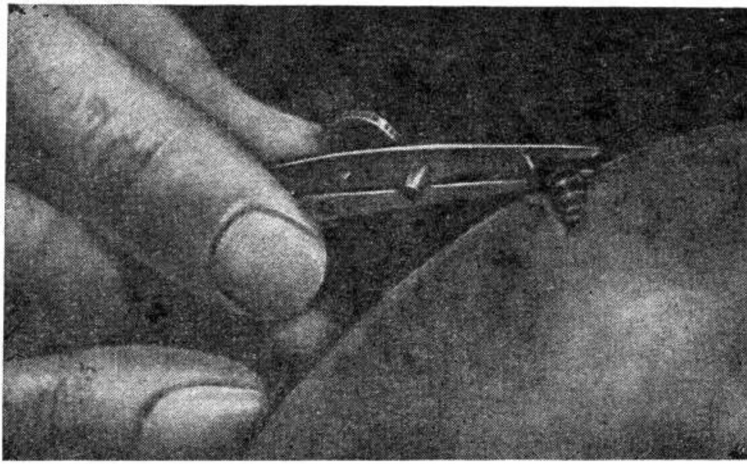
সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে মৌ-অধিবিষ চিকিৎসার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। মৌমাছির বিষ থেকে তৈরী 'ভিরাপিন' (চেকোস্লোভাকিয়ায়), অ্যাপিসারথ্রন (জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে) মলম খুবই জনপ্রিয়। তবে রুমানিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বেক, ব্রডম্যান ও অন্যরা), সোভিয়েত ইউনিয়নে (বেস্‌মের্তনি, ব্রোদখিন, ইওরিশ, ওখোৎস্কায়া, ও অন্যান্য) নিদানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, মৌমাছির স্বাভাবিক হুল-এর সাহায্যে ত্বকাভ্যন্তরীণ ইনজেকশন দিয়ে মৌবিষ প্রয়োগ করা হলে সবচেয়ে কার্যকর হয়।

মৌমাছির স্বাভাবিক হুল: ত্বকের যে স্থানটি মৌ-বিষ দিয়ে চিকিৎসার জন্যে নির্ধারিত হয় তা প্রথমে সাবান ও গরম পানিতে ধুয়ে নিতে হবে (শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্পিরিট দিয়ে ঘষার কোন দরকার নেই)। তারপর বিশেষ ধরনের চিমটা দিয়ে ধরে মৌমাছিকে ত্বকের উপর বসাতে হবে (চিত্র-১৩)। একই জায়গায় আবার হুল ফোটানোর দরকার পড়লে তা পাঁচদিন পার হওয়ার পরেই করতে হবে। ফোলা, যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ চতুর্থ দিনের মধ্যেই চলে যায় ও রোগী স্বাভাবিক সুস্থতা অনুভব করে। মৌ-অধিবিষ দিয়ে চিকিৎসা তখন আবার শুরু করা যায়।

দেহের যে-সব জায়গায় সচরাচর ত্বকনিম্নস্থ (hypodermic) ইনজেকশন দেওয়া হয় (কাঁধ ও নিতম্বের বাইরের দিকে) মৌমাছির হুল ফোটানোর জন্য সেগুলিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মৌমাছির হুল ফোটানোর অঙ্গের সঙ্কোচনে বিষ থলি থেকে বিষ বের হয়ে ধীরে ধীরে (কয়েক ঘণ্টা ধরে) ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে। তাই ত্বকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষ প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত হুল সরানো উচিত নয়। সংকোচনের সমাপ্তি সাধারণতঃ খালি চোখেই দেখা যায়। বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই তা রক্তস্রোতের সাথে মিশে যায় এবং সারা শরীরে তার কার্যকারিতা অনুভূত হয়।

হ্ল দিয়ে চিকিৎসার ধরন এ রকমের হতে পারে: প্রথম দিন একটিমাত্র হ্ল (একটি মৌমাছির); দ্বিতীয় দিনে দ্ুটি হ্ল (দ্ুটি মৌমাছির); তৃতীয় দিনে তিনটি এবং এইভাবে দশ দিন। চিকিৎসার প্রথম পর্যায় শেষে অর্থাৎ রোগী ৫৫ টি মৌমাছির বিষ গ্রহণ করার পর



চিত্র — ১৩: মৌমাছির ক্ষতি এড়াতে বিশেষ ধরনের চিম্‌টার সাহায্যে রোগীর ত্বকে মৌমাছির হ্ল ফোটানো হচ্ছে

তিন-চার দিনের বিরতি দিতে হবে। তারপর ছয় সপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিন তিনটি করে হ্ল ফুটিয়ে চিকিৎসা অব্যাহত রাখা যায়। চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীকে প্রায় ১৪০-১৫০টি মৌমাছির বিষ দেওয়া হয়। এর অর্থ হল, চিকিৎসার প্ুরো দ্ুটো পর্যায়ে রোগী বা রোগিনী ১৮০ থেকে ২০০ টি মৌমাছির হ্ল গ্রহণ করে। এতে রোগী যদি ভাল না হয় বা তার অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত না হয় তবে চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে হবে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, হ্লের সংখ্যা প্রায় ২০০ঠিক রেখে এই সময়ের অর্ধেকের মধ্যেও চিকিৎসা চালানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম দিনে রোগীকে দ্ুটি হ্ল দেওয়া হয়, দ্বিতীয় দিনে চারটি, তৃতীয় দিনে ছয়টি, চতুর্থ দিনে আটটি এবং পঞ্চম ও তার পরবর্তী দিনগ্ুলোতে

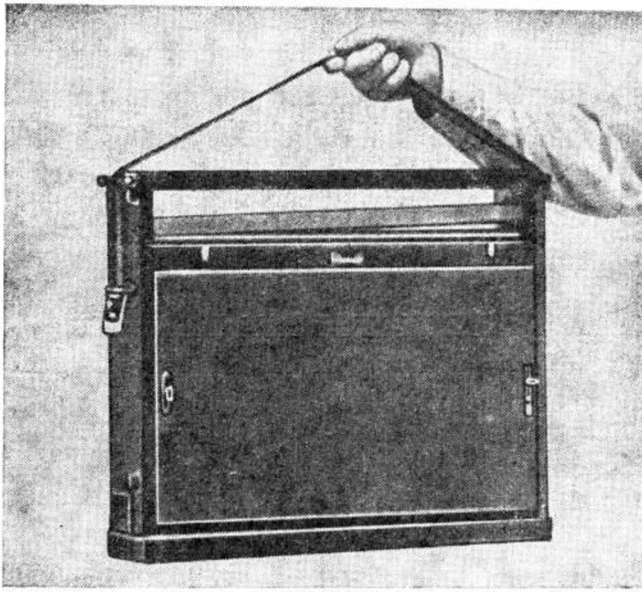
দিনে নয়টি করে। এই মাত্রা যদি খুব বেশি বলে মনে হয় তবে হুলের সংখ্যা পাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই ভাবে কোন স্বাস্থ্যনিবাসে ২৪ দিনের নিয়মমাফিক অবস্থানকালে রোগী ১২৫টি পর্যন্ত হুল গ্রহণ করতে পারে। ২০০টি হুলের বাকিগুলি বাসস্থানেই দেওয়া চলে।

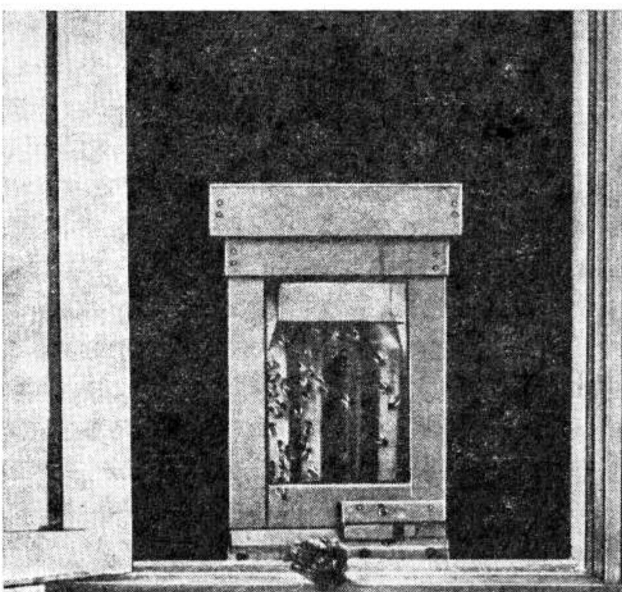
যে-সব রোগীকে মৌমাছির হুল দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তাদের প্রত্যেকের শরীরে সবসময় যে ফোলা বা যন্ত্রণার লক্ষণ দেখা দেবে তা নয় — এটা মনে রাখা দরকার। রোগীরা একসাথে ২০ থেকে ৩০ টি কি তারও বেশি হুল অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা ভাল হয়ে ওঠার পর কিংবা তাদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবার পর কয়েকটি হুল (এমন কি একটি) কখনও কখনও স্বাভাবিক স্থানিক প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে (চামড়া লাল হয়ে যাওয়া, ফোলা, ব্যথা ইত্যাদি)।

মৌশালা থেকে সংগৃহীত কয়েক ডজন মৌমাছিকে সাধারণ কোন কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেখে দিলে তারা একদিনের বেশি বাঁচতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়ে রোগীদের মৌমাছির জন্য প্রতিদিন কিংবা এক একদিন অন্তর মৌশালায় যেতে হয় এবং তাতে অনেক রোগীর যথাযথ চিকিৎসা ব্যাহত হয়ে থাকে। এই কারণে কোন কোন রোগী তাদের ঘরের চিলে-কোঠায় বা ঝুল ব্যারান্দায় মৌচাক রাখার ব্যবস্থা করেন (চিত্র ১৪)।

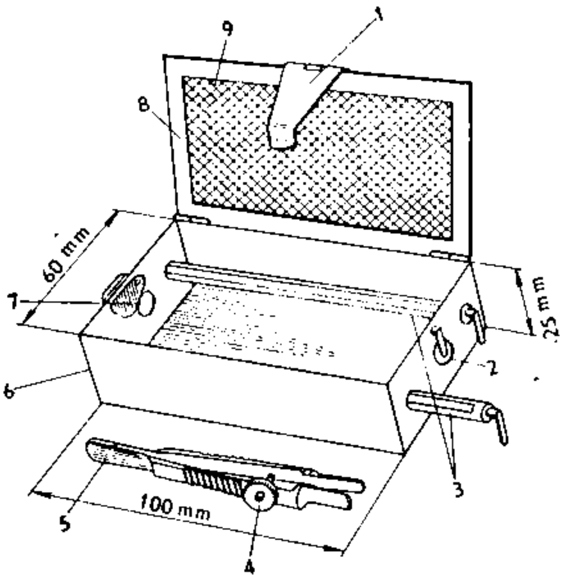
এই কারণেই লেখক সহজে বহনযোগ্য একটি একক-ফ্রেম মৌচাকের নকশা তৈরী করেছেন। এটা দেখতে সাধারণ মৌচাকের মত, তবে বছরের যে কোন সময় যাতে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে এতে কিছু পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন করা হয়েছে। ছোট সুটকেস বা ডাক্তারী বাক্সের মত করে তা তৈরী, ব্যবহারে যেমন সুবিধা তেমনি কোথাও যাওয়ার সময় সাথেও নেওয়া চলে (চিত্র ১৪)। মৌচাকের ভেতরে সংযুক্ত রয়েছে একটি খ্যাদ্যাধার, তা মিষ্টি সিরাপ দিয়ে পূর্ণ করা যায়। খাদ্যাধারটি সিরাপ পূর্ণ করতে হলে তা দুই কি তিন সেন্টিমিটার টেনে বের করতে হয়। তারপর একটি চোঙ্গের মধ্য দিয়ে জাফরি কাটা দেয়াল যুক্ত আধারে সিরাপ ঢালা হয়। জাফরির মধ্য দিয়ে সিরাপ চুইয়ে চুইয়ে সারাটা খাদ্যাধারে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে জাফরি থাকায় মৌমাছিরা আধারে ঢুকতে পারে না।

খাদ্যাধারটি এমনভাবে তৈরী যে তাতে বছরের যে কোন সময়ে বিশেষ করে যখন গাছে সুধাময় ফুল ফোটে না তখনও মৌমাছিদের মধু বা





চিত্র — ১৪: মৌ-বিষ দিয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মৌমাছি রাখার জন্য লেখকের উদ্ভাবিত বহনযোগ্য মৌচাক



চিত্র — ১৫: মৌ-বিষ চিকিৎসায় ব্যবহৃত বহনযোগ্য বাক্স ও চিমটার নক্‌শা

চিনির সিরাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়। মৌমাছিরা যাতে সহজে ফুলের কাছে যেতে পারে সে জন্যে মৌচাকটিকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ঝোপ ঝাড় কিংবা বনের ধারে, মাঠে কিংবা বাগানে রাখা চলে। তবে এভাবে রাখলে মৌমাছির প্রবেশ দ্বারটি শুধু সন্ধ্যার পরেই বন্ধ করে দিতে হয়। সন্ধ্যার আগে ভাগে বন্ধ করে দিলে ও মৌচাক সরিয়ে নেওয়া হলে মৌমাছিরা চাকে ফিরে আসতে পারে না। শহরে জানালার ধারেও মৌচাক রাখা যায়। এ ক্ষেত্রে মৌমাছির প্রবেশদ্বার রাস্তা অথবা বাগানমুখী করে রাখতে হয়।

রোগীর পক্ষে মৌচাক রাখা সম্ভব না হলে আমাদের নকশা করা বিশেষ ধরনের বহনযোগ্য বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র ১৫)। এই বাক্সে প্রায় একশটি মৌমাছি ছয় থেকে দশ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থাই এই ধরনের বাক্সে রয়েছে। বাক্সটি উষ্ণ, সুবাতায়িত এবং তাতে খাবার (মধু ও চিনির সিরাপ) দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে। তা সুবিধাজনক এবং অপসারণযোগ্য দুটো খাদ্যাধারসজ্জিত। বাক্স না খুলে কিংবা

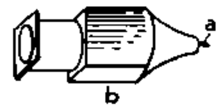
মৌমাছিদের বিরক্ত না করেই সেগুলো মধু ভর্তি করা যায়। কোন মৌমাছি নেওয়ার দরকার পড়লে পার্শ্বদ্বারটি খুলে দিলেই একটা মৌমাছি সাথে সাথে বের হয়ে আসবে। বিশেষ ধরনের চিমটার সাহায্যে সব সময় মৌমাছি তুলে নেওয়া উচিত (চিত্র ১৫)।

আমরা এ কাজের জন্য যে চিমটা ব্যবহারের পরামর্শ দিই তা অনেকটা ব্যবচ্ছেদ করার সাঁড়াশীর মত, তবে কিছুটা পরিবর্তিত। এর খোলা প্রান্ত দুটির মধ্যেকার ব্যবধান তিন মিলিমিটার। ফলে এটি দিয়ে মৌমাছিকে বুকের কাছে আলতো করে ধরে রোগীর ত্বকের উপর বসানো সম্ভব হয়। আর দেহে তখনও বিষ হয় নি এমন অপরিণত মৌমাছি আকারে ছোট বলে চিমটা দিয়ে তাদের তুলে নেওয়া সম্ভব হয় না।

ব্যবচ্ছেদ করার সাধারণ সাঁড়াশী দিয়ে মৌমাছি ধরা ঠিক নয়। কারণ, তার সামান্যতম চাপে ত্বকের উপর বসানোর আগেই মৌমাছি দেহ থেকে বিষ বের করে দেয়। বিশেষ ধরনের চিমটায় ধাতু নির্মিত দুটো বাড়তি প্যাত আছে। মৌমাছি হুল বিদ্ধ করার সাথে সাথে এই পাতগুলির সাহায্যে বিষথলি থেকে সম্পূর্ণ বিষ নিংড়ে বের করানো যেমন সম্ভব হয় তেমনি হুল ফোটানোর অঙ্গ সমেত হুল টেনে বের করা যায়। হুল ফোটানোর অঙ্গের সংকোচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গিয়ে রোগীদের প্রায়ই অনেক সময় নষ্ট করতে হত। সে দিক থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই চিমটা সময় যেমন বাঁচায় তেমনি ত্বকের মধ্যে সবটুকু বিষের প্রবেশ নিশ্চিত করে।

মৌ-অধিবিষের ত্বকাভ্যন্তরীণ ইনজেকশন: মৌ-অধিবিষের ত্বকাভ্যন্তরীণ ইনজেকশন প্রদানের একটা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। মৌমাছির স্বাভাবিক হুল ফোটানোর চেয়ে এর সুবিধাজনক দিক হল: এতে রোগীর অবস্থার উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তাকে বিভিন্ন মাত্রায় ওষুধ দেওয়া সম্ভব হয়। উপরন্তু, হাসপাতালে ও ক্লিনিকে প্রয়োজন হওয়া মাত্রই পাওয়ার মত মৌ-অধিবিষ হাতের কাছে মজুত রাখা সম্ভব হয়। বিশেষ এক রকম সুচ দিয়ে ত্বকের মধ্যে (বহিঃত্বক ও অন্তঃত্বকের মধ্যবর্তী জায়গায়) ০·১, ০·২ কিংবা ০·৩ মিলিমিটার মাত্রায় মৌ-অধিবিষের দ্রবণ ইনজেকশন করা বেশি সুবিধাজনক ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। রক্তে প্রবেশের সাথে সাথে মৌঅধিবিষ সারা দেহে ছড়িয়ে যায়। দ্রবীভূত মৌ-অধিবিষ কিছুটা বেশি পরিমাণে (১





চিত্র — ১৬: মৌ-বিষ চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিশেষ সিরিঞ্জ
a — সূচ; b — স্লীভ; c — সিরিঞ্জ

মিলিলিটার) ত্বকনিম্নে দেওয়া যেতে পারে। তবে ত্বকাভ্যন্তরীণ ইনজেকশনের চেয়ে তার কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত কম সন্তোষজনক।

মৌঅধিবিষের তাড়িত সঞ্চারণ (Electrophoresis): অভ্যন্তরীণ রোগ, স্নায়বিক বৈকল্য, স্ত্রী-রোগ, অস্ত্রোপচারের মত অবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিদানিকভাবে তাড়িত সঞ্চারণের ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি হচ্ছে তাড়িত বিয়োজন (electrolytic dissociation) এবং তা ত্বকের মধ্য দিয়ে দেহে ভেষজ ও ওষুধ প্রয়োগের একটি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সাধারণতঃ ভৌত চিকিৎসা বিভাগে এই চিকিৎসা চালানো হয়।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, মৌ-অধিবিষ চিকিৎসা তাড়িত সঞ্চারণের সাহায্যে করলে তাতে মৌমাছির হুল দিয়ে চিকিৎসার চেয়ে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায়। তাড়িত সঞ্চারণ প্রয়োগ করা হলে সামান্য রক্তাধিক্য (বা রক্তবর্ণ হওয়া) ছাড়া অপ্রীতিকর কোন কিছু ঘটে না।

১৯৬৫ সালে বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত মৌমাছিপালকদের ২০তম (জয়ন্তী বর্ষ) আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে বুলগেরীয় চিকিৎসক ড. স্লাদেনভ এবং ড. কাজানজিয়েভা জানান যে, তাঁরা কাস্তেনদিল বালনিওলোজিক্যাল স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসারত প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের বৈকল্যে আক্রান্ত ১০৮ জন রোগীর উপর তাড়িত সঞ্চারণ করে মৌ-অধিবিষ প্রয়োগ করেন। রোগীদের মধ্যে ৩২ জন আরোগ্যলাভ করে, তাদের ব্যথার সম্পূর্ণ

উপশম হয়, স্নায়ুতন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। লক্ষণীয়ভাবে উন্নতি হওয়ায় ৬৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় (পরবর্তী দু' বছরের মধ্যে রোগের পুনরাক্রমণ জনিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি)। ১২ জন রোগীর কোন উন্নতি লিপিবদ্ধ হয়নি এবং একজনের ক্ষেত্রে মৌমাছির বিষ এলার্জিক বলে প্রমাণিত হয়। বাতকল্প সন্ধি প্রদাহ (rheumatoid arthritis), সন্ধিপ্রদাহ বাত (rheumatic arthritis) ও ধমনীর রোগে এই চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

তাড়িত সঞ্চারণের জন্য মৌ-আধিবিষের দ্রবণ তৈরী করতে হয় এভাবে: ০·০৪ থেকে ০·০৫ গ্রাম অশোধিত মৌবিষ এক লিটার পরিস্রুত জলে দ্রবীভূত করতে হয়। জলাকর্ষী (hydrophilic) প্যাড সহ দুটি তড়িৎ শলাকা (আয়তনে ১৫০-২৫০ বর্গ সেণ্টিমিটার) ব্যথা অনুভূত জায়গায় লাগাতে হবে। এরপর প্যাডগুলি গরম পানি ও মৌ-আধিবিষ দ্রবণে সামান্য ভিজিয়ে নিতে হবে। এবার সীসারে পাতগুলি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শলাকার সাথে যুক্ত করে একই সাথে দুই মেরুপ্রান্ত দিয়েই মৌ-আধিবিষ প্রয়োগ করতে হবে। তখন থেকে চিকিৎসা শেষ হওয়া পর্যন্ত দৈনিক ৮·০ মিলিলিটার করে দিতে হবে। প্রথমদিন ১০ মিলি অ্যাম্পেয়ার শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়া হয়। তারপর দৈনিক ২·০ মিলি অ্যাম্পেয়ার করে বাড়িয়ে সর্বাধিক ২০ মিলি অ্যাম্পেয়ার পর্যন্ত আনতে হবে এবং তা এই পর্যায়ের চিকিৎসার শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে হবে। এই চিকিৎসা ধারায় প্রথম দিন চিকিৎসা চলবে ১০ মিনিট তারপর দৈনিক দুই মিনিট করে বাড়িয়ে সর্বাধিক ২০ মিনিট পর্যন্ত করতে হবে এবং সেটাও এই পর্যায়ের চিকিৎসার শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে হবে। চিকিৎসা ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত চলে এবং ২০০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আধিবিষ দ্রবণ প্রযুক্ত হয়।

মৌ আধিবিষ মলম: মৌ-আধিবিষকে মলম হিসেবেও প্রয়োগ করা চলে। বিশুদ্ধ মৌ-আধিবিষ, সাদা ভ্যাজেলিন ও স্যালিসাইলিক এসিড দিয়ে এই মলম তৈরী হয়। স্যালিসাইলিক এসিড ত্বকের বাইরের আস্তরণকে (epidermis) কোমল করে এবং তার সঞ্চার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু মৌ-আধিবিষ ত্বকের ক্ষত বা আঘাতের মাধ্যমেই কেবল রক্তে প্রবেশ করতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই মলমের ভেতর ত্বকের ঘর্ষকের কাজ করার জন্যে বালুকণা দিতে হয়। চিকিৎসকের দেওয়া

ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঘরে বসেই এই মলম দিয়ে চিকিৎসা চালানো যায়। এই মলমের একটা অসুবিধা হল এটা ঘষার ফলে ত্বকের অনেকখানি জায়গা ছড়ে যায়। সেই কারণে ত্বকাভ্যন্তরীণ ভাবে কিংবা তাড়িত সঞ্চারণের সাহায্যে মৌ-অধিবিষ প্রয়োগ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্বাসনের সাহায্যে মৌ-অধিবিষ চিকিৎসা: ফুস্‌ফুসের ব্যাপক অংশে বায়ুকোষরন্ধ্র থাকাতে পাকান্ত্রিক নালীর তুলনায় ফুসফুসের মাধ্যমে ওষুধ দ্রুত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। প্রশ্বাসনের মাধ্যমে মৌ-অধিবিষ প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং যে কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তা ব্যবহার করা যায়। এতে রোগীকে শুধু গরম পানিতে মেশানো মৌ-অধিবিষের ভাপ শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়।

মৌঅধিবিষ ট্যাবলেট: মৌমাছির বিষ দিয়ে তৈরী ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ জোসেফ ব্রডম্যান এম. ডি.[14)] ট্যাবলেট আকারে মৌঅধিবিষ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন। মৌমাছির বিষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রকম ট্যাবলেট তৈরী করা যায়। এগুলির সুবিধা এই যে, তা থেকে বিষাক্ত প্রোটিন অপসারিত করা হয় এবং বিষের মাত্রা অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হয় (রঙ করার জন্য নির্দোষ উদ্ভিজ্জ রঞ্জক ব্যবহার করা হয়ে থাকে)। একটি পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য দেওয়া পরামর্শে ২১৫ টি মৌমাছির কাছ থেকে নেওয়া বিষের ২৮টি ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়। ট্যাবলেটগুলি জিহ্বার তলে রেখে চুষে খাওয়াই নিয়ম। কারণ, গিলে খেলে পাকান্ত্রিক নালীর মধ্যেকার উৎসেচক দ্বারা এগুলি সরাসরি হজম হয়ে যায়। প্রাকৃতিক মৌবিষের তুলনায় ব্রডম্যান প্রস্তাবিত মৌ-অধিবিষ ট্যাবলেটের সুবিধা হল, এগুলি বিষাক্ত আমিষের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা দেখেছি, এই বিষাক্ত আমিষ শুধু যে মৌমাছির বিষের প্রতি এলার্জির সৃষ্টির কারণ তা নয়, বিষক্রিয়ার মৌলিক লক্ষণের জন্যও তা দায়ী। ট্যাবলেটগুলির মান উন্নত করার জন্য আর ও কাজ চলছে। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে অদূর ভবিষ্যতে ট্যাবলেট আকারে মৌবিষ বিভিন্ন দেশের ওষুধের দোকানে তার যোগ্য স্থান অধিকার করবে।

প্রাগে (চেকোস্লোভাকিয়া) অবস্থিত বাত রোগের গবেষণা

ইনস্টিটিউটে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের তিনটি ক্লিনিক এবং প্লভদিভের (বুলগেরিয়া) পাভলভ উচ্চতর চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের ভেষজ বিজ্ঞান বিভাগে বর্তমানে এই ট্যাবলেটগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সোভিয়েত জর্জিয়ায় জর্জীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা কাউন্সিলের দ্বারা মৌ-অধিবিষ ট্যাবলেটগুলি অনুমোদিত হয়েছে।

মৌমাছির বিষ সংগ্রহের পদ্ধতি

সবেমাত্র মোম 'সূতিকাগার' ছেড়েছে এমন কর্মী মৌমাছির দেহে বিষ থাকে না বললেই চলে। তার দেহে বিষ আস্তে আস্তে বাড়ে এবং দু'সপ্তাহ বয়সে তার বিষের মজুত সর্বাধিক হয়ে থাকে। এফ. ফ্লারী মৌমাছির বিষ সংগ্রহের একটি মৌলিক পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন। একটা বড় মুখওয়ালা বয়মে অনেকগুলি মৌমাছি নিয়ে বয়মটির মুখ ইথার-ভেজানো ফিল্টার কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। ইথারের বাষ্পে মৌমাছিরা ক্ষেপে গিয়ে বয়মের গায়ে, তলায় ও অন্যান্য মৌমাছির গায়ের উপর বিষ ঢালতে থাকে। ইথারের প্রভাবে মৌমাছিগুলি নিশ্চেতন হয়ে পড়লে বয়মের গা জল দিয়ে আলতো করে ধুয়ে নিতে হবে। এই জলই তারপর পরিশ্রুত ও বাষ্পীভূত করতে হবে। যে পদার্থটি থেকে যাবে সেটিই মৌমাছির বিষ। এই বিষ কয়েক মাস রাখলেও এর গুণ নষ্ট হয় না। ভেজা শরীর শুকিয়ে গেলে মৌমাছিগুলিকে পুনরায় মৌচাকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এই পদ্ধতির আবার কিছু অসুবিধাও আছে: প্রথমত, এই পদ্ধতিতে মৌমাছিরা দেহ থেকে পুরো বিষ বের করে দেয় না; দ্বিতীয়ত, নিশ্চেতন অবস্থা, জলে ধোয়া ও শুকানোর ফলে কিছু কিছু মৌমাছি শেষ পর্যন্ত বাঁচে না; তৃতীয়ত, সংগৃহীত মৌ-অধিবিষ বিশুদ্ধ করা কঠিন।

ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে মৌমাছির বিষ সংগ্রহের একটি পদ্ধতির পরামর্শও পাওয়া গেছে। এর জন্যে মৌচাকের প্রবেশ পথে একটা বিশেষ ধরনের যন্ত্র লাগাতে হয়। মৌচাকের প্রবেশ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মৌমাছিরা মৃদু তড়িৎ-অভিঘাত খায় এবং সাথে সাথে বিষ ঢেলে দেয়। ঐ বিষ সেখানে রাখা একটা গ্লাসের মধ্যে পড়ে।

আরও কয়েক রকম পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু সেগুলির কোনটিই

সন্তোষজকে নয়। সেগুলি দিয়ে হয় বিশুদ্ধ বিষ পাওয়া অসম্ভব না হয় বিপুল সংখ্যায় মৌমাছি ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা মৌমাছিদের কোন রকম ক্ষতি না করে স্বাভাবিক মৌ-বিষ সংগ্রহের নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি অবলম্বনের সুপারিশ করি। বিশেষ ধরনের চিমটা দিয়ে মৌমাছিদের তুলে নিয়ে (মৌ-অধিবিষ চিকিৎসার মত) কোন স্লাইডের উপর উদর নীচের দিকে করে ধরে রাখতে হয়। মৌমাছি স্লাইডে হুল ফোটাতে থাকে অর্থাৎ হুল না ঢুকিয়ে শুধু বিষ ঢেলে দেয়। এ ভাবে আমরা প্রতি স্লাইডে ৩০০ একক মৌ-অধিবিষ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই (এখানে একক বলতে আমরা একটি মৌমাছি যতটুকু বিষ ঢেলে দেয় তাকেই বোঝাচ্ছি)। বিষ লাগানো দিকটা যাতে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে এমনিভাবে দুটো স্লাইড একসাথে লাগিয়ে রাখা যায়। এভাবে লাগানো স্লাইড যে কোন জায়গায় সাধারণ ডাকযোগে পাঠানো চলে। খুব সম্প্রতি কাঁচের পরিবর্তে সেলুলয়েড, প্লাস্টিক ও পলিথিলিনের তৈরী চাক্তির ব্যবহার চালু হয়েছে। চাক্তি থেকে দানাদার মৌবিষ সহজেই চেঁছে নেওয়া যায়। এতে বিষের পরিমাণ, পরিমাপ ও সঠিকমাত্রা নিরূপণ করা সহজ হয়। এভাবে সংগৃহীত মৌবিষের নিরাময় গুণ দু'বছর পর্যন্ত বজায় থাকে। চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে মৌ-অধিবিষ ব্যবহার করতে হলে চাকতিটা পরিস্রুত জলে রাখলেই চলে। এভাবে মৌ-অধিবিষের যে দ্রবণ পাওয়া যায় তা ত্বকের ভেতরে বা ত্বকের নীচে ইনজেকশনের সাহায্যে প্রয়োগ করা চলে। তা প্রশ্বাসন কিংবা তাড়িৎ সঞ্চারণ কিংবা মলম তৈরী ইত্যাদি কাজেও ব্যবহার করা চলে। এই পদ্ধতি মৌমাছির কোন ক্ষতি করে না এবং যে কোন পরীক্ষাগারে কিংবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতি কাজে লাগানো যায়।

মৌ-অধিবিষ চিকিৎসাকালে নির্বাচিত খাদ্য

মৌবিষ দিয়ে চিকিৎসা চালানোর সময় বাছাই করা খাদ্য খুবই প্রয়োজনীয়। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে, খাদ্যের সারবস্তুই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, খাদ্যগ্রহণও নিয়মমাফিক হতে হবে। দেখতে হবে খাদ্যের ক্যালরিমান যেন বেশি হয় অথচ যেন দুষ্পাচ্য না হয় এবং তাতে যেন শ্বেতসার-শর্করা, আমিষ, চর্বি ও খাদ্যপ্রাণ ইত্যাদি সমন্বিত

সুষম খাদ্য হয়। ভিটামিন C ও B_1 বেশি করে খেলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। কোন কোন চিনি এবং অন্যান্য শ্বেতসার-শর্করার (রুটি, আলু) বিকল্প হিসেবে মধু ব্যবহারে তা সহায়ক হয়। চিকিৎসা চলাকালে মদ ও সুরাজাতীয় পানীয় ও মশলা ব্যবহার নিষিদ্ধ কারণ এগুলি বিষের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ভুরিভোজনের পর রক্তে পরিপাকতন্ত্র মুখী উচ্ছাস দেখা দেয় বলে এ ধরনের ভোজনের অব্যবহিত পরে মৌবিষ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। মৌবিষ মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা ঘটিয়ে আকস্মিক মূর্ছার কারণ হতে পারে। হুল প্রয়োগের অব্যবহিত পরে গোসল, ধারা স্নান এবং বেশি হাঁটা নিষেধ। ত্বকের উপর থেকে হুল সরিয়ে ফেলার পর ক্ষতের উপর বোরিক এসিড মলমের প্রলেপ লাগাতে হবে এবং এর পর রোগীকে অন্ততঃ ২০-২৫ মিনিট শুয়ে বিশ্রাম নিতে হবে।

বাত রোগের চিকিৎসার সময় স্বাস্থ্য বিধি সম্মত খাবার খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সাপের বিষ ও মৌবিষ

ম. ফিসালিক্স (১৯৩২-৩৫) দেখিয়েছেন যে, সাপের বিষ ও মৌবিষের প্রতিরোধ প্রাণিদেহকে পাল্টা-অনাক্রম্য (crossimmunize) করা সম্ভব। আরও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ক্যালমেট সিরাম নামে পরিচিত সর্পবিষঘ্ন (antivenene) মৌবিষের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর নিরাময়ে কার্যকর হয়।

মৌবিষ ও সাপের বিষের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। শজারুর দেহে সাপ ও মৌমাছির বিষ অনাক্রম্য (কোন প্রতিক্রিয়া করেনা) পক্ষান্তরে ঘোড়ার দেহে দুটোরেই প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। অম্লজারক (পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) ও অ্যালকোহল, দুই রকমের বিষক্রিয়াকেই প্রশমিত করে। দেহের যে স্থানে এগুলোর ইনজেকশন দেওয়া হয় তা দুটো বিষের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া দুটো বিষই শ্বাসকেন্দ্রে অসাড়তা সৃষ্টি করে মৃত্যু ঘটায়।

মৌমাছি ও সাপ জাতিগতভাবে খুবই ভিন্ন ধরনের হলেও তাদের বিষের একটি সাধারণ সাদৃশ্য হচ্ছে যে, নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা গেলে

দুটোই রোগ নিরাময়ে কাজে লাগে। মৌমাছি ও সাপের বিষ রক্তে প্রবেশ করলে তা সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্নায়ুতন্ত্রে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়। দুটো বিষেরই বেদনা-উপশমক গুণ রয়েছে। কয়েকটি রোগে এদের ব্যবহার বিধি প্রায় একই রকম। পেশীবাত, সন্ধিবাত, স্নায়ুশূল ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় ভিপ্রাটক্স ও ভিরাপিন (বা অ্যাপিসারথ্রন) প্রয়োগ করা যায়। তবে চিকিৎসা অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চালাতে হবে।

সাপের বিষ ও মৌবিষ দিয়ে তৈরী ওষুধ একত্রে ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। মৌমাছির বিষ যে নিয়মে প্রয়োগ করার পরামর্শ আমরা দিয়েছি সেই নিয়মেই তা ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ প্রথম দিন এক পাশের কাঁধের ত্বকে ভিপ্রাটক্স ঘষে লাগাতে হবে, দ্বিতীয় দিন অন্য কাঁধে এ ভাবে লাগাতে হবে ভিরাপিন, তৃতীয় দিনে এক নিতম্বে ভিপ্রাটক্স এবং চতুর্থ দিনে অন্য নিতম্বে ভিরাপিন)।

মৌমাছির মোম ও অন্যান্য মৌজাত সামগ্রীর আরোগ্যকর গুণাগুণ

মোম

যে-সব জটিল পদার্থ নিয়ে এখনও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয় নি মৌমাছির মোম তাদের একটি। এতে ১৫টির মত পৃথক রাসায়নিক উপাদান আছে। দেখা গিয়েছে যে, এতে ৭০·৪ থেকে ৭৪·৭ শতাংশ একযোজী এলকোহলের জটিল এস্টার (মেলিসিন বা মাইরিসিল অ্যালকোহল, সিরাইল অ্যালকোহল বা সেরোটিন ইত্যাদি) এবং ফ্যাটি এসিড, ১৩·৫ থেকে ১৫ শতাংশ মুক্ত এসিড (সেরোটিনিক, মেলিসিক, ওলিক বর্গ ইত্যাদি) এবং ১২·৫ থেকে ১৫·৫ শতাংশ সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (পেণ্টা কোসেইন, হেপ্টাকোসেইন, নোনাকোসেইন ইত্যাদি) বিদ্যমান। এ ছাড়াও এতে যে রঞ্জক ও সুরভি পদার্থ আছে তা এর রং ও মনোরম সুগন্ধের কারণ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মোমের আশ্চর্য গুণ সম্পর্কে সুজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন মিশরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে মধু উৎসর্গ করা হত। দ্বিতীয় র‍্যামসিজ-এর আমলের (খ্রী. পূ. ১৩ শতক) একটি গুটানো পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে, উৎসর্গ তহবিলে ফারাওয়ের অনুদানের পরিমাণ ৩১০০ 'দেবেন' ছিল। মোম যে অনেক ধরনের কাজে লাগে (ধাতব পদার্থের উপরিভাগে মরিচা-পড়া নিবারণে, মডেল বা ছাঁচ তৈরী, মোমযুক্ত উৎকীর্ণ ফলক তৈরী, হরফ তৈরী ও সেগুলো লাগানোর জন্য) সেটা লক্ষ্য ক'রে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে অ্যারিস্টোফ্যানেজ মোমকে একটি অমূল্য ও অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ বলে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন প্রাচীন জাতি (সীথীয় ও ইরানীয়রা তাদের অন্তর্ভুক্ত) মৌমাছির মোম দিয়ে বিশিষ্ট নেতৃবর্গের শবদেহ সংরক্ষণ করত। হিপোক্রাটিজ স্বরভঙ্গ বা গলদাহের নিরাময়ে ঘাড়ে ও মাথায় মোম লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কয়েক শতাব্দী পরে ইবনে সিনা

তাঁর 'চিকিৎসাবিদ্যার মূলনীতি' গ্রন্থে দেওয়া অনেক চমকপ্রদ ব্যবস্থাপত্রে মোমের উল্লেখ করেছেন। হাজার বছর আগে দেওয়া হলেও সে-সবের কার্যকারিতা এখনও বহাল রয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক প্রাচীন রুশী সারগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মোম ক্ষত সারায় এবং বুকের অসুখের উপশম করে। ১৭০৭ সালে ডি. ম্যুর লিখেছেন, খাঁটি মোম পাতিত করে যে তেল পাওয়া যায় তা খুবই ফলপ্রদ, ক্ষতে ও ভেতরের রোগে তা অলৌকিক ওষুধের মত কাজ করে। লোকজ ভেষজবিদ্যায় নানারকম রোগ বিশেষতঃ ত্বকের ক্ষয়রোগের চিকিৎসায় মোমের ব্যবহার ছিল। (এ প্রসঙ্গে ১৯৩৯ সালে পাওয়া বেলোরুশীয় চর্ম ও রতিজ রোগতত্ত্ব ইনস্টিটিউটের শ্রমিক দ. রাপোপোর্ত-এর সিদ্ধান্তটি বেশ চমকপ্রদ। তাঁর ধারণা, ত্বকের ক্ষয়রোগের স্থানিক থেরাপী হিসেবে ব্যবহৃত চলতি ওষুধগুলোর বড় রকমের কিছু অসুবিধা রয়ে গেছে, কারণ এগুলোতে যেমন যন্ত্রণা বাড়ে তেমনি ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায়ও তা তেমন সন্তোষজক নয়। তাঁর মতে মোম ও মাখন দিয়ে তৈরী মলমে কোন ক্ষতিকর উপাদান থাকে না, অথচ তা বেশ কাজের)।

সেই প্রাচীন কাল থেকে, কাগজ আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত সমতল ফলকের উপর হরফ লেখার কাজ চলত মোমের সাহায্যে। ফলকের একপাশে সমান করে মোমের আবরণ দিয়ে তার উপর হরফ লেখা হত কেটে কেটে। এ কাজের জন্য ধাতুনির্মিত সাধিত্র বা চেরাই কলমের (Stylus) ব্যবহার ছিল। তার ধারালো দিকটা দিয়ে হরফ খোদাই করা হত আর মোটা দিকটা দিয়ে খোদাই অক্ষরের উপরিভাগ মসৃণ করা হত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিল্পীরাও রঙের সাথে মোম ব্যবহার করেছেন। তাতে রঙ পেয়েছে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল দীপ্তি আর তার বর্ণসুষমাও হয়েছে যথেষ্ট টেকসই। এটা শুধু লিখিত রচনার কথা নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারও তা প্রমাণ করেছে। ১৭০৬ সালে পম্পেই ও হেরকুলানিয়ামে খননকাজ চলাকালে মোমের তৈরী একটি দেয়ালচিত্র আবিষ্কৃত হয়। ধনী এক পম্পেইবাসীর হল-ঘরে এক ভোজনোৎসবকে শিল্পী ঐ দেয়ালচিত্রে অলঙ্কৃত করেন। ভিসুভিয়াসে উদগীরণ হলে দেয়ালচিত্রটি ৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট মাটি ও আগ্নেয় ছাইয়ের মধ্যে চাপা পড়ে। তারপর ১৮টি শতাব্দী ধরে তা মাটিচাপা অবস্থায় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ দেয়ালচিত্রের সৌন্দর্য ও রঙের ঔজ্জ্বল্য বজায়

রয়েছে। বর্তমানে নতুন নতুন কৌশল মোম-চিত্রকলাকে হটিয়ে দিলেও রঞ্জক ও তেলের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায় বলে তৈলচিত্রে মোম আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও মোমের ব্যাপক ব্যবহার চলে আসছে। আঠারো শতকেও রাশিয়ায় আবক্ষমূর্তি ও প্রতিকৃতি তৈরীতে মোম ব্যবহৃত হয়েছে। ১৭১৬ সালে মহামহিমান্বিত পিটার তাঁর নিজের একটি ভাস্কর্য তৈরীর জন্য প্রখ্যাত স্থপতি ও ভাস্কর বারতোলোমেইয়ো রাসত্রেল্লীকে সেন্ট-পিটারবুর্গে আমন্ত্রণ জানান। ১৯১৯ সালে রাসত্রেল্লী মোম দিয়ে পিটারের মাথার যে প্রতিমূর্তিটি তৈরী করেছিলেন তা এখনও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর জাতিবন্ধনবিদ্যা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ১৭২৯ সালে রাসত্রেল্লী মেনসিকভের একটি আবক্ষমূর্তি তৈরীর কাজ শেষ করেন।

চিকিৎসাবিদ্যায় মডেল তৈরীর কাজেও মধুর ব্যবহার দেখা গেছে। প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ ও নবজাগরণের শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) নিলয়ের ভেতর দিয়ে গলিত মোম ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় গঠনের নমুনা তৈরীর একটি পদ্ধতি বের করেছিলেন। ওলন্দাজ শারীরবিদ Rutch-এর কাছ থেকে মহামান্বিত পিটার রাশিয়ার প্রথম হাসপাতাল-স্কুলের জন্য যে-সব শারীরবৃত্তীয় নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো মোমের সংরক্ষণকর গুণ বোঝার পক্ষে বাস্তব নিদর্শন। নমুনাগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর যাদুঘরে রক্ষিত আছে, ঐ সব নমুনার মূল উপাদান ছিল মধু। রক্তনালী ও কোষকলাগুলি যাতে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় সে জন্য সেগুলি বিভিন্ন রঙের মোম দিয়ে ভরা হয়েছিল। ঐ মোমই আবার ধ্বংস ও ক্ষয়ের হাত থেকে সেগুলিকে রক্ষা করেছে।

চিকিৎসাবিদ্যায় মোমের গুরুত্ব এখনো অব্যাহত আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেষজকোষে বলা হয়েছে, ডিস্ক, মলম ও ক্রীম মোম থেকে তৈরী করা উচিত। আসঞ্জনশীল দ্রব্য (adhesive), পারদ, মেলিলোটিন ও সাবানের আস্তরণ (soap plaster) যেমন মোম ছাড়া তৈরী হয় না তেমনি কর্পূরের মলম, পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্পেনীয় মক্ষিকা মলম, কিংবা স্পার্ম-মোম, সীসা, দস্তা বা অন্যান্য দ্রব্যের মলমও মোম ছাড়া হয় না। এ ছাড়াও প্রসাধনীশিল্পে ক্রীম তৈরীতে মোমের

ব্যাপক ব্যবহার হয়। এর কারণ মোম সহজেই ত্বকের ভেতরে যায় এবং ত্বককে পেলব ও মসৃণ করে তোলে (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন)। ১৯৬২ সালে ন. ইয়াকোবাসভিলি মোম থেকে সুরভি পদার্থ তৈরীর একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। উঁচুমানের সুরভিদ্রব্য তৈরীতে তা ব্যবহৃত হতে পারে। এই সুরভি পদার্থটিতে গোলাপ ও জেসমিন তেলের সুগন্ধের অনুরূপ সুগন্ধ আছে, অথচ তার উৎপাদন-ব্যয় অনেক কম। এক টন মোম থেকে পাঁচ কিলোগ্রামেরও বেশি ঐ উঁচুমানের তেল পাওয়া যায় আর অবশেষ হিসেবে যা থেকে যায় তাতেও শিল্পদ্রব্যে ব্যবহৃত হবার মত নানা গুণ থাকে। মোমে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A থাকে। মধুকোষ থেকে সংগৃহীত একশ গ্রাম মোমে ৪০৯৬ আন্তর্জাতিক একক পরিমাণ ভিটামিন A থাকে (একই পরিমাণ গোমাংসে তা মাত্র ৬০)। মোম ব্যবহার করে আমরা ভিটামিন সমৃদ্ধ যে-সব মিঠাই সামগ্রী তৈরী করে দেখেছি সেগুলোর ভিটামিন মান কয়েকমাস পর্যন্ত বজায় ছিল। মস্কোর রেড অক্টোবর কনফেকশনারী ওয়ার্কস-এ প্রস্তুত মধু মিঠাই 'ক্ষুদে মৌমাছি' ও 'সোনালী মৌচাক' নিয়ে (তাতে মধুর পরিমাণ সামান্য, চিনির আবরণটাই প্রধান) আমরা সেগুলিতে ভিটামিন সমৃদ্ধ মোমের আবরণ দিয়েছিলাম। এ জন্য সামান্য গলিয়ে নেওয়া ভিটামিন সমৃদ্ধ মোমে সেগুলিক ডুবিয়ে নিতে হয়েছিল। প্রযুক্ত ভিটামিনের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ (শতাংশ, মিলিগ্রামের হিসেবে): A-০·৫, B_1-১·০, B_2-১·০, C-২৫, রুটিন-২০। দেখা গেল, মিস্টিগুলো বিপাক ক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়েছে এবং রক্তসংবহন ও পেশীতন্ত্রের ক্রিয়ায় হিতকরি প্রভাব ফেলেছে। এগুলো চুষে খাওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ লালা নিঃসৃত হয় বলে তাতে পাকস্থলীর নিঃস্রাবী তৎপরতা ও সঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে মোম আপনা থেকেই দাঁত পরিস্কার করা ও মাড়ি শক্ত করার কাজ করে দেয়। যাঁরা ধূমপান ছেড়ে দিতে চান তাদেরকে এই ধরনের মিঠাই খেতে দেওয়া চলে।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনেও মোম যথেষ্ট কাজে লাগে। ঢালাই কারখানা, প্রকৌশল কারখানা, রেলসড়ক পরিবহন এবং চর্ম ও বস্ত্রশিল্পে মধু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও সুরভিদ্রব্য, ওষুধ ও মিঠাই শিল্পেও প্রচুর মধু লাগে। স্কী-মোম, জুতোর পালিশ, গালা, মার্বেল ও প্লাস্টার তৈরীর সিরিশ আঠা, কাঁচের উপর লেখার জন্যে পেন্সিল

ইত্যাদি তৈরীতে মোম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদ্যানপালনে জোড়কলম তৈরীর কাজে মোমের দরকার পড়ে। প্রথম উড্ডয়ন যন্ত্রের নির্মাতা কল্পকাহিনীর বিখ্যাত ডেডালাস তার নিজের দুটি পাখা তৈরী করেছিলেন মোম দিয়ে। আশ্চর্য! এ যুগের বিমানে ও মহাশূন্যযানগুলোও মোম ছাড়া অচল।

মৌ-আঠা বা প্রপোলিস

রোদমাখা গ্রীষ্মের কোন দিনে মৌমাছির চাক খোলা হলে দেখা যাবে মধুকোষের কাঠামোর উপর-প্রান্তে বাদামী সবুজ রঙের রেজিন বা লাক্ষাজাতীয় কিছু একটা লেগে আছে। এটাই প্রপোলিস (propolis) বা মৌ-আঠা (এসেছে গ্রীক propolis থেকে, অর্থ শহরতলী)। অনাহূত অতিথির প্রবেশ ঠেকাতে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে নিজেদের মৌশহরটির প্রবেশমুখকে মৌমাছিরা মৌ-আঠা দিয়ে সংকীর্ণ করে দেয় বলে এই নামকরণ হয়েছে।

মৌচাকের ফাটল ভরাট করা, চাকের কাঠামোর কোণগুলোকে খাঁজে খাঁজে আটকানো এবং মধুকোষের কুঠরিগুলো মসৃণ করে তোলার কাজে মৌমাছিরা তাদের আঠা ব্যবহার করে। যে-সব টিকটিকি, সাপ ও ইঁদুর চাকের ভেতরে ঢুকে মারা পড়ে সেগুলোর মৃতদেহ দেয়ালের সাথে মৌ-আঠা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। আর এইভাবে গলিত শবের দুর্গন্ধ ও জীবাণু-উদ্ভিদের হাত থেকে মৌ বসতি রক্ষা পেয়ে থাকে।

এক সময় ভাবা হতো মৌমাছিরা মৌ-আঠা তৈরী করে গাছের কুঁড়ি (উইলো, পপলার, বার্চ, ফার, পাইন, হর্স চেসনাট প্রভৃতি) থেকে। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তা তৈরী হয় পরাগ থেকে।

মৌ-আঠায় গড়পড়তা ৫৫ শতাংশ রজন (resin) ও বলসাম (balsam), প্রায় ১০ শতাংশ সুরভিত ইথারীয় বা সুগন্ধি তেল, ৩০ শতাংশ পর্যন্ত মোম এবং ৫ শতাংশ পরাগ থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল থেকে সংগৃহীত আমাদের নমুনাগুলি প্রমাণ করে যে, রাসায়নিক সংস্থিতি, বর্ণসুষমা ও সৌরভের দিক থেকে সেগুলিতে তারতম্য আছে। মৌ-আঠা বেশ জটিল পদার্থ। তাতে

প্রোটিন ও ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ (লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ভ্যানাডিয়াম ও স্ট্রনসিয়াম) থাকে। বর্ণালী বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এটি উচ্চ আণবিক জৈব যৌগিক যাতে আছে খনিজ ও উদ্বায়ী এস্টার এবং তা খুব সম্ভবতঃ ফাইটন সাইড-এর শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে কাজ করে।

লোকজ ভেষজবিদ্যায় মৌ-আঠাকে যক্ষ্মা নিরোধক গুণ সম্পন্ন বলে ধারণা করা হত। আমাদের অনুরোধে মস্কো যক্ষ্মা ইনস্টিটিউট মৌ-আঠার জীবাণু-বিনাশী গুণাগুণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখে। দেখা গিয়েছে যে, মৌ-আঠা যুক্ত জীবাণু পরিপোষণ মাধ্যমে স্থির তাপমাত্রায় যক্ষ্মার ছত্রাক জীবাণু যে রকম দ্রুত বৃদ্ধি পায়, মৌ-আঠাহীন নিয়ন্ত্রণ-নমুনাতেও তা সে রকম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। এবং মজার ব্যাপার হল, স্বল্পমাত্রায় মৌ-আঠাযুক্ত পরিপোষণ মাধ্যমেই তা নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমের তুলনায় অধিকতর ভালো জন্মায়।

বুয়র (Boer) যুদ্ধের সময় ক্ষত নিরাময়ে মৌ-আঠা খুবই কাজ দিয়েছিল বলে জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও ক্ষত নিরাময়ে একইভাবে এর কার্যকারিতা সাফল্যজনকভাবে পরীক্ষিত হলেও ওষুধশিল্পে তা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নি।

পায়ের বা হাতের কড়া (corn) সারানোর কাজে লোকজ ভেষজবিদ্যায় মৌ-আঠার ব্যবহার বহুল পরিচিত ছিল। এক টুকরো মৌ-আঠা তাপে নরম করে কড়ার উপর পাতলা প্রলেপ দিয়ে তারপর তা আলতো করে বেঁধে দেওয়া হতো। মূল সহ কড়া কয়েকদিন পরে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতো।

১৯৫৩ সালে ন. তোপোরোভা ও ক. তোপোরিনা সিদ্ধান্তে আসেন যে, মৌ-আঠার মলম গবাদি পশুর নেক্রোব্যাসিলোসিস নিরাময়ে খুব কাজ দেয়। এমনকি এ ক্ষেত্রে সংক্রমিত অংশের আবরণ ফেলে দিতে হয় না। ১৯৫৫ সালে ক. গাপত্রাখিমানোভা নেক্রোব্যাসিলোসিস রোগে আক্রান্ত খামারের প্রাণীদের চিকিৎসায় এই মলম প্রয়োগ করে সফল হন। ভ্যাজেলিন এবং সূর্যমুখী ও হেনবেইন (henbane) তেল ১:১ ও ১·৫:১ অনুপাতে মিশিয়ে প্রস্তুত মৌ-আঠার এই মলম অন্যান্য ওষুধের তুলনায় অধিকতর কার্যকর। এটা যে মৃদু প্রদাহী তা বোঝা যায়। এবং সম্ভবতঃ তা স্বাভাবিক পুষ্টি বিধান করে।

১৯৫৭ সালে ন. প্রোকোপেভিচ্ স্থানিক চেতনানাশক হিসেবে মৌ-আঠার কার্যকারিতার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ দেন। মৌ-আঠার ২৫ শতাংশ দ্রবণের চেতনানাশক শক্তি কোকেন ও প্রোকেইনের তুলনায় বেশি। মুখবিবরতত্ত্ববিদ (stomatologist) ও দন্তচিকিৎসকরা অবশ্য এটা ব্যবহার না করলেও আমরা নিজেরা পাইয়োরিয়া ও প্যারাডনটোটিস-এর মত দন্তরোগের চিকিৎসায় চূর্ণিত উঁচুমানের মৌ-আঠা থেকে তৈরী ১০ শতাংশ স্পিরিট নির্যাস ব্যবহার করে ভালো ফল পেয়েছি। গলদাহ, টনসিল প্রদাহ ইত্যাদি রোগেও তা উপকার দিয়েছে।

১৯৫৯ সালে চিকিৎসা বিষয়ক মৌচাষের উপর অনুষ্ঠিত প্রথম মস্কো আঞ্চলিক সম্মেলনে গ. মুখামেদিয়ারভ মৌ-আঠার চুলকানি-বিনাশী গুণাগুণ বর্ণনা করেন। তবে আমাদের নিজস্ব নিদানিক পর্যবেক্ষণ এবং যুগোশ্লাভিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, মৌ-আঠা দিয়ে তৈরী বিভিন্ন রকমের ওষুধ (মলম, মৌ-আঠার দুধ ইত্যাদি) তা রোগের সাময়িক উপশম করলেও পুরোপুরি সারায় না।

কিয়েভ বিকিরণ চিকিৎসা ও টিউমার-তত্ত্ব গবেষণা ইনস্টিটিউটের খ্মেলেভ্স্কায়া ও অন্যান্যরা এক বিবরণীতে জানান, বিকিরণ চিকিৎসা করতে হবে — এমন রোগীদের ত্বকে মৌ-আঠার মলম লাগানো হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ত্বকের বিকিরণগত প্রতিক্রিয়া রোধ করে। দেখা যাচ্ছে, বিকিরণ প্রতিক্রিয়া কমানোর ক্ষেত্রে মৌ-আঠার মলমের কার্যকারিতা থাকায় এ ধরনের চিকিৎসায় সময় লাগবে কম এবং ধারাবাহিকতায় কোন রকম বিরতি ছাড়াই প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিকিরণ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। লেখকরা তাই সাধারণভাবে বিকিরণ প্রতিক্রিয়া রোধ ও বিকিরণ-ক্ষত চিকিৎসায় মলম প্রয়োগের পরামর্শ দেয়ার পক্ষে মত দেন।

ঊর্দ্ধ শ্বাসনালী এবং ফুস্ফুসের রোগের (যেমন ক্লোমনালী প্রদাহ বা ব্রঙকাইটিস ও যক্ষ্মা) ক্ষেত্রে প্রশ্বাসের সাথে মৌ-আঠা গ্রহণ করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। চিকিৎসা খুবই সরল এবং তা ঘরে কিংবা বহিঃরোগী বিভাগে প্রয়োগ করা চলে। শ্বাস নেবার জন্যে ফুটন্ত পানিতে ভর্তি বড় ধাতব গামলার ভেতরে রাখা অ্যালুমিনিয়াম বা এনামেল পাত্রে (৩০০-৪০০ মিলিলিটার) ৬০ গ্রাম মৌ-আঠা এবং ৪০ গ্রাম মোম রাখতে হয়।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ১০ বা ১৫ মিনিট ধরে উক্ত মিশ্রণটি দু'মাস ধরে শ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হয়।

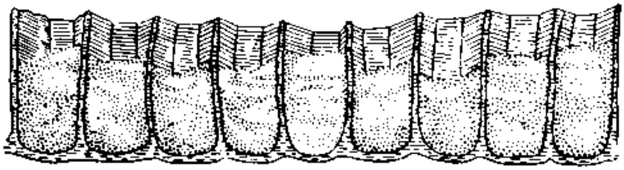
১৯৬৫ সালে বুখারেস্টে মৌচাষের উপর অনুষ্ঠিত বিশতম (জয়ন্তী) আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে দেরেভিচ ও পোপেস্কু গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করে কিছু চমকপ্রদ তথ্য প্রদান করেন। তারা দেখান যে, মৌ-আঠার মলম ও এলকোহল নির্যাস দ্রুত দহন জনিত ক্ষত নিরাময় করে। তারা মনে করেছিলেন, পুরো ফ্ল্যাবোনোইড বর্গ অর্থাৎ গ্যালানজিন সমৃদ্ধ রঞ্জকের (মৌ-আঠার সক্রিয় অংশটি) সংযোজক কোষকলার উপর সংরক্ষণকর ও পুনরোৎপাদন মূলক প্রভাব আছে। অধিবিষ অপসারিত করে নিলে গ্যালানজিন (galangin) ব্যবহার করে রোগ উপশমে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। যে-সব জটিল উপাদানে মৌ-আঠা গঠিত তাদের মধ্যে ইথারীয় তেল-এর ফাইটনসাইডই শুধু সক্রিয়। এই কারণে বায়ুরোধী করে বন্ধ অবস্থায় দীর্ঘদিন মৌ-আঠা মজুত করে রেখে দিলে তার জীবাণুপ্রতিরোধী গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাপ দিলে এর গুণাগুণ বাড়ে। কারণ এর ফলে মোম, রজন, বলসাম ও পরাগের সাথে জৈবিকভাবে যুক্ত জীবাণুপ্রতিরোধী ইথারীয় তেল মুক্ত হয়ে যায় এবং সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই আমরা শ্বাসের মাধ্যমে মৌ-আঠা প্রয়োগকে সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায় বলে মনে করি। এতে মৌ-আঠার ফাইটনসাইড বাষ্পের সাথে জলের ভেতর থেকে উঠে আসে এবং ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে অবিলম্বে তা রক্তস্রোতে মিশে যায়।

অধ্যাপক ব. তোকিন লিখেছেন, কর্মী মৌমাছিরা সাধারণতঃ পরাগরেণু ও সুধা খায়। সে দিক থেকে বলতে গেলে মৌমাছি নিজেই ফুলের সমাহার বা 'ভান্ডার'। ফলতঃ মধুতেও ফাইটনসাইডের গুণাগুণ থাকাই উচিত।

আমাদের মতে এটা মৌ-আঠার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। আমাদের বিশ্বাস, চিকিৎসাবিদ্যার অস্ত্রশালায় এখনও স্থান পায়নি এমন একটি কার্যকর প্রতিকারক অদূর ভবিষ্যতে ওষুধের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। আর সে ওষুধটি হবে মৌচাষের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্যতম মহামূল্যবান সামগ্রী তথা মৌ-আঠা নামে একটি ফাইটনসাইড ওষুধ।

ফুলে ফুলে বিচরণ করার সময় মৌমাছিরা ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বয়ে নিয়ে গর্ভকেশরে পৌঁছে দেয়। এর ফলে পরাগায়ন হয়। পরাগরেণু শুধু গাছগুলোর জন্যেই নয় মৌমাছিদের নিজেদের জন্যও খুব দরকারী। দু'থলি পরাগ সংগ্রহের জন্য একটি সন্ধানী মৌমাছি চার ঘণ্টা পর্যন্ত সময় উড্ডয়নে ব্যয় করে। পরাগ মৌমাছিদের দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের বিকল্পহীন উৎস বলে বসন্তের শুরুতে যে-সব মৌ-বসতিতে পর্যাপ্ত পরাগ থাকে সেগুলোই কেবল বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়।

পেছনের পায়ের 'থলি'গুলো পরাগে পূর্ণ করে মৌমাছি চাকে ফিরে আসে। ফেরার সময় বাতাসে খুব দক্ষতার সাথে তাকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। গ্রীষ্মের কোন চমৎকার দিনে বোঝা সমেত ফিরতি মৌমাছিরা যখন চাকের অবতরণ ক্ষেতে নামে তখন লক্ষ্য করলে ভারী মজার ছবি আপনার চোখে ভেসে উঠবে। তাদের পায়ের রঙ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন কোন ফুলে তারা বসেছিল। মৌমাছির পায়ের রঙ নীল হলে বুঝতে হবে সেটি বুনো ম্যালো কিংবা ভাইপারস বাগ্‌লস ফুলে গিয়েছিল। পরাগ লাল হলে তা সংগৃহীত হয়েছে নাশপাতি, পীচ, কিংবা হর্স চেসনাট গাছের 'ফুল থেকে। পরাগের বোঝা সবুজ হলে বুঝতে হবে মৌমাছিরা লিণ্ডেন, মেপল, অথবা রোয়ান কিংবা শন ফুলে বসেছিল, সোনালী হলুদ হলে বুঝতে হবে গোলাপহ্যাজেল বা গুজবেরি ঝোপের ফুলে না হয় বাকউইট কিংবা অ্যাঞ্জেলিকা ফুলে গিয়েছিল তারা। রক্তবেগুণী পরাগ-বোঝাই মৌমাছিরা নিশ্চয়ই বিচরণ করেছে ক্যাম্পানুলা কিংবা ফ্যাসেলিয়া ফুলে, আর যারা সাদা কিংবা ধূসর পরাগ এনেছে তারা গিয়েছিল আপেল কিংবা রাস্‌পবেরির কাণ্ডে। বাদামী বোঝার অর্থ হল সেগুলো এসেছে সাঁফোয়াঁ (sain foin), সাদা কিংবা লাল ক্লোভার অথবা মেঠো কর্ণফ্লাওয়ারের ফুল থেকে। সূর্যমুখী কিংবা ড্যানডিলিয়ন ফুলের কমলা রঙের পরাগ-মাখা মৌমাছিগুলো দেখতে ভারী সুন্দর। পরাগের প্রতিটি আণুবীক্ষনিক দানাই পুষ্টিকর ও আরোগ্যকর পদার্থ (পেপটোন, গ্লোবুলিন, অ্যামিনো এসিড, শ্বেতসার-শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ,



চিত্র — ১৭: উপাদানের বিন্যাস প্রদর্শনের জন্য পরাগপূর্ণ কুঠরির প্রস্থচ্ছেদ (দ্বিগুণ বিবর্ধিত)

উৎসেচক (enzyme), খনিজ) এবং ভিটামিন (B_1, B_2, B_6, B_{12}, A, P, E, K,) সমৃদ্ধ পদার্থের একটি জটিল সমাবেশ। কাজেই এই ক্ষুদ্র দানাটিই জীবদেহের জন্য মহামূল্যবান পদার্থের রত্নভাণ্ডার।

মৌমাছি পরাগ দিয়ে মৌরুটি বানায়। সন্ধানী মৌমাছিরা মৌচাকের ভেতরকার কাঠামোগুলোর মাঝখানের মৌ-পরিসরে ঢুকে পরাগের বোঝা চাকের কুঠরিতে নামিয়ে রাখে। অন্য মৌমাছি সেগুলো কুঠরিতে ঠেসে ঢোকানোর সময় আরও কিছু মৌমাছি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উপর মধু ঢালতে থাকে যেন বাতাস ঢুকে তা নষ্ট না হয়ে যায় (চিত্র ১৭ দেখুন)। উৎসেচকের ক্রিয়ার ফলে পরাগরেণুতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মধুর কিছু চিনি ল্যাকটিক এসিডে রূপান্তরিত হয়ে পরাগের অতিপচনশীল উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে সংরক্ষণকর ভূমিকা পালন করে। পরাগ ও মধুর চেয়ে মৌ-রুটি এই অর্থেই পৃথক যে, তা হল ঐ দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘটিত জটিল উৎসেচকগত প্রক্রিয়ার ফল। এতে চিনি, আমিষ, খনিজ ও অন্যান্য উপাদান বিদ্যমান।

চাকে পরাগ না থাকলে রাণী মৌমাছি ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয় এবং গৃহী মৌমাছিরা মোম বানানো, শাবকদের লালন-পালনের জন্য কুঠরি বানানো এবং মধু ও পরাগ জমানোর কাজ থামিয়ে দেয়। হিমেল বসন্তে উইলো, ড্যানডিলিয়ন ও অন্যান্য পরাগময় উদ্ভিদের ফুল ফোটা বন্ধ হয়ে যাবার আগে মৌমাছিরা পরাগ সঞ্চয় করতে না পারলে এবং আগের বছরের পরাগের মজুত একেবারে ফুরিয়ে গেলে শাবকদের বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা হুমকীর সম্মুখীন হতে পারে। সতর্ক মৌমাছি পালকরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, মৌচাকের আশে পাশের এলাকায় কোন পরাগ না পেলে মৌমাছিরা কারখানা এবং গোলাঘর থেকে ময়দা নিয়ে আসে।

১৯৫২ সালে ভ. ভাগানভ জানান যে, এমন অবস্থায় মৌমাছিরা যে হল্দ 'পরাগ' নিয়ে আসে তা পচে যাওয়া গাছের গ্ঁড়ো।

বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ থেকে পাওয়া পরাগ কেবল রঙ, বর্ণাভা (shade) এবং আকারেই ভিন্ন নয়, গঠনেও ভিন্ন। উইলো ও বার্চের পরাগের ব্যাস ৭ মাইক্রন অথচ কুমড়ো পরিবারের পরাগ রেণ্রে ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইক্রন। রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে আমিষ, চর্বি, শ্বেতসার-শর্করা খাদ্যপ্রাণ, খনিজ ও উৎসেচকের আপেক্ষিক পরিমাণগত পার্থক্যও সে-সবের রয়েছে। স. লেবেদ্ভের মতে (১৯৪৯) প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন পরাগ থেকে পাওয়া যেতে পারে। লিলি ও হল্দ অ্যাকাসিয়ার পরাগ দানায় গাজরের (ক্যারোটিনের ম্ল উৎস) তুলনায় ২০ গ্ণ বেশি ক্যারোটিন থাকে। লিলি ও অ্যাকাসিয়া থেকে খ্ব সহজেই উপ ভিটামিন A সংগ্রহ করা যেতে পারে (কোন প্রাথমিক প্রক্রিয়া ছাড়াই এটা করা সম্ভব)। হিসাব করে দেখা গেছে, ১০০টি লিলি ফুল থেকে প্রায় ১০ গ্রাম পরাগ পাওয়া যায় এবং এক হেক্টর জমি থেকে ১০০ গ্রাম ক্যারোটিন পাওয়া যাবে।

পরাগে অস্বাভাবিক পরিমাণে র্টিন বিদ্যমান, বিশেষ করে বাকউইট পরাগে শতকরা ১৭ মিলিগ্রাম র্টিন থাকে।

পরাগের ম্ল্যবান ভিটামিন ও হরমোন আছে বলে চিকিৎসা ও রোগ নিবারক উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার য্ক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়েছে। লোকজ ভেষজবিদ্যায় পরাগকে সর্বরোগহর ওষ্ধ বলে মনে করা হত। কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় আমরা নিজেরাই এটা নিদানিকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় মধ্ মিশ্রিত পরাগ (১:১) বিশেষভাবে কার্যকর। মধ্ ও পরাগের মিশ্রণ যে আরও কয়েক রকম রোগ, বিশেষ করে স্নায়্তন্ত্র ও হরমোন সংক্রান্ত রোগে কার্যকর সে ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫৭ সালে চাউভিন ও অন্যান্যরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, খাদ্যের সঙ্গে ইঁদ্রকে সামান্য পরিমাণ পরাগ দেওয়া হলে তা অন্য ইঁদ্রের (যাদেরকে পরাগ দেওয়া হয়নি) তুলনায় দ্রত বেড়ে ওঠে এবং তার ওজনও ব্দ্ধি পায়। এমনকি তা থেকে খাদ্যপ্রাণ অপসারিত করার পরও তার হিতকর প্রভাব থেকে যায়। যে-সব ইঁদ্রকে পরাগ খেতে দেওয়া হয়েছিল তাদের মলে কোন রকম অণ্জীব (micro-organism)

পাওয়া যায় নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, পরাগের জীবাণু প্রতিরোধী কার্যকারিতা রয়েছে।

পরাগ অন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনে (বিশেষ করে মলাশয়-প্রদাহ কিংবা দীর্ঘমেয়াদী-কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে), ক্ষুধা বাড়ায় এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

অনিষ্টকর রক্তশূন্যতায় পরাগ উপকারে আসে। তা রক্তের চাপ কমায় এবং রক্তের মধ্যেকার রক্তকণিকা ও লোহিত কণিকার বৃদ্ধি ঘটায়।

১৯৬৫ সালে রুমানীয় শ্রমিক ম. জালোমিসিয়ানু, ক. ক্রিস্তা, ক. বুতিয়ানু ও ল. ওনিতু জানান যে, মধুর সাথে পরাগ মিশিয়ে দৈনিক ২৫ গ্রামের এক মাত্রা করে খেলে তাতে যকৃতের রোগে খুব কাজ দেয় এরং কোন রকম এলার্জি দেখা দেয় না।

১৯৫৯ সালে সুইডেনের গবেষক ই. এ. আপমার্ক (আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং জি. জনসন (মূত্রতত্ত্ব বিভাগ, লুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়) যে গবেষণা কর্ম প্রকাশ করেন তাতে দেখানো হয় যে, পরাগ প্রোস্টেট গ্রন্থির (prostate gland) উপকারে আসে। প্রস্টেট ও এডেনোমাস বা গ্রন্থিয়োমার রোগের প্রতিকারক হিসেবে সুইডেনে পরাগের তৈরী ওষুধ (zernilton) বিক্রি হয়ে থাকে। প্রোস্টেট প্রদাহ, প্রোস্টেটের গ্রন্থিয়োমা নিরোধ করার জন্যে অ্যালিন কাইলাস পঞ্চাশোর্ধ সবাইকে দৈনিক ১৫ গ্রাম পরাগ খাবার পরামর্শ দেন।

পরাগ জৈবিক উদ্দীপক হিসেবেও কাজ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য অধ্যাপক ন. ৎসিৎসিন্ বিশ্বাস করতেন যে, মধুতে যে নবজীবনীশক্তি আছে বলে ধারণা করা হয় তার মূলে রয়েছে মধুতে পরাগের বিদ্যমানতা।

গাছপালা প্রচুর পরিমাণ পরাগ উৎপন্ন করে থাকে। একটি মাত্র আপেল ফুলেই থাকে প্রায় ১০০ ০০০ রেণু, জুনিপার ফুলে ৪০০ ০০০, হর্ণবিম ক্যাটকিন-এ ১২০০০০০, পনীফুলে ৩৬০০০০০, হ্যাজেল ক্যাটকিন-এ (বা 'ভেড়ার লেজ' ফুল) ৪০০০০০০ এবং একটি বার্চ ক্যাটকিন-এ ৬০০০০০০ রেণু থাকে। ওক, এল্‌ম্, পাইন, ফির, ও এল্‌ডার থেকেও প্রচুর পরাগ পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে পাইন বনের বাতাস সত্যিকার অর্থেই পরাগরেণুতে ভরে থাকে। বেশির ভাগ রেণুই

14*

পড়ে থাকে মাটিতে, কিছু বা প্রবাহিত বাতাসের সাথে ২৫০০ মিটার পর্যন্ত উঁচুতে ভাসে এবং ৪৫০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে যায়।

একগোছা ভারতীয় কর্ণ প্রায় দুই কোটি পরাগরেণু ছড়ায়। এর মধ্যে একটি পুষ্পমঞ্জরী বা শিষ পরাগায়িত করতে দরকার হয় মাত্র ৮০০ কিংবা বড়জোড় ১০০০ পরাগ রেণু। বস্তুতঃ গাছপালা, পরাগায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরাগের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি পরাগ উৎপন্ন করে থাকে।

আমাদের হিসাবে কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই একটিমাত্র গ্রীষ্মেই মৌমাছিরা দুই লক্ষ টন পরাগ সংগ্রহ করে থাকে। এটা উৎপাদিত পরাগের অত্যল্প পরিমাণ মাত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর আমাদের বনাঞ্চলে, মাঠে, তৃণভূমিতে আর উদ্যানে পুষ্টি আর রোগবারক গুণাগুণে সমৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ টন পরাগের অপচয় হয়ে থাকে।

মৌমাছিরাই পরাগের মূল সংগ্রাহক বলে ফ. জুর্বিৎস্কি (১৯৪০) তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে পরাগ অপসারণের একটি ফাঁদের পরিকল্পনা হাজির করেছেন। ফাঁদটা খুবই সাধারণ। এতে উল্লম্বভাবে পিনগাঁথা একটা বোর্ড থাকে, তা মৌচাকের প্রবেশ দ্বারে পেতে রাখা হয়। যে কোন মৌমাছি পালক এটা তৈরী করতে পারেন। এই ফাঁদের ভেতর দিয়ে মৌমাছিরা সহজেই চাকে ঢুকতে পারলেও পেছনের পায়ের পরাগ ফাঁদে পড়ে যায়। পরাগ সংগ্রহের এই পদ্ধতি খুবই সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছিল আর ধারণা করা হয়েছিল যে, এভাবে পরাগ সংগ্রহ করতে পারলে তা মানুষের জন্য অমূল্য খাদ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। বিরাট বিরাট মৌমাছি শালার উৎসাহী মালিকরা দৈনিক ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম এবং প্রতি মৌসুমে ১০ থেকে ২০ কিলোগ্রাম পরাগ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু ব্যবস্থাটি তেমন জনপ্রিয়তা পেল না। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই রীতিতে মধুর উৎপাদন যথেষ্ট কমে যায়। এ ছাড়াও এই পন্থায় ভিটামিন কারখানা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ পরাগ সংগ্রহ করাও অসম্ভব ছিল। তা ছাড়া এভাবে সংগৃহীত পরাগ গবেষণা কাজে কিংবা চিকিৎসা সংক্রান্ত বাস্তব কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হত না কারণ রাসায়নিক ও জীবজ সংস্থিতির দিক থেকে এসব ক্ষেত্রে একই রকমের পরাগ

দরকার পড়ে। অথচ বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত পরাগের আরোগ্যকর গুণাগুণ সমপর্যায়ের কিংবা এক রকম হয় না। এখানে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, মৌমাছিরা প্রায়ই নানারকম বিষাক্ত পরাগও মৌচাকে নিয়ে আসে (মেকি হেলিবোর, বুনো রোজমেরী, মংকস্‌হুড, লার্কস্পার, রোডোডেনড্রন ইত্যাদি উদ্ভিদ থেকে)।

কার্ল জোহানসন (১৯৫৫) জানিয়েছেন যে, — ১৭·৫° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করে রাখা হলে মৌমাছি-সংগৃহীত পরাগের ৪৬ শতাংশের অংকুরোদ্গম ক্ষমতা ৯ মাস পর্যন্ত বজায় থাকে; পক্ষান্তরে কায়িকভাবে সংগৃহীত ৭১ শতাংশ পরাগের (একইভাবে সংরক্ষিত) সেই ক্ষমতা বজায় থাকে।

প. লেবেদেভ ও ন. কিরিয়েভ (১৯৫৯) প্রমাণ করেছেন যে, মৌমাছি-আহরিত পরাগ তাদের থলের ভেতরে সুধা ও লালায় কিছুটা আর্দ্র হয়ে যায় বলে তা অংকুরোদ্গম ক্ষমতা হারায়। তবে মৌমাছির দেহের উপরিভাগ থেকে সংগৃহীত পরাগ আর্দ্র হয় না বলে তা কর্মক্ষম থাকে।

কাজেই কায়িক পদ্ধতিতে পরাগ সংগ্রহের রীতি আবার চালু করতেই হবে। ভেষজ গুল্ম সংগ্রহ করার মত করে এটাও সংগ্রহ করার কাজ সংগঠিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষাভ্রমণ কিংবা আমোদ ভ্রমণে কোথাও গেলে বিপুল পরিমাণ পরাগ সংগ্রহ করতে পারে। পুষ্পিত ঝোপঝাড় বা ভুট্টোর গুচ্ছ ঝেড়ে ঝেড়ে কাচের বয়মে পরাগ সংগ্রহ করা যায়। পরিস্কার কাগজ কিংবা শুকনো পরিস্কার খবরের কাগজের উপর ফুলে ভরা কোন শাখা ঝাঁকিয়ে নিলে প্রচুর পরিমাণ পরাগরেণু পাওয়া যায়।

আমরা একটা কৌশল উদ্ভাবন করেছি, তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। পাঁচটা সরু লাঠি (বা বেত) এক সাথে ছিপের মত করে বেঁধে নিয়ে তারপর তার আগায় ডাল কাটা ছুরি বেঁধে নিয়ে কোটার মত বানাতে হবে। তাহলে ১০-১১ মিটার উঁচুতে অবস্থিত ফুলের নাগাল পাওয়া যাবে। পরাগ সংগ্রহের জন্য গাছ বা ঝোপের নীচে মাটিতে একটা বড় পরিস্কার প্রসারিত কাগজ বা চাদর বিছিয়ে দিলে ফুল পাড়ার সময় তা থেকে ঝরে পড়া পরাগ সংগ্রহ করা যায়। ফুলগুলো একটা থলেয় (সুতি কাপড়ের হলে ভাল হয়) ভরে দু'তিন দিন ঘরের ভেতরে শুকোতে দিতে হবে যেন তা থেকে পরাগ ঝেড়ে নেওয়া যায়।

এভাবে কায়িক পদ্ধতিতে এক জাতের উদ্ভিদ থেকে প্রচুর পরিমাণ পরাগ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

রুমানীয় চিকিৎসক ও মৌমাছিপালক ক. রোজেনথাল (১৯৬৫) মনে করেন, কায়িক পন্হায় পরাগ সংগ্রহ করাটা খুবই জরুরী ব্যাপার। কারণ এর জীবজ গুরুত্ব অমূল্য এবং মৌমাছি পালনে তা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে পারে। আরও অনেক কর্মীও লক্ষ্য করেছেন যে, মৌমাছি-সংগৃহীত পরাগের চেয়ে হাতে সংগৃহীত পরাগের সুনির্দিষ্ট শ্রেষ্ঠতা আছে।

রাণীভোগ বা রাজসিক জেলি

অ্যারিস্টটলের কাল থেকেই গবেষকরা উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করছেন কেন অন্য যে কোন মৌম্যাছির মত সাধারণ ডিম থেকে জন্ম নিলেও রাণী মৌমাছি কর্মী মৌমাছির তুলনায় দ্বিগুণ বড় ও দ্বিগুণ ভারী হয়ে থাকে, কেন সে এত বেশি সংখ্যায় ডিম পাড়ে, তার নিজের সন্তান কর্মী মৌমাছিরা ৩০-৩৫ দিন পর মারা গেলেও কি ভাবে সে ছয় বছর পর্যন্ত বাঁচে। এ রহস্যের নিরসনে রসায়ন বিজ্ঞান আমাদের সহায় হয়েছে।

যে ডিমটি ফুটিয়ে রাণী মৌমাছির জন্ম দেওয়া হবে বলে ঠিক হয় সেটিকে সেবিকা মৌমাছিরা চিনাবাদাম আকৃতির একটি বিশেষ খোপে বা 'জরায়ু' তে রাখে এবং রাজসিক জেলি নামে বিশেষ এক রকম খাবার খাওয়ায়। এই সময় জরায়ুটি মোমের তৈরী ক্ষুদে পিপার মত দেখা যায় এবং তার মধ্যে শূককীটটি সত্যিকার অর্থেই ননীর মত ঘন, দুধের মত সাদা (মুক্তোর মত বর্ণসুষমাময়) জেলি জাতীয় পদার্থে ভাসতে থাকে। এই পদার্থটিই আসলে রাজসিক জেলি (royal jelly)। কোন কোন দেশে একে রাণীভোগও (queen jelly) বলা হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক রাজসিক জেলিতে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত আমিষ, ১০ থেকে ১৭ শতাংশ শর্করা, ৫·৫ শতাংশ পর্যন্ত চর্বি, ১ শতাংশের উপরে খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এর পুষ্টিকরতা বোঝার জন্যে এখানে শুধু বলতে পারি যে, গরুর দুধে ৩·৩ শতাংশ আমিষ, ৪ শতাংশ চর্বি ও ৪·৬ শতাংশ শর্করা রয়েছে। রাজসিক জেলিতে এ ছাড়াও ভিটামিন B_1, B_2, B_3, B_6, Bc, B_{12}, PP ও H রয়েছে। তবে ভিটামিন C, A

(ক্যারোটিন) বা D-এর পরিমাণ খুবই সামান্য (কোন কোন গবেষকের মতে আদৌ নেই)।

রাজসিক জেলিতে উর্বরতা বা প্রজননক্ষমতা উদ্দীপক ভিটামিন E থাকে। কর্মী মৌমাছির শূককীটকে যে জেলি খাওয়ানো হয় তাতে স্পষ্টতই ভিটামিন A নেই। ঐ জেলি ইঁদুরকে খাইয়ে দেখা গেছে যে সেগুলো বন্ধ্যা হয়েছে (১৯৩৯ সালে জিলের পরীক্ষায় তা দেখানো হয়েছে)। কর্মী ও পুরুষ মৌমাছিকে যে জেলি খাওয়ানো হয় তাতে রাজসিক জেলির অনুরূপ সব পদার্থই থাকে, তবে পরিমাণে কম।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে-সব প্রাণীকে সামান্য পরিমাণ রাজসিক জেলি খাওয়ান হয় তাদের আয়ুষ্কাল এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায়। এটা খেলে বাচ্চা মুরগী ডিম বেশি পাড়ে এবং বুড়ো মুরগী আবারও ডিম পাড়া শুরু করে।

১৯৩৯ সালে হেনরী হেল দেখিয়েছেন যে, রাজসিক জেলিতে যৌন উদ্দীপক হরমোন (gonadotropic hormone) আছে। স্ত্রী ইঁদুরকে ত্বকনিম্নে ইনজেকশন দিয়ে রাজসিক জেলি প্রয়োগ করা হলে তার ওজন বাড়ে এবং গর্ভাশয়ের কোষসমূহের তৎপরতা কয়েকদিনের মধ্যেই বেড়ে যায়। একসঙ্গে বেশি পরিমাণ রাজসিক জেলি সংগ্রহ করা কঠিন। কারণ বিশেষ বিশেষ অবস্থাতেই শুধু মৌমাছিরা রাণীর জন্য বেশি করে খোপ বানায়। বসতি রাণীবিহীন হয়ে পড়লে কিংবা রাণী বুড়িয়ে গেলে তেমন পরিস্থিতি হয়। বেশি পরিমাণে রাজসিক জেলি পেতে হলে চাক থেকে রাণীকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর তখনই মৌমাছিরা রাণীর খোপ তৈরিতে লেগে যাবে (কখনও কখনো একশটি পর্যন্ত)।

বেশি করে জেলি সংগ্রহের জন্য আমরা একটি বহনযোগ্য বাক্স ব্যবহার করতে বলি। জেলি নিষ্কাশন, সংরক্ষণ ও গবেষণাগারে তা দ্রুত প্রেরণের মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তাতে রয়েছে। কাজের টেবিল হিসেবেও তা ব্যবহার করা চলে। সংগ্রাহক ও মৌমাছিপালক সাবান পানিতে হাত ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার ওভার-অল পরে মাথায় টুপি বা তৃণটুপি লাগিয়ে মূল চাক থেকে রাণীখোপ সমেত কাঠামোটি নিয়ে আসবেন। তারপর সেটা স্তম্ভ বা বেদীর উপর রেখে দরকারী রাণী-খোপগুলো ছোট ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে সুবিধামত একটা পাত্রে রাখতে হবে। তারপর কাঠামোটি আবার চাকে রেখে আসতে হবে। সংগৃহীত

কোষগুলো এরপর শল্যছুরি (scalpel) দিয়ে দৈর্ঘ্য বরাবর কেটে তা থেকে রাজসিক জেলি কাঁচের চেপ্টা চামচে করে তুলে নিয়ে চওড়ামুখো বয়মে রাখতে হবে। বয়মটির দশভাগের নয়ভাগ ভরে গেলে বাকি জায়গাটুকুতে সুস্থিতিকারক (stabilizer, ৪০ শতাংশ স্পিরিট) ঢেলে বোতলের মুখ ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করতে হবে। এরপর বয়মের মুখ মোম বা গালাদিয়ে ভালো করে বন্ধ করে বোতলের গায়ে সংগ্রহের তারিখ ও সংগ্রাহকের নাম লেখা লেবেল আঁটা দরকার। তারপর তা কাগজের মোড়ক জড়িয়ে বিশেষ আধারে রেখে দিতে হবে।

কোষের মধ্যেকার শূককীটগুলো চিমটা দিয়ে বের করে নিয়ে সুস্থিতিকারক ভরা পাত্রে রাখলে জেলিগুলো তলায় গিয়ে জমবে। এই জেলি অন্য একটা বয়মে রাখতে হবে। আর শূককীটগুলোকে পোর্সেলিন হামানে পিষে নিয়ে আলাদা করে সুস্থিতিকারক দেওয়া আর একটা পাত্রে তুলে রাখতে হবে। এটা প্রসাধন সামগ্রী তৈরীতে কাজে লাগে। খোপ থেকে সবটুকু রাজসিক জেলি যাতে তুলে নেওয়া যায় সে জন্যে খোপের ভেতরটা ব্রাশ দিয়ে পুরোপুরি পরিস্কার করে নিয়ে তারপর তা একটা মাপ গ্লাসে সুস্থিতিকারক দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে (উপরে বর্ণিত সরঞ্জাম ছাড়াও বহনযোগ্য বাক্সটিতে একটি অ্যালকোহল ল্যাম্প, দেশলাই, নোটবই ও পেন্সিল থাকে)।

উল্লিখিত পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে জেলি সহ খোপ বিশেষভাবে মোড়কবদ্ধ করে সরাসরি জেলি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

বেড়ে ওঠার প্রথম তিনটি দিনে পুরুষ মৌমাছির শূককীটগুলোও আক্ষরিক অর্থে 'পুংজেলিতে' ভাসে। পুরুষ মৌমাছির শূককীট থেকে যে নির্যাস আমরা পেয়েছি তা জৈব-উদ্দীপক এবং তাতে কিছু সুনির্দিষ্ট নিরাময়গুণ আছে। এর ভাইরাস অপরিবর্তনশীল ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধী গুণাগুণ রাজসিক জেলির তুলনায় কম নয়।

রাজসিক জেলি নিয়ে পরীক্ষা এবং হৃদরক্তসংবহনতন্ত্র ও পাকান্ত্রিক নালীর রোগের চিকিৎসায় তার ব্যবহারের উপর বহু গবেষণা হয়েছে (যক্ষ্মা, ব্রুসেলোসিস, সন্ধি প্রদাহ ইত্যাদি রোগে)। এটাকে ধন্বন্তরী বলে ভাবা হতো। সাম্প্রতিককালে এমন বহু প্রবন্ধে রাজসিক জেলিতে অস্বাভাবিক রকম ও একেবারে অনাবিস্কৃত সব গুণাগুণ আরোপ করা

হচ্ছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী ও নিদানিক কাজের কাছে ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে অক্ষম এইসব গবেষকদের অতি উৎসাহ হার মানতে বাধ্য হচ্ছে।

অধ্যাপক পেইকো পিচেভের তত্ত্বাবধানে প্লভদিভ উচ্চতর চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের ভেষজবিজ্ঞান ও জীবাণুতত্ত্ব বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিভিন্ন ঘনত্বে রাজসিক জেলির বেশ স্থায়ী জীবাণুমুক্ত জলীয় দ্রবণ পাওয়া গেছে (নির্যাসকে ফুটিয়ে নির্বীজিত করা হয় নি কারণ ফুটানো হলে জেলির জীবাণু বিনাশী ও অন্যান্য গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়)।

রয়াল জেলি এবং পুরুষ মৌমাছির শুককীট ও মৌ-আঠার নির্যাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধী গুণাগুণ রয়েছে। ভাইরাসতত্ত্ববিদ আ. দেরেভিচ ও আ. পেত্রেসকু জেলির অ্যালকোহলীয় নির্যাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা নিবারণী প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাদের কাজে (অণুজীব গোত্র ও ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু ব্যবহার করে) দেখা গেছে যে, নির্যাসটির ভাইরাসবিনাশী গুণ প্রাকৃতিক রাজসিক জেলিতেই রয়েছে, সুস্থিতিকারকে (৪০ শতাংশ অ্যালকোহল) নয়। তারা মুরগীর ভ্রূণের অ্যাল্লানটয়েস ভ্রূণাঙ্গে এক মাত্রা পরিমাণ জীবাণু ও ২ মিলিগ্রাম রাজসিক জেলির জলীয় নির্যাস অনুপ্রবিষ্ট করেন। জীবাণুর তিনটি পথে একবারও তা পাওয়া যায় নি। ভ্রূণের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাবও লক্ষ্য করা হয় নি এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণ-প্রাণীর মতো একই সময়ে ফুটে বেরিয়েছে।

আমরা নিজেরাই ইনফ্লুয়েঞ্জার ক্ষেত্রে জেলির অ্যালকোহল নির্যাসের রোগ নিবারক ও ভেষজ প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছি। (১৮ গ্রাম পরিমাণ ৪০ শতাংশ অ্যালকোহলে ২ গ্রাম জেলি মিশিয়ে প্রস্তুত মিশ্রতরল দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায়। স্পিরিট যে কেবল জেলির অস্থায়ী উপাদানগুলি সুস্থিত করে তা নয়, জিহবার নীচে, মুখে বা নাকে এই নির্যাস দেওয়া হলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সাহায্যে তা দ্রুত পরিশোষিত হয়)। আমরা দেখেছি নাকের ঝিল্লীতে এই মিশ্রিত তরলের প্রলেপ দিলে এবং দৈনিক ২০ ফোঁটা করে জিহবার নীচে লাগালে (কিংবা কুলকুচা করলে) ইনফ্লুয়েঞ্জা রোধ করা যায়। এই রোগের চিকিৎসা

হিসাবে পদ্ধতিটি দৈনিক তিন বেলা করে (সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা) এক বা দু'দিন চালিয়ে যেতে হবে।

রাজসিক জেলির জটিল রাসায়নিক গঠন এখনও পুরোপুরি সমীক্ষা করে দেখা যায় নি। তবে এর জৈব উদ্দীপক গুণাবলী ব্যবহার করে ওষুধশিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে। এতে রক্তনালী প্রশস্ত করার মত প্রয়োজনীয় অ্যাসিটিলকোলাইন থাকায় উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় তা ব্যবহৃত হয়।

ফরাসী ডাক্তার ডেস্ট্রেম (১৯৫৬) রাজসিক জেলি দিয়ে ৬০ থেকে ৮৯ বছরের ১৩৪ জন রোগীর চিকিৎসার ফলাফল বর্ণনা করেছেন। রোগীদের ৬০ শতাংশের ক্ষেত্রেই রাজসিক জেলির অন্তঃপেশী ইনজেকশন (২০ মিলিগ্রাম) কার্যকরী হয়েছিল। তাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বাড়ে। তাদের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং মেজাজ উৎফুল্ল ও কর্ম-তৎপর হয়ে ওঠে।

ডাক্তার রবার্টো জেলিন (আর্জেন্টিনা) লেখকের কাছে ব্যক্তিগত চিঠিতে রাজসিক জেলির সাহায্যে এক মহিলার অন্তঃধমনীপ্রদাহ, অবলিটেরান, নালিকা-গহ্বরের বদ্ধতা, রক্তনালী অবরুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি রোগ সারাবার চমকপ্রদ ঘটনা লিখে জানান: 'চিকিৎসকরা তাঁর ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিলেন... আশংকা করা হচ্ছিল তার পায়ে গ্যাংগ্রীন শুরু হয়ে যাবে। তাঁর রসায়নবিদ পুত্র শেষ উপায় হিসেবে আমাকে একটু রাজসিক জেলির ব্যবস্থা করতে বলল। এটা গত বছরের শেষ দিকের ঘটনা। শেষ পর্যন্ত কোন গ্যাংগ্রীন হয় নি আর এখন তিনি খুব ভালই আছেন।' জেলি যে মহিলার উপবৃক্ক গ্রন্থিগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অন্তঃধমনী প্রদাহের সময় এই গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রেনালিন নিঃসৃত হয়ে থাকে।

জোসেফ মাতুজিউস্কি (১৯৬৫) মনে করেন যে, রাজসিক জেলি বিপাক স্বাভাবিক করে, প্রস্রাববর্ধনে সাহায্য করে, মেদস্থূলতা ও কৃশতা-প্রাপ্তি রোধ করায় কাজে লাগে, সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, অ্যাড্রেনোক্রিন গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ধমনীস্থূলতা ও করোনারী ঘাটতিতে উপকারে আসে। চাউভিন, কিউরিউতি প্রমুখ স্থির নির্ণয় করেছেন যে, এটি একটি টনিক যা শক্তি ফিরিয়ে আনে, অরুচি দূর করে এবং ক্ষুধা বাড়ায়।

১৯৬৭ সালে অধ্যাপক পেইচেভ ও তার সহকর্মীরা ২৩ জন

স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ লোকের উপর বুলগেরীয়ার কোচো সুভেতার হোমে এক পর্যবেক্ষণ চালান। এদের মধ্যে ছিল ৬০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী দশ জন, ৭০ থেকে ৭৯ এর মধ্যে ছয় জন এবং ৮০ থেকে ৯০-এর মধ্যে সাতজন। তারা দেখান যে, রাজসিক জেলি, মধু ও পরাগের সম্মিলিত ব্যবহারের উদ্দীপক প্রভাব আছে। এতে বৃদ্ধরা ভালো বোধ করে, তাদের ক্ষুধা ও ঘুম বাড়ে, হৃদপিন্ডের চারিদিকে ব্যথা কমে যায়, প্রস্রাব ভালো হয়, কোলেস্টেরল উপাদান ও রক্তচাপ কমে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ও যৌন ক্রিয়াকলাপ সহজ হয়ে আসে।

কোন কোন দেশে ত্বক নিম্নে কিংবা অন্তঃপেশী ইনজেকশনের মাধ্যমে জেলি দেওয়া হয় কিংবা তা মধু ও পরাগের সাথে মিলিয়ে খেতে দেওয়া হয়। আমরা সামান্য মধু ও জেলি, কিংবা মধু, পরাগ ও জেলি মুখে গ্রহণ করা সমর্থন করি না। কারণ, আন্ত্রিক রস রাজসিক জেলির রোগ প্রতিকারক গুণাবলী নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তবে আহারের ১৫ মিনিট আগে এর আধা গ্লাসে ক্ষারীয় দ্রবণ (আধা গ্লাস সেদ্ধ জলে এক মাঝারি চামচ সোডা) পান করা যেতে পারে।

কিছুদিন থেকে জিহ্বার নীচে বেশ সাফল্যজনকভাবে রাজসিক জেলি প্রয়োগ করা হচ্ছে। রোগী প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাজসিক জেলি একটি কাঁচের চামচে করে জিহ্বার নীচে রাখেন (কিংবা মিশ্রিত তরল ফোঁটা ফোঁটা করে জিহ্বার ওপরে দেওয়া যায়)। জিহ্বার নীচের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি তা সাথে সাথে শুষে নেয় এবং পাকস্থলীতে না গিয়ে তা দ্রুত রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। আমরা দেখেছি, বেশি মাত্রায় রাজসিক জেলি (দৈনিক ১০০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম)) এভাবে গ্রহণে উদ্দীপনাকর উপকার পাওয়া যায়। স্বল্পমাত্রা কেবল মানসিকভাবে কার্যকর।

এটা সুস্পষ্ট যে, সব রোগীর জন্য একটি মাত্র ব্যবস্থাপত্র বা চিকিৎসাবিধি দেয়া সঠিক নয়। প্রতিটি রোগীর জন্যেই আলাদা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন করা উচিত। জটিল রোগ, বিশেষ করে বাত রোগ বা সন্ধিপ্রদাহে মৌ-বিষ ও রাজসিক জেলির মিশ্রণের ব্যবস্থাপত্র একটি বিশেষ পথ্যের অংশ হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। একত্রে গ্রহণ করলে তা যেমন ওষুধ হিসেবে কাজ করে তেমনি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর হিতকর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিবিশেষে অনুযায়ী দুটির সঠিক অনুপাত নির্ধারণ করে

প্রয়োগ করতে পারলে অধিকতর ভালো ফল পাওয়া যায়। প্লভদিভের (বুলগেরিয়া) পাভলভ উচ্চতর চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের শারীরবিদ্যা বিভাগে ন. কোশেভের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণভাবে রাজসিক জেলি প্রাণীদের দেহে উচ্চতর স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ উদ্দীপ্ত করে। পক্ষান্তরে, ভেষজ মাত্রায় মৌ-বিষ দেওয়া হলে তা মস্তিষ্কের কর্টেক্স-এর কার্যকারিতায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই মৌবিষ ও রাজসিক জেলি দেবার আগে সেগুলির নানারকম ভেষজ গুণাগুণের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি রোগীর জন্য আলাদা আলাদা করে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী সন্ধিপ্রদাহের ক্ষেত্রে রোগের পুনরাক্রমণ দেখা দিলে রাজসিক জেলি সহযোগে মৌ-বিষ চিকিৎসা চালিয়ে কোন ফল পাওয়া যায় না।

অ্যালার্জি

উপসংহারে আমাকে বলতেই হচ্ছে, কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে মোম, মৌ-আঠা, পরাগ ও রাজসিক জেলি অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। এটা পরাগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গাছ, গুল্ম, ঝোপ-ঝাড় এবং ঘাসের পরাগ যে অ্যালার্জি জনিত সর্দি ও তৃণজ্বর (hay fever) ঘটায় তা বহুকাল ধরে লোকে জেনে আসছে।

মৌ-কল্পরাজ্য

"...দুপুরের অসহ্য গরম যখন আমাদের বাধ্য করল আশ্রয়ের খোঁজ করতে, তখন তিনি (কালিনিচ) আমাদের নিয়ে গেলেন বনের মাঝখানে তাঁর মৌ-খামারে। কালিনিচ খুলে দিলেন একটা ছোট কুঁড়েঘর, ভিতরে ঝুলছে শুকনো খোশবুওয়ালা ভেষজ লতার গুচ্ছ। তাজা খড়ের ওপর আমাদের আরাম করতে দিয়ে তিনি নিজে মাথায় থলের মত কিছু লাগিয়ে, হাতে ছুরি, একটা পাত্র আর একটা ধুমায়িত লাঠি নিয়ে খামারের দিকে গেলেন আমাদের জন্য কিছু মধুকোষ সংগ্রহ করতে। উষ্ণ, স্বচ্ছ মধু ঝর্ণার জলে পরিস্কার করলাম আর তারপর মৌমাছির একঘেঁয়ে শব্দ আর পাতার অবিরাম ধ্বনির প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

— ইভান তুর্গেনেভ

'একজন ক্রীড়াবিদের নক্‌শা'

প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য খামার

সুন্দর সূর্যস্নাত দিনে যারা মৌ-খামারে গেছেন তারাই জানেন ফুল, মধু, মৌমাছির মোম এবং মৌ-আঠার সুগন্ধে ভারী বিশুদ্ধ বাতাসে ফুসফুস ভরে নেওয়ার মধ্যে কি আনন্দ! মৌবাগিচার বাতাস নির্মল ও সতেজ। ফুসফুসে পৌঁছানোর আগে এ বাতাস প্রাকৃতিক কমপ্লেক্‌সের জীবন্ত ল্যাবরেটরিতে পাতার ফিল্টারের ভিতর দিয়ে পার হয়ে আসে। জনপ্রিয় প্রাচীন লোকশ্রুতি আছে যে, সবুজ পাতা ও ফুল বাতাসকে

গুণান্বিত করে। অধ্যাপক ব. প. তোকিন দেখিয়েছেন, যেখানে গাছপালা আছে সেখানে আবহে জীবাণুধ্বংসী উদ্বায়ী পদার্থ (যেগুলোকে তিনি বলেছেন ফাইটনসাইড) নির্গত হতে থাকে। এ ধারায় আরও বলিষ্ঠ মতামত উপস্থিত করেছেন অধ্যাপক ন. খোলোদনি। তাঁর মতে বাতাসে গাছ থেকে যেসব প্রাণজ উদ্বায়ী পদার্থ এসে যুক্ত হচ্ছে এগুলো সব 'আবহজাত খাদ্যপ্রাণ'। ফলে বছরের সেরা সময়ে যে মৌপালক মৌ-খামারে কাজ করেন তিনি শুধু যে নির্মল মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেন তা নয়, সে বাতাস মধুর সৌরভ ও উপরোক্ত ফাইটনসাইড ও 'আবহজাত খাদ্যপ্রাণে' সমৃদ্ধ।

সুশৃঙ্খল মৌ-খামারের শান্ত আবহ তলস্তোয়কে খুবই মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ছোটগল্প 'জমিদারের ভোর'এ এই অনুভূতি খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন তিনি। 'সূর্যালোকিত মৌ-খামারটি খুবই আপন, আরামদায়ক এবং শান্ত, দু'কোণ থেকে বিচ্ছুরিত ঘন ভাঁজওয়ালা চোখ আর মাথাভর্তি সাদাচুল যে বুড়ো মানুষটা তাঁর মনিবকে নিজ বাড়িতে স্বাগত জানানোর জন্যে খালি পায়ে বড় বড় জুতো গলিয়ে ভালোমানুষি আত্মসন্তুষ্টির সাথে হাসিমুখে কলের পুতুলের মত এগিয়ে এল, সে লোকটা এতই সরলহৃদয় ও সদয় যে নেখলিয়ুভ সকালের সকল অপ্রীতিকর ধারণা তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল এবং তার বহুলালিত স্বপ্ন সপুঙ্খ ফিরে এল, তিনি দেখলেন তাঁর সব চাষীই বৃদ্ধ দাত্‌লভের মতই স্বচ্ছল ও সদয়, এবং সবাই তাঁর দিকে খুশিতে ও স্নেহে হাসছে। কারণ তারা সবাই তাদের ধন ও সুখের জন্যে একমাত্র তার কাছেই ঋণী।[৪৩]

বিভিন্ন পেশার বহুলোকের কাছে মৌমাছির চাষ এক মনোগ্রাহী সখ। রুশ অপেরা গায়ক গ. প. কান্দ্রাতিয়েভ, কঠিন স্নায়বিক রোগে ভোগেন। ডাক্তাররা তাঁকে পরামর্শ দিলেন চার মাসের জন্য বিশ্রাম নিতে এবং সেই গ্রীষ্মকালটা মুক্ত বাতাসে কাটাতে। একদিন, মুক্ত অর্থনীতি সমিতির এক সভায়, কান্দ্রাতিয়েভ বসেছিলেন অধ্যাপক আ. ম. বুতলের-ভের পাশে, এবং কথাপ্রসঙ্গে তিনি অধ্যাপককে ডাক্তারের পরামর্শের কথা জানান। বুতলেরভ তাকে বললেন, 'মৌ-পালনের চেয়ে ভাল কী হতে পারে?' এই একটি কথাই কান্দ্রাতিয়েভের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল।

তিনি মৌপালকে রূপান্তরিত হলেন এবং পরে বলেছেন মৌমাছি ব্যতীত জীবন 'লক্ষ্য ও আনন্দবিহীন'।

রাশিয়ার মৌমাছি পালনের ইতিহাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব — ড. লাগিনভ ১৯২৫ সনে লেখেন: 'দীর্ঘকাল মৌ-পালনকারী প্রখ্যাত সব মৌমাছি বিশারদদের সাহচর্যে থাকার সময় প্রায়ই তাদের বলতে শোনা যেত: "মৌ-পালন আমার জীবন সম্পূর্ণ ভরে রেখেছে এবং এটা ছাড়া জীবনটা সত্যই যাপনীয় হয়ে উঠত না"। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কথাটা নিরেট সত্য।'

তিনি আরও বলেছেন মৌপালকরা তাঁদের মধুপানের অভ্যাস ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে স্বাস্থ্যকর কাজের কারণে সাধারণতঃ সুন্দর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের অধিকারী হন।

মৌমাছি পালনের স্বাস্থ্যসম্মত ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু মজাদার তথ্য জোগাড় করেছি। কৃষি সার্ভিসের মৌ-চাষ বিভাগের মাধ্যমে ইউক্রেনের মৌ-পালনের মধ্যে বিতরিত এক প্রশ্নমালার মাধ্যমে জানতে পারি যে, ৩৯০ জন জিজ্ঞাসিতের মধ্যে ২৭৮ জন তাঁদের মৌ-খামারে কাজ করা কালীন সময়ে একদিনের জন্যেও অসুস্থ হননি। অন্য ২২ জনে জানিয়েছেন যে, মৌমাছি নিয়ে কাজ করার আগে তাঁরা বাতে ভুগেছেন, কিন্তু একাজে আসার পর মৌমাছির কামড় খেয়ে তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।

বহুদিনের লোকপ্রিয় ধারণা যে, দীর্ঘ জীবনের জন্যে দৈনিক আহার্যে মধুর অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাঁরা নিয়মিত মধু পান করেন তারা সুপরিণত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচেন। পোলিশ বিজ্ঞানী ও মৌমাছিপালক ভিটভইস্কি তাঁর বই 'মানবদেহে মধুর উপকারী ভূমিকা'য় লেখেন, ৮০ বছর বয়েসী কবি ট্রেমবেস্কির সাথে যখন তাঁর দেখা হয় তিনি ৩০ বছর ধরে সাদামাটা খাবার ও মধুর ওপর নির্ভরশীল। আপাত বয়সকালে এই পণ্ডিত কবির সাথে দেখা হলে তাঁর চেহারা ও অকৃত্রিম উৎফুল্লতা দেখে ভিটভইস্কি অবাক হয়ে যান।

ককেশাস অঞ্চলের খ্যাতনামা শতায়ু ব্যক্তি, মৌখামারকর্মী ছিলেন বা নিজেই মৌমাছি পালন করতেন। আজারবাইজানে ১৩৮ বছর বয়েসী যৌথ খামারী সাফার হোসেন তাঁর দীর্ঘ জীবনের উৎস হিসেবে মধুপানের অভ্যাস ও মৌখামারে কাজের কথাই বলেছেন। ১৫০ বছর

বয়সী মাহমুদ আইভাজভ নিজের মৌ-বাগানে কাজ করেছেন এবং তিনি মনে করেন দীর্ঘায়ুর জন্যে সেরা টনিক হল মুক্ত বায়ুতে কাজ করা। আরেকজন যৌথ-খামারী মৌমাছি বিশেষজ্ঞ, আসাদ আব্বাসভ, শততম জন্মদিন পালনের তিনসপ্তাহ পরে বেশ কয়েক কিলোমিটার হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন আমাদের কাছে পাঠানোর জন্যে একটি 'ফটো' তুলতে।

আমাদের অনুরোধে দাগেস্তানের জনগণের শিল্পী ইউনিসিলাউ মোহাম্মেদ কাইর মাগোমা তাঁর প্রজাতন্ত্রের এমন বহু মৌপালন ও মধু-উৎসাহী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যাঁরা দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। এরকম কয়েকজনের নাম এখানে দিচ্ছি: আইতা হাদ্‌জিয়েভা — ১০০ বছর; আলিখান বোর্তস্‌ভ — ১০১ বছর; দ. বাখমুদোভা — ১০১ বছর; দালগৎ হাসানভ — ১০১ বছর; ইউসুপ হাজামভ — ১০১ বছর; মার্জানাসিয়াৎ ইস্‌পাগিয়েভা — ১০১ বছর; সাঈদ হাসানভ — ১০২ বছর; সুপিয়াৎ মাহমেদোভা — ১০২ বছর; মাইরণ শাবানোভা — ১০৭ বছর; আহমেদ আলিয়েভ — ১০৮ বছর; ওমর আলিয়েভ আগুর আলিল — ১১৮ বছর; আইশাৎ আলতায়েভা — ১২২ বছর; প. হালিতভ — ১২৪ বছর।

আমরা এরকম শতায়ু মৌ-পালক ও মধুপায়ীর অসংখ্য নাম জড়ো করতে পারি আজারবাইজান, জর্জিয়া, ইউক্রেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অংশ থেকে। এটা লেখার সময় ১১০ বছর বয়েসী আজারবাইজানীয় মৌ-পালক পানাখ মামেদ ওয়ালিয়েভ খুবই সক্ষম, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত এবং তাঁর সবকটি দাঁত অটুট রয়েছে।

'ভেবে কৌতুক বোধ করি যে, লোকে কর্মক্ষমতা ও শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে একগাদা টাকা খরচ করে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পথ্যের শরণাপন্ন হয়।' ১৯২৭ সনে একথা বলেছেন ন. ই. বরোবিয়েভ। 'এর চাইতে তাদের চোখ ফেরানো উচিত মৌ-খামারের দিকে; একপাত্র মধু, এক বাটি দুধ, একটুকরো রুটি; রোদ এবং মুক্ত বাতাসে কাজের পরিবেশ বাকিটুকুর দায়িত্ব নেবে।

মৌ-নগর

আমাদের একটি বহু লালিত স্বপ্ন হল বয়স্কদের বিশেষ আবাসস্থান

হিসেবে পল্লী এলাকায় চিত্রার্পিত প্রেক্ষার মৌ-নগর প্রতিষ্ঠা, বা বলা যায় মৌ-কল্পরাজ্য প্রতিষ্ঠা, যেখানে অবসরভোগী নর-নারীরা ক্রনিক ব্যাধি থেকে মুক্ত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সক্রিয় ও সামাজিকভাবে এবং ফলপ্রসূ বার্ধক্য কাটাতে পারবেন।

মৌ-নগর নিছক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা আরোগ্য নিকেতন কিংবা বৃদ্ধাবাস হবে না, যদিও এর আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এ সবের সাথে কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। মূলতঃ এটা হবে উন্নত মানের স্বাস্থ্যাবাস — মৌ-খামার, যেখানে সব ধরনের মৌজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হবে। যে কোন বড় শিল্পনগরী থেকে ৩০-৪০ কিলোমিটার দূরে গাছপালা শোভিত স্থানে এটা তৈরী হবে। (সোভিয়েত ইউনিয়নে) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে স্থাপিত হবে মৌ-নগর। সঙ্গে থাকবে বেশকিছু ছোট আবাসগৃহ, আধুনিক লোকালয় গড়ে তোলার উপযোগী জমি, সুসম্পন্ন রেস্তোঁরা ও খাবার ঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাব, সন্তরণ জলাশয়, ক্রীড়াঙ্গন, এবং বিভিন্ন সামাজিক ভবন ও ব্যবস্থা। এখানে খাবার ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ আরোগ্যনিকেতন থাকবে, কিন্তু আবাসিকরা অস্থায়ী নয় স্থায়ী বাসিন্দা হবেন, এবং দৈনিক তিন থেকে চার ঘণ্টা করে কাজ করবেন।

মৌ-কল্পরাজ্যের হৃৎপিণ্ড বা কেন্দ্র হবে শত সহস্র মৌচাক নিয়ে গঠিত প্রকাণ্ড একটি মৌখামার — আবাসিকদের জীবনে বিশেষ স্থান দখল ক'রে এটিই হবে মুখ্য কেন্দ্র। অবসরের আগে ঝালাইকর, দর্জি, সৈনিক, নাবিক, ডাক্তার, উকিল, অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, পাচক, ময়রা, হিসাবরক্ষক, শিল্পী যে যাই থাকুন — এখানে সবাই মৌমাছি পালন করবেন। অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসাবিদরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বয়োবৃদ্ধদের ওপর প্রতিবেশের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে তাদের বাড়তি ঔৎসুক্য মেটাতে পারবেন।

সব কল্পবাসীর মত আমারও ইচ্ছে করে মৌ-নগরীর জীবন আর কাজের ফিরিস্তি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিতে। একা যারা থাকবে তাদের এক কামরার ঘর দেয়া হবে, বিয়ে করা দম্পতিরা পাবে ছোট দু'কামরাওয়ালা ফ্লাট, কমিউন ব্যবস্থার রাঁধুনী আর পুষ্টি বিশারদের তালিকা মতে যতটা সম্ভব পুষ্টিকর মুখরোচক ও সংগত খাবার দেওয়া রোজ চারবেলা — এই সব।

তবে আমার আকর্ষণ বেশি চিকিৎসামূলক মৌপালনের সমাহার

কিংবা মৌ খামারের দিকে। এটা ভিটামিন মিশানো ও ওষুধ-মধুর একটা বড় ধরনের উৎপাদন কেন্দ্র হতে পারে যা এসব চিকিৎসার সাথে জড়িত সবাইকে সরবরাহ করতে পারে। আমার বিবেচনায় আবাসিক এলাকা, দোকান-পাট, সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছাড়াও মৌ-নগরে থাকবে কারিগরী বিভাগ, ল্যাবেরেটরি, গুদামঘর ইত্যাদির জন্য বাড়তি জায়গা। সমাহারের পণ্যচিহ্ন দেওয়া সবচেয়ে সেরা ও ভেষজ-মধু এখানে তৈরী করে মোড়কে ভরে পাঠানো হবে চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যাবাস, রোগ পরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভেষজ শিল্পে।

মৌমাছিদের জীবন ও স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না করে সমাহার প্রচুর দানাদার কিংবা তরল (তৈরী অ্যাম্পুলে) মৌবিষ সংগ্রহের কাজ সংগঠিত করবে। তাছাড়া সমাহারের মৌমাছিদের যথাযথ দ্রবণ খাইয়ে ভেষজ ও প্রসাধন শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রচুর মোম তৈরী করা যাবে।

সমাহারের পরীক্ষামূলক গবেষণাগারে গবেষণা চালিয়ে উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে মৌমাছিদের মধ্যে সর্বাধিক ভারসাম্য আনা হবে। আর তাদের অ্যালবুমিন ও অন্যান্য প্রোটিনযুক্ত এবং ভিটামিন ও উদ্দীপক সমৃদ্ধ বিশেষ ধরনের খাবার খাইয়ে প্রচুর পরিমাণে রাজসিক জেলি সংগ্রহ করা হবে। ঐ জেলি অ্যাম্পুল ও বড়ি আকারে তৈরী করার সুযোগ-সুবিধাও সমাহারে থাকবে।

মৌ-নগরে ব্যাপকহারে পরাগ (মধুর সাথে মিশিয়ে নতুন ওষুধ পাওয়া যাবে) ও মৌআঠা (নতুন নতুন ভেষজ তৈরীর জন্য) সংগ্রহের কাজও সংগঠিত করা হবে।

জীবন্ত মৌমাছি দিয়ে চিকিৎসা চালানোর জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে সমাহার জীবন্ত মৌমাছি সরবরাহ করবে।

একটা মজার অগ্রগতি হবে যদি ভ্রাম্যমান মৌশালা করা যায় (প্যাভেলিয়ান সমেত, টানা-গাড়ীর মত অনেকটা)। যেখানে সুধাময় উদ্ভিদে ফুল ফুটিয়ে সেখান থেকে মধু সংগ্রহের জন্য কিংবা ক্ষেত ও বাগানে পরাগায়নের জন্য সেটাকে কয়েকদিনের জন্য ঐ সব জায়গায় পাঠানো যাবে।

কল্পরাজ্য? আমার কাছে মোটেও নয়। আর যারা বয়সে আমার চেয়ে বড় তাদের বার্ধক্যের জীবনকে সুখময় করায় এর মূল্য সীমাহীন।

দশম অধ্যায়

যাদুর কুয়ো

মৌমাছির জীবন যেন যাদুর কুয়ো,
যতই তা থেকে নেবেন ততই
তা ভরে উঠবে জলে।
— কার্ল ফন্ ফ্রিশ

প্রাচ্যে একটি উক্তি আছে যার জ্ঞানগর্ভতা ব্যাখ্যার দরকার পড়ে না। কর্মেই মানুষের খ্যাতি নিহিত। পণ্ডিত, দার্শনিক, লেখকদের কথাই ধরুন না — তাঁরা তাদের অমর রচনার মধ্যেই বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমনকি হাজারে হাজারে বছর বেঁচে থাকেন। আমরা, মৌমাছিবিজ্ঞানীরা (apidologist, ল্যাটিন apis — মৌমাছি এবং গ্রীক logos — বিজ্ঞান) এরিস্টটলের রচনা, ভার্জিল ও ওভিদের কাব্য এবং অন্যান্য ধ্রুপদী লেখক ও চিন্তাবিদের কর্মকে মহামূল্যবান মনে করি এবং সে সবের ভেতরে মৌমাছিদের জীবন, আচরণ ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহলজনক দিক খুঁজে পাই।

এরিস্টটল (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) সর্বপ্রথম মৌমাছি নিয়ে গবেষণা করেন। যথার্থই তাঁকে 'প্রাচীন মৌচাষের সূর্য' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তাঁর 'প্রাণীদের ইতিহাস' এবং প্রাণীদের 'অঙ্গ' ও 'প্রজনন' সম্পর্কিত লেখাগুলোতে মৌমাছি পর্যবেক্ষণ ও মৌমাছিদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। তিনি মধুকে মানব জীবন দীর্ঘতর করার মত এক আশ্চর্য সামগ্রী বলে গণ্য করতেন।

ভার্জিল (খ্রীষ্টপূর্ব ৭-১৯) রোমের অগস্টান (আউগুস্তু) যুগের মহান 'রাজ কবি' তাঁর Georgic গুলোতে যথেষ্ট কোমলতা, আবেগ ও মমতা দিয়ে মৌমাছিদের কথা লিখেছেন। এগুলোতে মৌমাছি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

'সিচেরো' ও 'প্লিনি'র মতে অ্যারিস্টোম্যাকুস মৌমাছিদের নিয়ে তার

সমীক্ষা থেকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে পেঁাছেছিলেন আর হিলিসকাস বৃদ্ধ বয়সে সাথীজনদের কাছ থেকে বহুদূরে অরণ্যের গভীরে চলে গিয়েছিলেন এই সব কীট-পতঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেকে সঁপে দিতে।

'অ্যারিস্টোম্যাকুস' কে নিয়ে তাঁর কাহিনীতে প্লিনি বলেছেন, মৌমাছি বসতির জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ দেখে এই মহান দার্শনিক এতই মোহিত হয়েছিলেন যে, জীবনের ৫৮ বছর তিনি মৌমাছিদের নিয়ে গবেষণায় কাটান। নানান পেশা ও বিচিত্র সামাজিক পটভূমির মানুষ এখনও মৌমাছিদের সাথে কাজ করাকে সত্যিকারের আনন্দের উৎস বলে মনে করেন।

মৌমাছি পালক আনাতোলি বুৎকোভিচ্ বলেছেন, মৌচাষ তখনই মৌমাছি বিশারদকে প্রকৃতির অন্যতম এক মহাবিস্ময়ের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় যখন এসব ক্ষুদে মেহনতীদের জীবন এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ একটি আদর্শ সংগঠনের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রূপ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মৌমাছির উপর গবেষণা করেছেন এমন শত শত পণ্ডিতের কথা, শারীরিক পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন অথবা মৌমাছি পালনকে পেশা বা সখ হিসেবে বেছে নিয়েছেন এমন হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ লোকের কথা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখানে স্থানাভাবে বলতে পারছি না। তবু সারা বিশ্বে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাঁরা মৌচাষের বিকাশে এবং মৌমাছিকে জানার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তেমন কয়েকজনের কাজের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

অতীতের অনেক শাসক ও আইনপ্রদাতা মৌমাছিদের কাজ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। স্পার্টার (খৃী. পূ. ৮৮০ প্রায়) প্রতিষ্ঠাতা লিকারগাস সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তিনি বসতিবদ্ধ মৌমাছিদের পর্যবেক্ষণ করে এতই প্রভাবিত এবং তাদের শৃঙ্খলা, সংগঠন ও শাসনপ্রণালী দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পূর্ণাঙ্গ সরকার ব্যবস্থা দিয়ে জনগণকে সুখী করার জন্য তিনি সেটাকেই আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

আর একজন গ্রীক আইন প্রদাতা সোলোন (খৃী. পূ. ৬৩৮-৫৫৮ প্রায়) মৌখামার নিয়ন্ত্রণের বাস্তব কাজে যুক্ত ছিলেন এবং এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, বিদ্যমান মৌমাছিশালার ২৭৫ মিটারের কাছাকাছি নতুন

কোন মৌমাছিশালা 'এথেন্স'এ স্থাপন করা যাবে না। মধ্যযুগে ফ্র্যাঙ্কদের (জার্মান উপজাতীয় গোষ্ঠী — অনুবাদক) রাজা শার্লামেন (৭৪২-৮১৪ খ্রী:) মহাউদ্দীপনা নিয়ে তাঁর বিস্তীর্ণ রাজ্যের সর্বত্র মৌমাছি পালনকে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন মৌমাছির খুব ভক্ত। এবং ভেবেছিলেন তাঁর প্রজা ও কর্মচারীরা মৌমাছি পালন শুরু করলে তাঁর রাজ্যের যথেষ্ট উপকার হবে। বনাঞ্চলে ঝোপঝাড়ে, বাগানে যেখানেই সুধাময় গাছপালা ছিল সেখানেই মৌমাছির চাক বসানো হল। তিনি তাঁর উপদেষ্টা, সেনাপতি ও রাজকর্মচারীদের পদক না দিয়ে মৌমাছির ঝাঁক উপহার দিতে লাগলেন। প্রত্যেক পরিষদসভায় তিনি মধু সংগ্রহের খতিয়ান ও অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর নিতেন।

রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিজানটিয়ামে এক হাজার বছরেরও আগে (প্রায় ৯৫০ খ্রী:) সম্রাট সপ্তম কনস্টানটাইনের আদেশে বিশ্বকোষ ধরনের Perigerogia eclogai বা Geoponica লেখা হয়েছিল। এতে মৌমাছি ও মৌমাছি আবাদ সম্পর্কে কয়েকটি রচনা ছিল।

আরও সাম্প্রতিক কালে মারিয়া থেরেসার (১৭১৭—১৭৮০) রাজত্বকালে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যে মৌমাছি পালন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তার সরাসরি নির্দেশে অনেকগুলি অস্ট্রীয় শহরে মৌমাছি পালন বিষয়ে শিক্ষকের পদ প্রবর্তিত হয় এবং সবচেয়ে সেরা বিশেষজ্ঞরা যাতে সে সব পদে আবেদন করেন সে জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিখ্যাতে স্লোভেনীয় মৌমাছি বিশারদ 'আন্তন জান্‌সা' কে 'ব্রাজেনা' নামক স্থান থেকে ডাকিয়ে এনে রাজ মৌমাছি বিশারদ খেতাব দিয়ে ভিয়েনা মৌচাষ স্কুলে নিয়োগ করা হয়। সে সময় সারা ইউরোপে ভিয়েনা স্কুলই ছিল মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রথম পদক্ষেপ।

রুশী জার প্রথম পিটার (মহামহিম) মৌমাছি সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী ছিলেন। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত প. সৃভিনিন-এর "সেন্ট পিটার্সবুর্গ এবং তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী" গ্রন্থে স্ত্রেলনিয়া নামে একটি বিখ্যাত শোভাময় স্থানের প্রাসাদ ও উদ্যানের বর্ণনা আছে। রচয়িতা লিখেছেন 'এই এল্‌ম গাছ থেকে কিছুটা দূরে প্রথম পিটার একটি মৌমাছিশালা স্থাপন করেন। প্রথম মৌচাকটি আনা হয়েছিল দোর্‌পাত্‌ থেকে এবং মৌমাছিগুলোকে রাখা হয়েছিলো জারের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। এত উত্তরে এবং সমুদ্রের এত কাছে মৌমাছি

পালা যাবে না বলে যে ধারণা ছিল তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যেই পিটার এরকম করেছিলেন।'

মহামহিমান্বিতা ক্যাথারিনও খুব মৌমাছিপ্রিয় ছিলেন। তিনি মৌমাছি পালনকে খুব মূল্য দিতেন। ১৭৪০ সালে তিনি এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করেন যে, যে-সমস্ত জমিতে মৌচাকওয়ালা গাছ রয়েছে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা চলবে না। ১৭৭১ সালে তাঁর স্মালোনস্ক শিক্ষালয়ের যোগ্যতম ছাত্র বারদোভস্কি ও কাভেরজ্নেভকে মৌমাছি পালনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ অধ্যয়নের জন্য উচ্চ লুসাতিয়ার বিখ্যাত মৌমাছি বিশারদ সিরাচ-এর কাছে পাঠানো হয়। ১৭৭২ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি উপলক্ষে এক নির্দেশনামায় মৌমাছি পালকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তখন থেকে খাজনা ও কর থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

সম্রাজ্ঞী এতই মৌমাছিপ্রিয় ছিলেন যে নিজের কুলচিহ্ন খচিত পোষাকেও তিনি মৌচাকের প্রতিকৃতি রেখেছিলেন। ১৭৭৫ সালে মুক্ত অর্থনীতি সমিতি প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্যে যে প্রতীক চিহ্ন নির্ধারণ করেছিলেন তাতেও মৌচাকের প্রতিকৃতি ছিল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১) মৌমাছি বসতিতে রাষ্ট্রের উপাদান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। "নেপোলিয়ন সারগ্রন্থ" (code Napoleon) প্রস্তুত করার সময় তিনি মৌমাছি সাম্রাজ্যের আদর্শ, শৃঙ্খলা, সমষ্টিবাদ এবং রাণীর প্রতি সার্বিক আনুগত্যের দিকটাকে কাজে লাগান। তিনি মৌমাছিকে তাঁর প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর শাসন কালে গ্র্যান্ড অপেরার পর্দাকে মৌমাছির আদলে সজ্জিত করা হয়েছিলো।

কিন্তু এসব ছোটছোট বাস্তব কাহিনীর বাইরে বিশিষ্ট সব মৌমাছি বিশারদ ও লেখক যে-সব অবদান রেখেছেন আমরা সেগুলোতেই অধিকতর আগ্রহী।

ইয়ান সোয়ামারডাম (১৬৩৭-১৬৮০) ছিলেন প্রখ্যাত ওলন্দাজ ডাক্তার, অণুবীক্ষণবিদ, প্রকৃতিবিদ, মৌমাছি পালক ও পতঙ্গ-শারীরবিদ্যার জনক। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ওষুধ বিক্রেতা এবং প্রজাপতি, মথ, গুবরেপোকা, ফড়িং ও নানা পতঙ্গ সংগ্রহকারী। লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের পর তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র

ব্যবহারের পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কীটপতঙ্গের জীবন নিয়ে তথ্যানুসন্ধান শুরু করেন। সর্বপ্রথম যাঁরা মৌ-বসতির সদস্যদের লিঙ্গ যথাযথভাবে নির্ধারণ করেন, রানী ও পুরুষ মৌমাছির যৌনাঙ্গ, মৌমাছির হুল, ডিম থেকে মৌমাছির বাচ্চা ফুটানো এবং মৌমাছির শূককীটের শারীরিক গঠনের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে সক্ষম হন, তিনি তাঁদের একজন। অনেক বিজ্ঞানী যে সময় রাণী মৌমাছিকে 'রাজা' বলে মনে করতেন তখন সোয়ামারডাম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, রাণী মৌমাছি স্ত্রী জাতের এবং সে-ই ডিম পাড়ে। সোয়ামেরডামের দেয়া তথ্য এভাবে ইতিপূর্বকার ভুল ধারণার চিরঅবসান ঘটায়। ১৬৬৯ সালে তিনি তাঁর 'কীটপতঙ্গের সাধারণ ইতিহাস' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। চার বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর 'মৌমাছিদের নিয়ে নিবন্ধ'। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা 'প্রকৃতির বাইবেল' তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৫৭ বছর পর প্রকাশিত হয়।

মোজেস রোউসডেন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লস-এর মৌমাছি বিশারদ। ১৬৭৯ সালে তাঁর 'মৌমাছিদের নিয়ে আরও বিবেচনা' বইটি প্রকাশিত হয়।

রেনে আতোয়া রেয়ামিউর (১৬৮৩-১৭৫৭) — বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী এবং রেয়ামিউর থার্মোমিটার স্কেলের উদ্ভাবক। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ। মূলতঃ মৌমাছি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান এবং তাঁর 'Meemoires pour servir a l'histoire des insectes' গ্রন্থে বিষয়টির উপর পর্যাপ্ত আলোচনা করেন। রেয়ামিউর কাঁচের মৌচাকে মৌমাছিদের নিয়ে পরীক্ষা চালান এবং দেখান যে, মৌমাছি বসতির পূর্ণাঙ্গ বিকশিত স্ত্রী-মৌমাছি হচ্ছে স্বয়ং রাণী এবং সে পুরুষ মৌমাছির সাথে যৌন মিলনে রত হয়। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে, স্ত্রী জাতীয় কর্মী মৌমাছির শূককীটকে বিশেষ খাবার সরবরাহ করে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির জন্ম দেয়। তাই সত্যিকার অর্থে বসতির রাণী সে নয় বরং আদতে সে একটি স্ত্রী-মৌমাছি যার কাজ মৌমাছিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। রেয়ামিউর এ ছাড়াও মৌমাছিদের সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন।

পিওতর রুচকভ (১৭১২-১৭৭৭), রুশ একাডেমীর পত্র-সদস্য। রুচকভ একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং কৃষিঅর্থনীতির বিশেষজ্ঞ

(মৌমাছি পালন সহ)। রাশিয়াতে তিনিই সর্বপ্রথম মৌমাছি পালন নিয়ে গবেষণা করেন এবং মৌমাছি সম্পর্কে মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন। তার আগে রুশ ভাষায় যে একটি মাত্র রচনা দেখা যায়, তা অন্য দেশে প্রকাশিত রচনার অনুবাদ। এ ছাড়াও রুচ্‌কভ্‌ হলেন প্রথম রুশী যিনি উপস্থিত প্রয়োজনে উদ্ভাবিত স্বচ্ছ মৌচাকে (বালতির অর্ধেক আকারের কাঁচের পাত্র, যাতে দুই সারি জানালা কাটা হয়েছিলো) মৌমাছি বসতির জীবন পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করেন। প্রায় ২০০ বছর আগে মুক্ত অর্থনীতি সমিতির কার্যবিবরণীতে তিনি 'মৌমাছি পালন' বিষয়ে একটি লেখা প্রকাশ করে তাতে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন সম্পর্কে তার মত সুবিন্যস্ত করেন।

আন্তন জান্‌সা (১৭৩৪—১৭৭৩), স্লভেনীয় মৌমাছি বিশারদ। তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, আগের রাণীর মৃত্যু হলে স্ত্রী শ্রমিক মৌমাছির শাবকদের মধ্য থেকে নতুন রাণীমৌমাছি লালন-পালন করা হয়। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন, পুরুষ মৌমাছি লিঙ্গের দিক থেকে পুরুষ এবং পরিণয়-উড্ডয়নে তারা রাণীদের সাথে যৌন মিলনে রত হয়। তিনি মৌমাছির ঝাঁকের সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন। এ ছাড়া তিনি ফাউল ব্রুড রোগের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালান এবং মৌমাছির বসতি নিয়ে বহু খণ্ডে নোট সংগ্রহ করেন। এসব ক্ষেত্রে সমসাময়িক মৌমাছি পালকদের চেয়ে তিনি অনেক এগিয়ে ছিলেন। 'মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নিবন্ধ' ও 'মৌমাছি পালনের পূর্ণাঙ্গ পাঠ' তিনি লিখেছেন। তার জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'আন্তন জান্‌সা : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক একটি রচনায় অধ্যাপক স্লাভকো রেইচ লিখেছেন, স্লভেনীয়াতে জান্‌সা যে ভূমিকা পালন করেন তা ইউক্রেনের প্রোকোপোভিচের সাথে, পোলান্ডের ঝেরারজনের সাথে এবং মোরাভিয়ার মেজর হুস্কার সাথে তুলনীয়।

ফ্রাশোয়া হুবের (১৭৫০-১৮৩১), সুইজারল্যাণ্ডীয় প্রকৃতিবিদ। ১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি অন্ধ কিন্তু নিজের স্ত্রী এবং একজন নিবেদিতপ্রাণ ভৃত্যের সহায়তায় তিনি মৌমাছিদের নিয়ে খুব কৌতূহলজনক কিছু পরীক্ষা চালান এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। ১৭৮৭ সালে, সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তিনি কর্মতৎপর একটি রাণী মৌমাছির উড্ডয়ন ও পুরুষ মৌমাছির সাথে তার যৌন

মিলনের সুস্পষ্ট চিহ্ন সহ মৌচাকে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ দেন। দু' বছর পর উড্ডয়নরত অবস্থায় পুরুষ মৌমাছির সাথে রাণীর যৌন মিলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুলে ধরেন। ১৭৮৯ সালে তিনি ১২ টি কব্জার সাথে বইয়ের পাতার মত যুক্ত করা ১২টি কাঠামো সহ বই-মৌচাক উদ্ভাবন করেন এবং তখন থেকে তাঁর নামানুসারে সেটির নামকরণ করা হয়।

হুবের প্রমাণ করেন যে, শ্রমিক মৌমাছি অনিষিক্ত ডিম পাড়ে এবং তা থেকে কেবল পুরুষ মৌমাছিরই জন্ম হয়। নিষিক্ত ডিম থেকে যে শ্রমিক মৌমাছি জন্ম নেয়, রাণী মৌমাছিরা যে উড্ডীয়মান অবস্থায় পুরুষ মৌমাছির সাথে মিলিত হয় এবং বোধ শলাকাগুলি যে ঘ্রাণ ও স্পর্শের ইন্দ্রিয়, হুবের সে সবও প্রমাণ করেন। তিনি প্রথম মোমকুচি ও মধুকোষ নির্মাণের বিবরণ দেন এবং কোষ নির্মাণ কাজে শ্রমিক মৌমাছি কী পরিমাণ মধু ব্যবহার করে — তা লিপিবদ্ধ করেন।

হুবের বহু বছর ধরে মৌমাছি পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সর্বশেষ মৌমাছি পর্যবেক্ষণ' গ্রন্থে। ১৯০৮ সালে বইটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তা সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মৌমাছি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য হুবের ফরাসী একাডেমী সহ আরো বহু জায়গায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

নিকোলাস ভিৎভিৎস্কি (১৭৬৪-১৮৫৩), ল্ভোভ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হবার পর ব্যাপক ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার কৃষিপদ্ধতি, বিশেষ করে মৌমাছি পালনের সাথে যুক্ত কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পাঁচ বছর যাবৎ 'ক্রেমেনেৎস্ লিসিয়ে'তে (ভলাহিনিয়া) তিনি দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি পুরোপুরিভাবে মৌমাছি পালনে নিয়োজিত করার স্বপ্ন দেখেন। দর্শন শিক্ষাদানের চেয়ে 'লিসিনস্কি বনবিদ্যা স্কুলে' মৌমাছি পালকদের প্রশিক্ষণ থেকে তিনি অনেক বেশী তৃপ্তি লাভ করতেন। ১৮৪৯ সালে ৮৪ বছর বয়সে ভিৎভিৎস্কি ৪০০০ মৌমাছি বসতি সহ এক বিশাল মৌমাছি উদ্যানের দায়িত্ব নেন যার মালিক ছিলেন ল. ভ. কচুবেই (পূর্বতন পল্তাভা প্রদেশের দিকাংকায়), ভলাহিনিয়া প্রদেশের কোভেল অঞ্চলে ২০০০ মৌচাক বিশিষ্ট নিজস্ব একটি মৌমাছি খামারও তাঁর ছিল।

ভিংভিংস্কি 'কাঁচের মৌচাক বা মৌমাছির প্রাকৃতিক ইতিহাসের কিছু নির্বাচিত কৌতূহল' নামে একটি বই লেখেন। সব বয়সের ও সব রকম লোকের এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যে লেখা এই বইটি সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। যে সব উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বইটিতে ছিল। গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি লেখেন, 'আমাদের প্রতিভাধর নাট্যকারদের মনে ব্যথা দেবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে আন্তরিকতা নিয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে আমার কাঁচের মৌচাকের সামনে আধঘণ্টা বসে যে প্রজ্ঞা-পরিতৃপ্তি আমি পাই রাশিয়া কিংবা অন্যত্র দেখা কোন ট্র্যাজেডি, কোন নাটক, কোন অতিনাটক কিংবা কোন মিলনাত্মক নাটক আমাকে তার দশ ভাগের একভাগও দিতে পারেনি। কাঁচের মৌচাকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে আপনি তাকান, দেখবেন আপনি আমার সাথে একমত না হয়ে পারছেন না।'

পিটার প্রোকোপোভিচ: প্রথম বারের মত মৌমাছির মুখোমুখি হয়েই বহুলোক তাদের সাথে সত্যিকারের বন্ধুত্বে বাঁধা পড়েছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রে গোটা জীবন ধরে তা অব্যাহত থেকেছে। পিটার প্রোকোপোভিচ্-এর ব্যাপারটা ওরকম। ১৭৯৯ সালে তিনি তার ভাইয়ের মৌমাছি উদ্যানে বেড়াতে যান এবং মৌমাছি বসতির মনমাতানো জীবন নিয়ে দারুণভাবে মেতে ওঠেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন মৌচাষের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন তখন লিখেছেন, 'মৌচাকের দিকে, অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে, মৌচাকে উপবিষ্ট এবং তার চতুর্দিকে উড্ডয়ন ও গুঞ্জনরত মৌমাছির ঝাঁক যখন দেখছিলাম তখন হঠাৎ নিজেরও এরকম কিছু নিয়ে থাকার দুর্বার বাসনা আমাকে পেয়ে বসল। ১৭৯৯ এর সারা গ্রীষ্মটা আমার কাটল ভাইয়ের মৌমাছিগুলো দেখে দেখে আর ১৮০০ সালের মধ্যেই আমি নিজস্ব একটি মৌমাছিশালা স্থাপন করার জন্য এক ফালি জমি কিনলাম।'

১৮০০ সালে ৪২ বছর বয়সে প্রোকোপোভিচ্ মৌমাছি পালন শুরু করলেন। ১৪ বছর ধরে তিনি ইউক্রেন, রাশিয়া ও আশেপাশের দেশগুলোর ঐতিহ্যগত non-collapsible log-মৌচাকে মৌমাছি লালন করেন। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবনী মন মৌমাছি পালনের জন্য সে সময় ব্যবহৃত আদিম কলাকৌশল দেখে সন্তুষ্ট হয়নি। ১৮১৪ সালে তিনি গুটিয়ে ফেলা যায় এমন (collapsible) মৌচাক উদ্ভাবন করলেন। এ এক

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। কারণ তা মৌমাছি পালনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করল এবং এর ফলে উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা-সামর্থ্য বৃদ্ধি পেল। ইউরোপে যখন মৌমাছি পালনকে সখ হিসেবে দেখা হত এবং যুক্তরাষ্ট্রে মৌমাছি পালনের বিকাশ যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে তখন প্রোকোপোভিচ্ দ্রুত ৩০০০ এরও বেশী মৌমাছি বসতিকে log-মৌচাক থেকে গুটানো-সক্ষম মৌচাকে পরিবর্তিত করেন। তাঁর উদ্ভাবিত মৌচাকের মূল বৈশিষ্ট্য হল স্থানান্তরে নেয়া চলে এমন কাঠের ফ্রেমে করে মধুকোষ মৌচাকের ভেতরে আনা-নেয়া করার সুযোগ সৃষ্টি। ফ্রেম-মৌচাকের পরবর্তী সমস্ত উন্নতি সাধনের সেটিই ছিল যাত্রাবিন্দু। প্রোকোপোভিচের মৌচাক মৌমাছি ও মৌমাছিপালক — উভয়ের জীবনের স্বাচ্ছন্দ নিয়ে এল। নিতান্ত গুটানো-সক্ষম কাঠামো মৌচাকে স্থির না থেকে তাঁর অনুসন্ধান আরও অধিকতর উন্নতি বয়ে আনলো। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল তিনি কৃষি গেজেট এবং মুক্ত অর্থনীতি সমিতির কার্যবিবরণীতে প্রকাশ করে সহকর্মীদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর রচনাবলীর কয়েকটি হচ্ছে: 'মৌমাছি সম্পর্কে', 'ফাউল ব্রুড রোগ সম্পর্কে', 'রাণী মৌমাছিদের সম্পর্কে', 'মৌমাছি বসতির নিয়মকানুন সম্পর্কে'। এ সব রচনা মৌমাছি পালনের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। ১৮২৮ সালে প্রোকোপোভিচ তাঁর নিজের গ্রাম মিৎচেন্কিতে রাশিয়ার মৌমাছি পালন সংক্রান্ত প্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাঠক্রম দু'বছরের ছিল, পরে তা বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে ছাত্রদের মৌমাছি, মৌচাক, স্থান নির্বাচন, সুধাময় উদ্ভিদ সম্পর্কে, এক কথায় বাস্তবে মৌমাছি পালন সম্পর্কিত সব বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হত। অস্তিত্বের ৫০ বছরে স্কুলটি ৬০০-এর বেশী মৌমাছি বিশারদকে প্রশিক্ষণ দান করেছেন। এরা সবাই ছিলেন পেশা সচেতন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ। মৌমাছিদের জন্য নিজের ভালোবাসাকে কিভাবে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হয় তা প্রোকোপোভিচ্ সত্যিই জানতেন।

প্রোকোপোভিচের জীবৎকালে তার কর্মতৎপরতা রাশিয়া ও তার বাইরের অন্যান্য দেশের ভক্তদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার লাজারেভ্স্কি ও নিকোলাই কোস্তোমারভ এবং বিশিষ্ট ইউক্রেনীয় কবি তারাস শেভচেঙ্কো তাঁর মৌমাছি খামার

পরিদর্শনে আসেন। এ. আই. রুট যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছেন, প্রোকোপোভিচ অসাধারণ গুণী মৌমাছিপালক ছিলেন। তাঁর কালের তুলনায় অনেক অগ্রগামী পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রোকোপোভিচের গুটানোসক্ষম মৌচাক সম্পর্কে বিদেশী পাঠকদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে আ. ই. **পোকোরস্কি ঝোরাভকো'র** 'রাশিয়ায় মৌমাছি পালনের রূপরেখা' গ্রন্থের মাধ্যমে। এটি ১৮৪১ সালে জার্মানে ও রুশ ভাষায় বের হয়। 'চেরনিগভ' অঞ্চলের কাছে পোকোরস্কি ঝোরাভকোর যে তালুক ছিল তা প্রোকোপোভিচের মৌমাছি খামার থেকে বেশী দূরে ছিল না। ফলে লেখকের পক্ষে দক্ষতার সাথে উদ্ভাবিত মৌচাক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করা ও বর্ণনা করা হয়েছিল। তাঁর 'প. ই. প্রোকোপোভিচের জীবন প্রতিকৃতি' গ্রন্থে তিনি পথ প্রদর্শক হিসেবে গুটানো-মৌচাকের ক্ষেত্রে প্রোকোপোভিচের অবদানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধ ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে মূলতঃ মৌচাকটির জন্য। তা ইউরোপের অনেক কৃষি সাময়িকীতে মুদ্রিত হয় এবং ফরাসীর বহু কারিগরী সমিতি আরও অগ্রসর হয়ে ঐ ধরনের মৌচাক তৈরীর জন্য বিশেষ কারখানা বানায়।

এপিফেনাস গুসেভ (১৮০২-১৮৭৩), মৌমাছি পালক ও উদ্ভাবক। রাণী মৌমাছির কৃত্রিম প্রজননের সর্বপ্রথম পরামর্শদাতা (আমেরিকান ডুলিট্লের ৩২ বছর আগে) এবং রুশীদের মধ্যে যারা প্রথম কাঠামো-মৌচাক ব্যবহার করেন তিনি তাদের একজন। গুসেভ যে বিরাট মৌমাছি খামার দেখাশুনা করতেন তাঁতে তার নিজের নক্সামত তৈরী মৌচাকও ছিল। ১৮৫৮ সালে ভিয়াৎকা কৃষি প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর নিজের উদ্ভাবিত রাণী-কুঠুরি (queen cell) গুলো, মৌমাছির ঝাঁক পাকড়াও করার ছাঁকিজাল (scoop), লোহার তৈরী ধোঁয়ার কল (মৌমাছিদের ধূম প্রয়োগ যন্ত্রের অগ্রদূত), মৌমাছির ঝাঁককে দলা পাকানোর স্প্রে, মৌ-খোপে কাটার ছুরি এবং মৌমাছি পালকদের অন্যান্য উপকরণ প্রদর্শন করেন। ১৮৬০ সালে তিনি তাঁর উদ্ভাবিত বোর্ড দিয়ে তৈরী প্রোকোপোভিচের গুটানো মৌচাকের স্মারক হিসেবে উপরিভাগ খোলা একটি কাঠামো-মৌচাক এবং রাণী-কুঠুরি

তৈরীর ও প্রজননের জন্য সেখানে ডিম স্থানান্তর করার যন্ত্র প্রদর্শন করেন।

পিওতর করঝিনেভ্‌স্কি (১৮১০—১৮৯৮) কিয়েভে আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন। ৩৮ বছর বয়সে এক বন্ধুর কাছ থেকে তিনি মৌমাছির জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। মৌমাছিদের প্রতি তিনি এতই আগ্রহী হয়ে ওঠেন যে, শহরের অদূরে ছবির মত মনোরম জায়গায় নিজের একটি মৌমাছিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তার সখের মৌমাছিশালা ২৫০টি মৌচাক সমেত বড়সড় হয়ে উঠলো। নতুন কাজে মুগ্ধ করঝিনেভ্‌স্কি তাঁর জীবনের পরবর্তী পঞ্চাশ বছর উৎসর্গ করলেন মৌমাছিদের পেছনে। কাঠামো-মৌচাক ব্যবহার করার সংগে সংগে তিনি মৌমাছি পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পক্ষে প্রচার চালান। যাঁরা মৌমাছি পালন সম্পর্কে জানতে ও শিখতে উৎসাহী কিংবা মৌমাছির বসতি জীবন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী ছিল তাদের সবার জন্য তিনি তাঁর নিজের মৌখামার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেনে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে তাঁর অবদান যথেষ্ট।

রেভারেন্ড ল. ল ল্যাংগস্‌ট্রথ (১৮১০-১৮৯৫) এক ধরনের কাঠামো-মৌচাক উদ্ভাবন ও তাঁর উন্নতি সাধন করেছিলেন। আমেরিকায় তাঁর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বহুবছর তিনি আমেরিকায় মৌমাছি পালক সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'মৌচাক ও মধুমক্ষিকা প্রসঙ্গে ল্যাংগ্‌স্‌ট্রথ' প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। এটি এই ধরনের বিশ্ব সাহিত্যে মৌমাছি পালন সম্পর্কিত সবচেয়ে প্রথম দিককার রচনাগুলোর একটি। আ. ই. রুট তার স্মৃতিকথাতে লিখেছেন যে, তিনি সর্বপ্রথম ল্যাংগ্‌স্‌ট্রথকে দেখেন এবং তাঁর ভাষণ শোনেন কিন্‌কিনাটিতে এক কংগ্রেসে। তিনি যেমন ভালো বক্তা তেমনি ভালো লেখক। এমন খোশমেজাজী, সদাশয় ও বন্ধুসুলভ লোক তাঁর চোখে বিরল। কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মানবতাবাদীর সব গুণই তাঁর মধ্যে একাকার হয়ে মিশে আছে।

জোহান ঝেয়ারজন (১৮১১-১৯০৬) মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অনেক বিজ্ঞান সমিতির সদস্য ছিলেন এবং মৌমাছি পালনে অসাধারণ অবদানের জন্য বহু পদকে ভূষিত হন। ঝেয়ারজন স্থানান্তরযোগ্য কাঠামো সহ একটি পূর্ণাঙ্গ

মৌচাক তৈরী করেন। মৌমাছি পালকদের বহু কংগ্রেসেও তিনি যোগদান করেন। তাঁর প্রকাশিত সাময়িকীর নাম 'সাইলেসীয় মৌমাছি পালক'। তাঁর অসংখ্য রচনার কয়েকটি হচ্ছে, 'আধুনিক মৌমাছি পালনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ' (১৮৪৮), বিজ্ঞানভিত্তিক মৌমাছি পালন (১৮৬১), জোড়া মৌচাক (১৮৯০)।

কার্ল রুলিয়ের (১৮১৪—১৮৫৮): চত্বর-মৌচাকের উদ্ভাবক। তিনি ছিলেন প্রাণিবিজ্ঞানের ডক্টর ও অধ্যাপক। তিনি তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি দলকে নিজের চারিদিকে সমবেত করতে এবং তাদের মধ্যে কীটপতঙ্গ সম্পর্কে উৎসাহ জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের অনেকেই পরবর্তীকালে মৌমাছির জগতে বিশিষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। রুলিয়ের মস্কো কৃষি সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। রুশী প্রাণিবিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি প্রথম কাতারের একজন বিবর্তনবাদী। সাধারণের জন্য লেখা তার চমকপ্রদ গ্রন্থ হচ্ছে — 'মৌমাছির প্রাকৃতিক ইতিহাসে তিনটি আবিস্কার'।

ইয়ান দালিনোস্কি (১৮১৪—মৃত্যুতারিখ অনিশ্চিত) —পোল্যাণ্ডের বিশিষ্ট মৌমাছি বিশারদ। অনুভূমিক কাঠামো-মৌচাক-এর উদ্ভাবক। তাঁর নিজের নামে প্রচলিত এই মৌচাক বিগত শতাব্দীতে দক্ষিণ পশ্চিম রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন নক্‌শায় মৌচাক পরীক্ষা করে লেভ্‌ তল্‌স্তোয় ইয়াসনায়া পলিয়ানায় তাঁর নিজের মৌমাছিশালার জন্য দালিনোস্কি ধরনের মৌচাক বেছে নিয়েছিলেন।

অগস্ট ফ্রিহের ফন বার্‌লেপ্‌শ (১৮১৬-১৮৭৭) শিশুকাল থেকেই মৌমাছিপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিবেশীর মৌমাছিশালায় ঘন ঘন ছুটে গিয়ে তার পরিচারিকাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করেছেন, কষ্ট দিয়েছেন। তাঁর বয়স যখন ৭ বছর তখন তার বাবা তাকে মৌমাছি-ভর্তি একটি মৌচাক দেন। বালকের কাছে সে ছিল এক মহা উৎসবের দিন। সেই সময় থেকেই তিনি মৌমাছির জীবন নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চালান এবং জীবনের বাকি সময় সেগুলোই তার মনকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করেছিল। গোথা'য় স্কুলে থাকাকালে তিনি তার মৌচাকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হের ডোয়েরিং-এর উদ্যানে রেখেছিলেন। বৃদ্ধ ডোয়েরিং-এর সাথে বালক মৌমাছি পালকের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর সাথে তিনি ল্যাটিন ভাষায় ভার্জিলের Georgics-এর চতুর্থ খণ্ড

পুরোপুরি পড়ে ফেললেন। পরবর্তীকালে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ফন্ বারলেপ্‌শ্ তাঁর নিজের কামরায় একটি মৌচাক রেখেছিলেন। তা দেখে দর্শনার্থী ও ছাত্ররা মহা আনন্দ পেত।

ফন বারলেপ্‌শ্ আইন, দর্শন ও ঈশ্বরতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৪১ সালে তিনি জাইসবাক পার্কে ১০০টি খড়ের মৌচাক তৈরী করেন। মৌচাকগুলোর স্বাভাবিক সোনালী রং সূর্যালোকে চক্ চক্ করত আর তাতে মৌমাছি পালনের খুব ভালো প্রচার হত। সে সময় থেকেই ফন বারলেপ্‌শ্ উদ্যানতত্ত্বে এবং মৌমাছি পালনে আত্মোৎসর্গ করেন। ১৮৫২ সালে তিনি একটি কাঠামো-মৌচাক উদ্ভাবন করেন (প্রোকোপোভিচ এবং ল্যাঙসট্রথ ছাড়াই স্বতন্ত্রভাবে)। মধুমক্ষিকার প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপর লেখা তাঁর অসংখ্য বৈজ্ঞানিক রচনা চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে কাঠামো-মৌচাক ব্যবহারের প্রগতিশীল মৌমাছি পালনের উত্তরণকে উৎসাহিত করেছিল। 'পড়ন্ত শরতে মধু আহরণহীন দেশগুলোতে স্থানান্তরযোগ্য কাঠামো-মৌচাকে মৌমাছি এবং পরিচর্যা' নামক তাঁর গ্রন্থটি রুশ সহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়।

জোহান্‌স মেহরিঙ (১৮১৬-১৮৭৮): কাঠের মিস্ত্রি। ১৮৪৯ সালে ৩৩ বছর বয়সে মৌমাছি পালন শুরু করেন এবং শীঘ্রই এই শিল্পে গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৬৭ সালে তিনি কৃত্রিম মৌচাক foundation উদ্ভাবন করেন এবং তাঁর নিজের মৌমাছিশালায় পরীক্ষা চালান। এই উদ্ভাবন এবং তার সাথে ফ্রেম-মৌচাক ও মধু নিষ্কাশন বিজ্ঞানভিত্তিক মৌমাছি পালনে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল।

শার্ল দদোঁ (১৮১৭-১৯০২) সুইজারল্যাণ্ডের ব্লাট-এর সাথে একত্রে মৌচাকের নকশা করেন এবং তা তাদের উভয়ের নামে পরিচিত লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ঐ মৌচাকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। দদোঁ দীর্ঘকাল ধরে 'American Bee Journal' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। তাঁর 'মৌচাষের সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রম' ও 'দদোঁ মৌচাকের বিবরণ' এবং ল্যাংস্ট্রথ-এর লেখা 'মৌচাক ও মধুমক্ষিকা' বইটির যে সংশোধিত সংস্করণ তিনি করেছিলেন তা ফ্রান্স এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার বাইরেও ব্যাপকভাবে পঠিত হয়ে আসছে।

ফ্রাঞ্জ রুশকা (১৮১৯-১৮৮৮), অস্ট্রীয় সামরিক বাহিনীর মেজর ছিলেন। কিন্তু তাঁর সত্যিকারের পেশা ছিল মৌচাষ। তাঁর পুত্রের কাছ থেকেই তিনি ঘটনাক্রমে চাক থেকে মধু নিষ্কাশনের জন্য কেন্দ্রাতিগ বল কাজে লাগানোর ইংগিত পান। একদিন তিনি তার ছেলেকে প্লেটে করে এক টুকরো মধুকোষ দিয়েছিলেন। কেন যেন ছেলেটি ঐ প্লেটটা থলেতে রেখে দিয়ে দোলাতে লাগল। পর্যবেক্ষণশীল পিতা লক্ষ্য করলেন, ঐ ভাবে প্যাক দিয়ে দোলানোতে মধুকোষ থেকে মধু গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এ থেকেই মধু নিষ্কাশনের যন্ত্র তৈরীর চিন্তা তার মাথায় আসে। তার প্রথম মডেলটি যদিও খুব প্রাথমিক ধরনের ছিল এবং একালে তৈরী যন্ত্রের সাথে তার কোন মিল নেই (মূল যন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনই এর কারণ), তবু সারা বিশ্বের মৌমাছি পালকরা বিপুল উৎসাহের সাথে ঐ যন্ত্রটিকে তখন গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে রুশকা মৌমাছি পালকদের চতুর্দশ কংগ্রেসে জার্মান ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরী মৌমাছি পালকদের কাছে তাঁর ঐ মধু নিষ্কাশক যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি প্রদর্শন করেন।

জোহান গ্রেগর মেণ্ডেল (১৮২২-১৮৮৪): বংশগতিবিদ্যার জনক। মৌমাছি পরিবার নিয়ে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। মৌমাছিদের প্রতি তাঁর আগ্রহের সূত্রপাত ছেলেবেলা থেকেই। ১৮৪৩ সালে ব্রনো'তে সেণ্ট অগাস্টাইনের মঠে তিনি মৌমাছি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পান এবং নিজের খরচে ৫০ টিরও বেশী বসতি সমেত একটি মৌ-চাতাল তৈরী করেন। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৮ সালে তিনি মোরাভীয় মৌমাছি পালন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ঐ সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ও সম্মানিত জীবন-সদস্য ছিলেন। তাঁর মৌশালায় নানা জাতের (সাইপ্রীয়, জার্মান, ইতালীয় ও মিশরীয়) মৌমাছি ছিল। তিনি নতুন জাতের শংকর মৌমাছি জন্মানোর চেষ্টা চালান। চেস্‌নোকোভা সার্বিক ভাবেই চিন্তা করেছেন যে, সত্তর দশকে মেণ্ডেল মৌমাছি নির্বাচন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে 'ত্রিয়াস্কো' ও 'ভোযকে' বহুপতিত্ব (Polyandry) আবিষ্কার করার পর এবং ম্যাকেন্‌জে ও রবার্ট কৃত্রিম শুক্র নিষেকের কৌশলের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করার পরই এ ক্ষেত্রে সাফল্য আনা সম্ভবপর হয়েছিল।

আন্দ্রেই জ্বারেভ্ (১৮২৩-১৯০২), আইন অধ্যয়ন করলেও মৌমাছি পালনের বিশেষজ্ঞ ও তার সক্রিয় প্রচারক হয়ে ওঠেন। ঘটনাক্রমে তিনি মৌমাছি পালক হলেও এতে এমনভাবে এগিয়ে যান যে কখনও আর পিছন দিকে তাকাননি। বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি বার্ট্রান্ড ও কাওয়ানের মত বিশিষ্ট মৌমাছি পালকের সাথে পরিচিত হন। অধ্যাপক আ. ম. ব্‌তলেরভের ম্‌ত্যুর পর জ্বারেভ্ 'র্‌সকীই প্‌চেলোভোদ্‌নীয় লিস্‌তক' এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও তিনি ঝেয়ারজনের 'মৌমাছি পালন' এবং কোয়ানের 'ইংরেজ মৌমাছি পালকদের নির্দেশিকা' বইটি র্‌শ ভাষায় অন্‌বাদ করেন (যথাক্রমে ১৮৬০, ১৮৮৭)। তাঁর প্রাণবন্ত ও ফলপ্রস্‌ কাজের জন্য জ্বারেভ্ র্‌শী মৌমাছি পালক সমিতর সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন এবং জেনেভা শিল্প প্রদর্শনীতে রৌপ্য পদক ও ১৮৯৬ নিঝ্‌নিনোভ্‌গোরোদে অন্‌ষ্ঠিত নিখিল রাশিয়া শিল্প প্রদর্শনীতে ডিপ্লোমা (দ্বিতীয় শ্রেণী) লাভ করেন।

এফ. ডব্লিউ. ভোগেল (১৮২৪-১৮৯৭) যখন সর্বপ্রথম মৌমাছি বসতির সাথে পরিচিত হন তখন তাঁর বয়স মাত্র ছ'বছর। কিছ্‌দিনের মধ্যেই তিনি স্থানীয় একজন মৌমাছি পালকের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। ছেলেবেলায় একদিন ভোগেল মৌমাছিকে একটুও ভয় না করে প্রতিবেশী এক মৌমাছি পালকের মৌচাক থেকে মধ্‌ নিষ্কাশনে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ধ্‌ম প্রয়োগ যন্ত্র ব্যবহার করে লক্ষ্য করেছিলেন মৌবসতির জীবনযাত্রা। মৌমাছিপালকের কাছ থেকে প্‌রস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন কয়েক টুকরো মধ্‌কোষ। কিশোর ভোগেলের সে কি উল্লাস! দৌড়ে মায়ের কাছে ছ্‌টে গিয়ে সব কথা খ্‌লে বলেছিলেন।

মৌমাছিদের প্রতি ফ্রেডারিকের উৎসাহ ও ঝোঁক দেখে তার বাবা নয় বছর বয়সে তাঁকে একটা মৌচাক উপহার দেন। পরবর্তীকালে ভোগেল ঘটনার স্ম্‌তিচারণ করেছেন এভাবে: 'যেদিন আমি মৌচাকটা উপহার পেলাম আমার শৈশবের সেই দিনটি ছিল আমার জীবনের এক মস্তবড় দিন'। 'দণ্ডে ঝুলানো আমার সেই প্রথম মধ্‌কোষটা বের করে নিয়ে আমার হব্‌ স্ত্রীর কাছে গেলাম; তখন আনন্দে উল্লাসে তাকে নয়, প্যাস্তর ঝেয়ারজনকে আমার চুম্‌ দিতে ইচ্ছে হল।' লিখতে গিয়ে এভাবেই উৎসাহী মৌমাছি পালক হিসেবে নিজেকে বিচিত্র করেছেন

তিনি। ছেলেবেলার সখ তার সারা জীবনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বহু বছর ধরে জার্মান মৌমাছি পালকদের সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন।

আলেক্সেই আন্দ্রিয়াশেভ (১৮২৫-১৯০৭): কিয়েভ বাল্যবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক থাকাকালে মৌমাছিদের সান্নিধ্যে আসেন। তার আগ্রহ এতই ঐকান্তিক ছিল যে মৌমাছি পালনকে তিনি তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের অন্তরে গেঁথে দেয়ার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। অধস্তন শিক্ষকদের সহায়তায় ১৮৬০ সালে তিনি একটি আদর্শ পরীক্ষামূলক মৌশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৌমাছি পালনকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেন।

তার উদ্যোগেই ১৯০২ সালে কিয়েভে মৌমাছি পালকদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পর তা অবশ্য কিয়েভের কাছে বোয়ারকায় স্থানান্তরিত হয় (১৯০৭ সালে)। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর মৌমাছি পালকদের বোয়েরকা কারিগরী বিদ্যালয় বহু বছর ধরে চালু ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠা ও ৮০টি মৌচাক সমেত নিজের মৌশালা তাতে দান ক'রে আন্দ্রিয়াশেভ তার নিজের সঞ্চয়ের ২০ হাজার রুবল খরচ করেন।

অধ্যাপক আ. ম. বুতলেরভ (১৮২৮-১৮৮৬) — একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ। বিজ্ঞানভিত্তিক মৌচাষের তিনি জনক। এ ছাড়া তিনি 'রুস্কিই প্চেলোভোদনিই লিস্তক' (রুশী মৌমাছি পালনের সংবাদপত্র) পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৪ সালে তিনি রুশ বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য হন। কাজান ও সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন চর্চার ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, একবার মৌমাছির যাদুর স্পর্শে এলে তা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি তাঁর ছুটির দিনগুলো ব্যয় করতেন কাজান প্রদেশের বুৎলেয়ভকা গ্রামে। সেখানে তিনি যে ১০০টির মত মৌবসতি লালন-পালন করতেন তার মধ্যে ককেশীয়, ইতালীয় ও রুশী জাতের মৌমাছিও ছিল। তার মৌউদ্যান ছিল সুধাময় বহুজাতের ফল, পুষ্পের উদ্ভিদরাজিতে পরিপূর্ণ।

১৮৬৭-৬৮ সালে প্রুশিয়ায় তাঁর ভ্রমণকালে ঝেয়ারজন, ইয়ান বারলেপ্শ্ সহ অনেক জার্মান মৌপালকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ১৮৭১ সালে মুক্ত অর্থনীতি সমিতির এক সভায় তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক

মৌমাছি পালনকে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে কতিপয় পদক্ষেপের বিষয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তিনি মৌমাছি পালকদের একটি বিশেষ সংগঠনে সমবেত হওয়রা উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নিজের এবং তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদের (কান্দ্রাতিয়েভ্, ইজেরগির, কাবলুকভ্, কুলাগিন প্রমুখ) উদ্যোগে মুক্ত অর্থনীতি সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট মৌমাছি পালন সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৮৮৬ তে তিনি উল্লিখিত সাময়িকী প্রকাশের কাজ সংগঠিত করেন এবং তার প্রথম সম্পাদক হন।

লেভ্ তল্স্তোয় (১৮২৮-১৯১০): এই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সারা জীবন মৌমাছিতে বিভোর ছিলেন। শৈশবে প্রায়ই তিনি তাদের পারিবারিক এস্টেট ইয়াস্নায়া পোলিয়ানা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে আভসিয়াননিকোভার মৌমাছিশালা দেখতে যেতেন। সেখানকার বুড়ো মৌমাছিপালকের সাথে মৌমাছি নিয়ে আলাপ-সালাপ করে তিনি দারুণ আনন্দ পেতেন। বুড়োটা নিজের হাতে সবকিছু করত বলে তাকে তিনি রবিনসন বলে ডাকতেন। কিশোর বয়সী তলস্তোয়কে প্রায়ই বলতে শোনা যেত যে, বড় হলে তিনি ঐ বুড়োর মতই সারাটা জীবন কাটাবেন। ১৮৬৩ সালে কিছু মৌমাছি তার নিজের হলে তিনি নিজেই সেগুলোর দেখাশুনা করতে লাগলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি লিখলেন: 'আমি পুরোদস্তুর মৌমাছি পালক হয়ে গেছি।' ১৮৮৫ তে তার স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেয়েভ্না তাঁর রোজনাম্চার এক জায়গায় লেখেন: 'মৌশালাটাই এখন তাঁর কাছে সমস্ত পৃথিবী। বাড়ীর কারুর মৌমাছি নিয়ে না মেতে উপায় নেই'। তাঁর রচনায় তল্স্তোয় মৌমাছির জীবন ও মৌচাকের নিরাময়িক সৌন্দর্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাসে লেভিনের মৌবাগিচার বিচিত্র শোভা ও মৌমাছির মনোমুগ্ধকর জীবন প্রকৃতির এক বিস্ময়। এখানে মানুষ প্রকৃতির সামনে দাঁড়ায়। মহাকাব্যিক উপন্যাস 'সমর ও শান্তি'তে কৃতজ্ঞ বিহীন মস্কোকে তুলনা করা হয়েছে রাণীহীন মৌচাকের সাথে। আবার 'পুনরুত্থান' উপন্যাসে তিনি লিখেছেন: 'মমতা ছাড়া মৌমাছির কাছে যেমন যাওয়া যায় না, প্রেম ছাড়াও তেমনি মানুষের কাছে নয়। এমনি হল মৌমাছির চরিত...।'

নিকোলাস ওয়াগনার (১৮২৯-১৯০৭): ২৫ বছরে ডি. এস. সি

ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ৩১ বছর বয়সে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন। মৌমাছি তার সুখ, স্বাস্থ্য ও অনুপ্রেরণার সার্বক্ষণিক উৎস ছিল।

ইভান লিউবারস্কি (১৮৩২-১৯০১): মৌমাছির হুলের বিষ ব্যবহারের দিশারী। তিনি যে মৌমাছি-ফুল পরিবহক (bee-flower conveyor) প্রকল্পের উদ্ভাবন করেন তার বাস্তব কার্যকারিতা এখনও বহাল রয়েছে। ১৮৮৫ সালে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আমার কল্পনা উদ্ভট ছিল না। বরং সে ছিল একটা স্বপ্ন যা হয়তো কোন দিন ইউক্রেনের কোন এক ছোট প্রান্তে বাস্তবায়িত হবে।' অক্টোবর বিপ্লবের পর ডাঃ লিউবারস্কির সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

আনাতোলি বোগদানভ (১৮৩৪-১৮৯৬) রাউলিয়ের-এর অধীনে প্রাণিবিজ্ঞান ও মৌমাছিতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৫৮ সালে তাঁরই উত্তরসূরী হিসেবে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। অত্যন্ত মেধাবী এই প্রাণিবিজ্ঞানী রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমীর পত্র-সদস্য নির্বাচিত হন। শতাধিক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ইজমাইলোভা মৌশালার তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

তিনি এমন এক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যেখান থেকে অধ্যাপক ন. ভাগনার, অধ্যাপক ন. নাসেনভ্, অধ্যাপক কোঝেভ্নিকভ্ প্রমুখের মত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এসেছে। বোগদানভ রুশ মৌমাছি পালক সমিতির সম্মানীয় সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই সমিতি তার নামানুসারে বোগদানভ্ পদক প্রবর্তন করে। বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতি বছর এই পদক দেয়া হয়ে থাকে।

গেনাদি কান্দ্রাতিয়েভ (১৮৩৪—১৯০৫)-এর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর এবং ইটালীতে পড়তে যাওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মিলানের বিখ্যাত La Scale অপেরা হাউজে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শুরু করেন। রাশিয়ায় ফেরার পর তিনি পিটার্সবুর্গের মারিইন্স্কি থিয়েটারে (বর্তমানে লেলিনগ্রাদের কিরোভ অপেরা ও ব্যালে থিয়েটার) প্রধান প্রযোজক হিসেবে কাজ করেন। আগেই বলা হয়েছে তিনি অধ্যাপক আ. ম. বুতলেরভের পরামর্শে মৌমাছি পালনকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং শীঘ্রই এক বিরাট মৌশালার মালিক হন। প্রায়ই সফরে বের হলে কান্দ্রাতিয়েভ সমসাময়িক বিখ্যাত মৌমাছিপালকদের সাথে সাক্ষাৎ

করতেন এবং সেখানেই তাদের পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা করে দেখতেন। ১৮৯২ সালে তিনি মৌমাছি পালন সংক্রান্ত বিদেশী রচনার বুলেটিন 'ভেস্‌ৎনিক ইনোস্‌ত্রানেই লিতেরাতুরী প্‌চেলোভোদ্‌স্তভা' প্রকাশনায় কাজ সংগঠিত করেন। এ ছাড়াও তিনি ল্যাঙস্‌ট্রথের 'মৌচাক ও মধুমক্ষিকা', কুকের 'মৌমাছিপালকের সঙ্গী', বার্ট্রান্ডের 'মৌমাছি পরিচর্যা', ডা: আ. ডুবিনির 'মৌমাছি পালনের ব্যবহারিক দিক' এবং দদোঁ-এর 'দদোঁ মৌচাকের বিবরণ' গ্রন্থের রুশী সংস্করণগুলি সম্পাদনা করেন। কান্দ্রাতিয়েভ তাঁর নিজের মৌশালায় নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালান এবং তা থেকে তাঁর এই প্রত্যয় জন্মায় যে, সরঞ্জাম-সজ্জিত উপযুক্ত মৌবাগিচা সত্যিকারের প্রাকৃতিক হাসপাতাল (এই কাজে নিবিষ্ট হয়ে তিনি মারাত্মক স্নায়বিক রোগ থেকে ভাল হয়ে ওঠেন)।

জর্জেস লেয়ান্স (১৮৩৪-১৮৯৭), লিলিতে কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করেন। মৌমাছিপালনে তার জীবনব্যাপী আগ্রহ দেখা যায়। তিনি অনুভূমিক মৌচাকের উদ্ভাবক এবং তা তাঁর নামে পরিচিত। ১৮৭৪ সালে তাঁর 'মৌমাছি পালনের ভূমিকা' প্রকাশিত হলে তিনি ফ্রান্স ও রাশিয়ায় বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ১৮৯০ থেকে (মৌমাছি পালকদের প্রথম কংগ্রেসের পর) মৃত্যু পর্যন্ত লেয়ান্স ফরাসী মৌমাছি পালক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

আলেকসান্দার উস্‌পেন্‌স্কি (১৮৩৫-১৯০২) বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে প্রথমসারির প্রবক্তা। তার জনপ্রিয় ও চমকপ্রদ বই 'প্‌চেলোভোদস্‌ত্‌ভো সামোউচিতেল দ্‌লিয়া শ্‌কোল ই নারোদা', উপ্রোঝেস্নো ই চিস্‌তো প্রাকতিচেস্‌কোয় (স্কুল ও সাধারণের জন্য সহজ ও পুরোপুরি ব্যবহারিক শেখার বই; ১৮৭৯)-এর জন্য তাঁকে প্রথম পিটার পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্যারিস প্রদর্শনীতে খণ্ডিত কাঠের মৌচাক প্রদর্শন করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

আমোস ইভস রুট (১৮৩৯-১৯২৩)-এর সম্পর্কে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মৌমাছি পালনকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিখ্যাত অ্যামেরিকান প্রচারক। তাঁর 'মৌচাষের অআকখ' (১৮৭৭) গ্রন্থের (বইটি রুশ সহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে) ভূমিকায় তিনি ১৮৬৫ সালের আগস্ট মাসের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সেদিন তার মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক মৌমাছি উড়ে গিয়েছিল। তার আগ্রহ দেখে

তার এক সহকর্মী জানতে চাইল মৌমাছির ঝাঁকটাকে প্যাকড়াও করলে সে তাকে কত দেবে। কাজটা অসম্ভব ভেবে রুট এক ডলার দিতে রাজি হলেন। সহকর্মীটি যখন একটা বাক্সে করে মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে এলো তখন তা দেখে রুট বিস্ময়ে হতবাক। সেদিন থেকে নিছক মৌমাছি দেখায় নিজেকে আটকে না রেখে রুট জনে জনে জিজ্ঞেস করে তাদের সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিতে লাগলেন।

মৌমাছি নিয়ে প্রথম যে বইটি তিনি পড়েন তার কথাও তিনি স্মরণ করেছেন। অন্য এক কাজে 'ওহিও'র ক্লেভল্যাণ্ডে গেলে বইয়ের দোকানগুলোতে বই খোঁজা ছাড়া আর কিছুই তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হল না। তিনি দুটো মাত্র বই পেলেন এবং ল্যাংস্ট্রথের বইটাই তার পছন্দ হল। কারণ, তাতে পাঠক গভীর মমতার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। বাড়ী ফেরার পথে বইটি পড়া শুরু করে তিনি বুঝলেন এ এক সত্যিকারের রত্নভাণ্ডার। অজানা অন্য কিছু তার কাছে এত মোহনীয় মনে হয় নি। এমনকি রবিনসন ক্রুশো পর্যন্ত এর কাছে কম আকর্ষণীয় মনে হল। আর যে ভাবনাটি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল তা হল, তাঁর পড়া এই বিস্ময়কর প্রাণীদেরকে বাড়ীতে বসে দেখা ও বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে, তার জন্য দূর দেশে যেতে হবে না।

কয়েক বছরের মধ্যে রুট তাঁর মৌশালায় মৌমাছি বসতির সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৫টি করে কিছুটা সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু শীতকাল পার হবার পর কোন মতে মাত্র ১১টা রক্ষা পেল। প্রতিবেশী ও বন্ধুরা সাথে সাথেই বলাবলি শুরু করে দিল, 'এ আমরা আগেই বলেছিলাম।' কিন্তু মোটেও ক্ষান্ত না হয়ে বিপুল উদ্যমে তিনি কাজ চালিয়ে গেলেন এবং একটা গ্রীষ্মের মধ্যেই তার মৌশালায় মৌচাকের সংখ্যা ১১ থেকে ৪৮-এ পেঁছিল এবং তা থেকে এক বছর পরে ২৭৮০ কিলোগ্রাম মধু পাওয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি 'মৌচাষে মধুকরী' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা বের করলেন। এভাবে একটা বাজি হারার ফলে যে আগ্রহ তার জেগেছিল তাই তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিল। তাঁর 'মৌমাছি পালনের অআকখ' এবং 'মৌমাছি পালনের অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু' বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং তা এখনও এ বিষয়ে সেরা বইগুলোর একটি।

টি. ডব্লিউ. কোম্যান (১৮৪০-১৯২৬): প্রকৌশলী ও প্রথম সারির

মৌমাছি পালক। কোয়ান একজন প্রকৌশলীর সন্তান। তাঁর জন্ম রাশিয়ায়। ১৮৬০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সফর করে তিনি মৌমাছি সম্পর্কে প্রাণবন্তভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বৃটিশ মৌমাছিপালক এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে এবং তিনি তাঁর সভাপতি হন। তিনি একটি মধু নিস্কাশক যন্ত্র বানান এবং তা তাঁর নামে প্রচলিত আছে। বৃটেনের মৌমাছি চাষে বিপুল অবদানের জন্য লন্ডন মৌমাছি পালক ক্লাব ১৯২৩ সালে তাকে স্বর্নপদকে ভূষিত করে। তিনি কয়েকটি বইও প্রকাশ করেছেন: 'ইংরেজ মৌমাছি পালকের নির্দেশিকা' (১৮৮৭), 'মধু মক্ষিকা' (১৮৯৫) ও 'মোম' (১৯১১)।

ইভান ত্রুবিনিকভ (১৮৪৪-১৯০৬): প্রকৌশলী হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কিন্তু পেশা ও নেশা হয়ে ওঠে মৌমাছি পালন। রাশিয়ায় মৌমাছি পালনের উন্নতি সাধনে তিনি অনেক কিছু করেছেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে তার ৫০ টিরও বেশী চমকপ্রদ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

গিলবার্ট ডুলিটল (১৮৪৬-১৯১৮), আমেরিকান মৌমাছি পালক। চাকের অবিকল প্রতিরূপ সহ নির্মিত বিশেষ আধারে শূককীটকে স্থানান্তরিত করে রাণী মৌমাছি লালন-পালনের নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য তিনি বিখ্যাত। ১৮৮৯ সালে তাঁর 'বিজ্ঞান সম্মত ভাবে রাণী মৌমাছি লালন-পালন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

থিওফাইল ৎসেসেলস্কি (১৮৪৬-১৯১৬) লভোভ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও স্লাভোনিক মৌচাকের উদ্ভাবক। তিনিই প্রথম দেখান যে, 'ফাউল ব্রুড' রোগের কারণ ছত্রাকে (fungus) নয়, ব্যাকটেরিয়া।

মৌচাষের ইতিহাসে ৎসেসেল্স্কির স্থান সহজাত গবেষক, দক্ষ শিক্ষক এবং অসাধারণ মৌমাছি বিশারদের। তাঁর দুই খণ্ডের 'বাণিজ্যিক মৌমাছি পালন বা বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী'; 'সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা বা লাভজনক মৌউদ্যান' এবং তাঁর 'মধুসুরা তৈরী বা মধু ও ফল থেকে পানীয় উৎপাদনের কলাকৌশল' পোলিশ ও রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তার কয়েক সংস্করণ হয়।

সের্গেই গ্লাজেনাপ (১৮৪৭-১৯৩৭): বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর সম্মানীয় সদস্য, প্যারিস একাডেমীর দ্রাঘিমা ব্যুরোর পত্র-সদস্য, কৃতী বৈজ্ঞানিক ও শ্রমবীর

খেতাবে ভূষিত। মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম কাতারের র‍ুশ বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক আ. ম. ব‍ুতলেরভ-এর পরামর্শে তিনি ১৮৮৬ সালে মৌমাছিদের নিয়ে কাজ শ‍ুর‍ু করেন এবং দীর্ঘ ২৪ বছর তিনি ভেস্তনিক র‍ুশকোভা অব‍্শেস্ত‍্ভো প‍্চেলোভোদস‍্ত্ভা' (র‍ুশী মৌমাছি পালক সমিতির অগ্রদ‍ূত) নামে সাময়িকী সম্পাদনা করেন। গ্লাজেনাপের 'মৌমাছিশালা ছাড়া কোন বাগান নয়, মৌমাছি ছাড়া কোন ফল নয়' শ্লোগানটি উদ্যান পালকের ক্ষেত্রে মৌমাছির প্রয়োজনীয়তার উপর গ‍ুর‍ুত্ব আরোপ করে।

১৮৯১ সালে সেন্ট পিটার্সব‍ুর্গে র‍ুশী মৌমাছি পালক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে গ্লাজেনাপ তার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে তিনি সদস্যদের মাসিক সভা সংগঠিত করেন, সমবায় যন্ত্রপাতি, মধ‍ু, মোমের একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার গড়ে তুলতে দেশের সেরা মৌমাছি পালকদের তিনি উদ্ব‍ুদ্ধ করেন। ১৮৯১ সালে অন‍ুষ্ঠিত মৌমাছিপালকদের প্রথম র‍ুশ কংগ্রেসে এবং সাত বছর পর একাতেরিনোদারে (বর্তমান ক্রাস‍্নোদার) অন‍ুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি একজন সক্রিয় প‍ৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০০ সালে তিনি প্যারিস প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

গ্লাজেনাপ মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে ৩০ বছর ধরে বিরামহীন, একনিষ্ঠ কাজ করেছেন। ১৯২৬ সালে তিনি 'ক্ষ‍ুদে মৌবাগিচা' নামে ছোট অথচ মজার একটি বই প্রকাশ করেন।

কাজিমির ল‍ুাইস্কি (১৮৪৭-১৯০২): পোল্যান্ডের মৌমাছি পালক। তিনি একটা মৌচাক আবিষ্কার করেন যা আজও তাঁর নামের স্ম‍ৃতি বহন করে। পোল্যান্ড ও রাশিয়াতে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও স‍ুইজারল্যান্ডে পড়াশ‍ুনা করেছেন। 'মৌচাষ' নামে তার বইটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে।

ভাসিলি ভাশচেনকো (১৮৫০-১৯১৮): পোলতাভা'র কাছে পিরিয়েস্লাভ‍্ল‍্-এ ছেলেবেলায় মৌমাছির সাথে তাঁর প্রথম বন্ধ‍ুত্ব হয়। তিনি কিয়েভে মৌমাছি পালনের উপর অনেক প্রদর্শনী সংগঠিত করেন। পরে মৌমাছি পালন বিভাগের সভাপতি হিসেবে ১৯১৩ সালে নিখিল র‍ুশ প্রদর্শনী সংগঠিত করেন এবং তার প্রচুর ব্যয়ভার নিজেই বহন

করেন। বোয়ারকা মৌমাছি পালন কারিগরী বিদ্যালয় সম্প্রসারিত করার জন্যও তিনি অনেক কর্মশক্তি ব্যয় করেন। ১৯০৭ সালে তাঁকে এই স্কুলের ভার দেয়া হয়েছিল এবং পরে তিনি এ স্কুলের বোর্ডের চেয়রাম্যান হন। তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে স্কুলের একটি দ্বিতল অংশ নির্মাণ করে দেন।

ইভান ক্লিংডেন (১৮৫১-১৯১২): একজন বিশিষ্ট কৃষিবিদ। তিনি মৌমাছির সাহায্যে পরাগ সংযোগের জন্য যথেষ্ট কর্মশক্তি ব্যয় করেন এবং পরাগ সংযোগের মাধ্যমে ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক পরীক্ষা চালান। বিশেষভাবে লাল ক্লোভার ফুলের উপর এই পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি মৌমাছি ও ক্লোভার বীজের উৎপাদনের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও সঠিক নানা সিদ্ধান্ত টানতে সক্ষম হন।

ফ্র্যাংক বেঁতোঁ (১৮৫২-১৯১৯): বিশিষ্ট মার্কিন মৌমাছি পালক। ডাকযোগে মৌমাছি পাঠানোর কাজ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দিশারী। তিনি বহন ও স্থানান্তরযোগ্য 'রাণী উৎপাদন কুঠুরি' (queen brood chamber) আবিষ্কার করেন। মৌচাষের উপর ব্যাপক পড়াশুনা করার পর তিনি বিভিন্ন জাতের মৌমাছি ও ভারতীয় বড় মৌমাছি পোষ মানানোর সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এই জাতের ভারতীয় মৌমাছি প্রচুর পরিমাণে মধু উৎপন্ন করে এবং 0° সে.-এর নীচের তাপমাত্রায়ও মৌচাকের বাইরে যেতে পারে। ১৯০৫ সালে বেঁতোঁ বাকু থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মৌমাছি ও ককেশীয় রাণী মৌমাছি পাঠান এবং এভাবে সারা পৃথিবীতে এদের পরিচিত করেন। তিনি বিভিন্ন জাতের মৌমাছি (ককেশীয়, ইতালীয় এবং প্যারস্য ও সাইপ্রাস ইত্যাদি দেশের) সংগ্রহ করার জন্য বিখ্যাত হন। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের প্রথম মৌচাষ শাখার পরিচালক হবার সম্মান লাভ করেন এবং এই পদে কয়েক বছর নিযুক্ত থাকেন।

১৯০০ সালে আ. ই. রুট এবং এ. র. রুট নিউইয়র্কের অ্যামেটিতে বসবাসরত ইটার ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যকার বিবাদের কথা জানিয়েছেন। দুই ভাইয়ের একজন ছিল মৌমাছি পালক ও অন্যজন ফল উৎপাদনকারী। ফল উৎপদানকারী ভাইয়ের অভিযোগ তার ভাইয়ের মৌমাছি সব ফল খুঁটে খুঁটে খেয়ে তার খুব ক্ষতি করেছে। এ জন্য সে তার ভাইকে

আদালতে হাজির করে। ১৯০০ সালের ১৭-১৯ শে ডিসেম্বর এই মামলার শুনানী হয়। লড়াইটা ছিল প্রচন্ড, কারণ এর 'আসামী' ছিল মৌমাছিকুল। সরকারী কৌশুলী ফ্র্যাঙ্ক বেঁতোঁ কে ধন্যবাদ যে তার অভিজ্ঞতাপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণে শেষ পর্যন্ত আসামীরা খালাস পায়। দুই বছর পরে উদ্যান পালক ভাইটি অন্য ভাইয়ের কাছে গিয়ে তার মৌমাছির খামারটি তার ফলের বাগানে স্থানান্তরিত করার অনুরোধ জানালো। কারণ, মৌমাছিরা চলে আসার পর থেকে তার ফল গাছগুলো মঞ্জরিত হচ্ছিল কিন্তু কোন ফল ধরছিল না।

এক্ষ্লাম্পি কামেনেস্ক (১৮৫৩-১৯২২): যৌবন কাল থেকেই মৌমাছি পালনে আবেগপূর্ণ আকর্ষণ অনুভব করেন। ৩৫ বছর বয়সে তিনি কৃত্রিম মধুকোষ ঢালাই করার জন্য খোদাই করা সিলিন্ডার উদ্ভাবন করেন। তিনি দুই বছর ধরে সেন্ট পিটার্সবুর্গ, কিয়েভ, মস্কো ও অন্যান্য শহরে প্রদর্শনী করে তার উদ্ভাবিত যন্ত্রের নক্শা প্রদর্শনে বহু সময় ও কর্মশক্তি ব্যয় করেন। প্রদর্শনী ও মৌমাছি পালক সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষামূলক কাজেও তিনি অনেক অবদান রাখেন। তিনি গবেষণা চালানোর জন্য ইভানোভা শহরের প্রান্তে গবেষণার উদ্দেশ্যে একটা আদর্শ মৌমাছি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই খামারটি তিনি ইভানোভা ভোজনেসেনস্কি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পতঙ্গবিদ্যা বিভাগকে দান করেন।

পাভেল কুলিশভ্ (১৮৫৪-১৯৩৬) মস্কোতে পেত্রভ (বর্তমান তিমিরিয়াজেভ) কৃষি একাডেমীর একজন অধ্যাপক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমীর পত্র-সদস্য ছিলেন, তিনি পুরস্কার যোগ্য বিজ্ঞানী সম্মানে অভিহিত হন। তিনি কোয়ানো'র লেখা 'মধু মক্ষিকা'র অনুবাদ করেন। নানা রকমের মৌচাক পরীক্ষায় ও মৌমাছি পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসন্ধানে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেন। মৌচাক সংক্রান্ত যে যাদুঘর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তা খুবই বিখ্যাত হয়েছিল।

গাস্ত বনিয়ের (১৮৫৫-১৯২২) সরবোনে উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য। তিনি প্রথমে সভাপতি এবং পরে ফরাসী মৌমাছি পালক সমিতির সম্মানীয় সদস্য হন। জর্জ লেরান্সের সাথে একত্রে লেখা তাঁর 'মৌমাছি পালনের পুরো পাঠক্রম' বইটি রাশিয়ায় প্রকাশিত হয়।

ইভান মিচুরিন (১৮৫৫-১৯৩৫) একজন বিখ্যাত বর্ণসংকর প্রাণিবিদ ও প্রকৃতি রূপান্তরকারী। তিনি বলতেন, 'আমরা এটা আশা করতে পারিনা যে, প্রকৃতি আমাদের দিকে নিজেই তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। আমাদের কাজ হচ্ছে, তার কাছ থেকে সকল সুবিধা জোর করে আদায় করে নেয়া।' শিশুকাল থেকেই মিচুরিন মৌবাগিচায় তাঁর বাবাকে সাহায্য ক'রে ও কর্মব্যস্ত মৌমাছিদের দেখে আনন্দ পেতেন। তাম্‌বোভে তাঁর ঐতিহাসিক এস্টেটে সব সময়ই একটা-না-একটা মৌখামার থাকত। তার কারণ, পতঙ্গ পরাগায়নে অভিযোজিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মৌমাছিকেই মিচুরিন সবচেয়ে ভাল পরাগসংযোগী বলে মনে করতেন।

নিকোলাস্ নসোনভ্ (১৮৫৫-১৯৩৩) মস্কো এবং ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য। রুশী মৌমাছি তত্ত্ববিদদের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই মৌমাছি সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন ও অধ্যাপক বোগদানভ তাঁকে ইজমাইলোভে মৌমাছিশালায় প্রাণিবিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়ে যান। পরে তার উপর মৌউদ্যানের ভার দেওয়া হয়। মৌমাছির সৌরভ গ্রন্থি (aromatic gland) উদরের শেষ প্রান্তের ও তার পূর্ববর্তী খন্ডকের মাঝখানে অবস্থিত — তা আবিস্কার করার পর নাসানোভ বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্মানে মৌমাছির এই গ্রন্থিকে নাসানোভ গ্রন্থি বলা হয়। মৌমাছি পালনকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় ব্যাক্তিত্ব।

ইভান কাব্‌লুকভ (১৮৫৭-১৯৪২): বিশিষ্ট মৌমাছি বিশারদ ও রসায়নবিদ। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৈশিষ্ট্য সহ স্নাতক পাশের পর তিনি অধ্যাপক আ. ম. বুতলেরেভের অধীনে পড়াশুনা করেন। এই অধ্যাপক একই সাথে তাঁকে মৌমাছিপালনে ও রসায়ন শাস্ত্রে আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে কাবলুকভ প্রাণী ও উদ্ভিদের জলবায়ু অভ্যস্ততা সমিতিতে মৌমাছি পালন বিভাগ প্রবর্তন করেন (পরে তিনি এই বিভাগে সভাপতি হন)। বুতলেরভের মৃত্যুর পর তিনি রাশিয়াতে মৌমাছি চাষের ক্ষেত্রে সেরা বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হন। তাঁর চেষ্টায় বিশেষ ট্রেন ও জাহাজে করে জায়গায় জায়গায় ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হয়। হাজার হাজার কৃষক এই চলমান

প্রদর্শনী দেখতে আসেন এবং পরে মৌমাছি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কাবলুকভের এই কর্মক্ষেত্র শুধু তাঁর দ্বিতীয় পেশা ছিল না বরং এই ছিল তার প্রধান সৃষ্টিশীল প্রেরণার উৎস। ১৯৩৩ সালে কাবলুকভ সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন। উজবেক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিশেষ রাষ্ট্রীয় মৌমাছি খামারে তার নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৪২ সালে তিনি তাশখন্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আনাতোলি বুৎকেভিচ (১৮৫৯-১৯৪২) ওরেল রিয়ালশুলে পড়াশোনা শেষ করার পর পেত্রভ কৃষি একাডেমীতে ভর্তি হন। অবশ্য প্রথম বছরের পরে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তাঁকে সাইবেরিয়ার তোবোল্স্ক প্রদেশে নির্বাসন দেওয়া হয়। নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তিনি ক্রাপিভ্কায় (তুলা প্রদেশ) একটি খামারে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে তিনি ১৮৯৪ সালে মৌমাছির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি সবসময় বলতেন যে, গ্রাম্য পেশাগুলির মধ্যে মৌমাছি পালন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রতিদানকর পেশা। তাঁর কাছে মৌমাছি পালন শুধু লাভ জনকই ছিল না, বরং উম্মুক্ত পরিবেশের সকল পেশার মধ্যে এটিকে তিনি সবচেয়ে কাব্যিক বলে মনে করতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, কাঠামো মৌচাক যেমন অধিক লাভজনক তেমনি তা কোনভাবেই মৌচাকের ঐতিহ্যবাহী কাব্যিক সৌন্দর্যকে খর্ব করে না।

ভাসিলি ইজেরগিন (১৮৫৯-১৯১০) মৌমাছির খামারে তার বাবাকে সাহায্যে করতে গিয়ে ছেলেবেলাতেই মৌমাছির সংস্পর্শে আসেন। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন একদিন সিমবির্স্ক (বতমান উলিয়ানোভস্ক)-এ অধ্যাপক বুতলেরভের মৌমাছি খামারে বেড়াতে যান। সেখানে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং তিনি অতিথি হয়ে সেখানে এক সপ্তাহ থাকেন। বুতলেরভ্ এই ছোট ছেলেটিকে তার কাজ কর্ম সম্পর্কে সব বলেন এবং মৌমাছির খামারটি কেমন করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তা দেখান। ইজেরগিন তাঁর এই বেড়ানোর স্মৃতিটুকু সব সময় অপূর্ব রোমাঞ্চকর অনুভব নিয়ে স্মরণ করতেন। মস্কো ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক পাশ করে (ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে) ইজেরগিন রুশী সাহিত্য পড়তে শুরু করেন। একই সাথে তিনি মৌমাছি পালন সংক্রান্ত বিদেশী বই রুশী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ল্যাংগসট্রথের 'মৌচাক ও মধুমক্ষিকা' (১৮৯২ ও ১৯০২), ফন্

বারলেপ্‌শ্‌-এর 'মৌবাগিচার পরিচর্যা' (১৮৯৩), লেয়ান্স-এর 'আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মৌমাছিদের পরিচর্যা' (১৯০৪)। এছাড়াও তিনি তখনকার জনপ্রিয় 'বিদেশী সাহিত্য ও মৌচাষ বিষয়ক বুলেটিন' সম্পাদনা করেন। ইজেরগিন রুশী মৌমাছি পালক সমিতির পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সেই যোগ্যতায় তিনি রাশিয়ায় কাঠামো মৌচাকের ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক মৌমাছি পালনের পদ্ধতিকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রাখেন।

নিকোলাস কুলাগিন (১৮৫৯-১৯৪০) একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ ও কৃষিবিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য ছিলেন। তিনি একজন নামকরা মৌমাছি বিশারদ। ১৯০৫ সালে নিখিল রাশিয়া মৌমাছি পালকদের যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তা সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। পাঁচ বছর পর সোফিয়াতে মৌমাছিপালকদের প্রথম স্লাভ কংগ্রেসে তাঁকে নিখিল স্লাভ ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। কুলাগিন ১৯১১ সালে দ্বিতীয় নিখিল স্লাভ কংগ্রেস ও ১৯২২ সালে মস্কোতে তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করেন। পেত্রভ (তিমিরিয়াজেভ) কৃষি একাডেমীর মৌমাছি খামারের প্রতি কুলাগিন প্রচুর মনোযোগ দেন। ৪০ বৎসর ধরে তিনি এই খামারের দায়িত্বে ছিলেন। এই খামারটি এখন তাঁর নামে চালু আছে। কুলাগিন মৌমাছি পালনের উপর কয়েকটি আকর্ষণীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে 'মৌমাছির জীবন বিজ্ঞান সম্পর্কে', 'মৌমাছিদের খাওয়ানো', 'মৌমাছির ঝাঁক বাঁধা', 'কাঠামো-মৌচাক নির্বাচন' উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর ধরে কুলাগিনের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ ও কয়েক বার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। এই অমায়িক ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ত্বরিত পদ্ধতিতে ভেষজ মধু আহরণের বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। অধ্যাপক কুলাগিনকে তাঁর অন্যান্য সহ বিজ্ঞানীরা গভীরভাবে সম্মান করতেন, তাঁকে বহু জায়গায় সম্মানিত সদস্য করা হয়। সেগুলি হলো, মস্কো প্রকৃতিবিদ সমিতি, পতঙ্গবিদ্যা সমিতি, প্রাণী ও উদ্ভিদের জলবায়ু অভ্যস্ততা সমিতি, বুলগেরীয় পতঙ্গবিদ্যা সমিতি এবং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

পোর্‌ফির বাখ্‌মেতিয়েভ (১৮৬০-১৯১৩), সোফিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ইনি শুধু বিশিষ্ট গবেষক, জীববিজ্ঞানী ও সুপরিচিত পদার্থ-বিজ্ঞানীই ছিলেন না, বুলগেরিয়ায় প্রথম সারির মৌমাছি পালকদের

মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৬ বছর ধরে পোকামাকড়ের (মৌমাছি সহ) দেহের তাপমাত্রা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি অসীম কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন। তার মৃত্যুর পরেই শুধু এই কাজ বন্ধ হয়। পোকা মাকড়ের দেহের তাপমাত্রা মাপার জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক থার্মোমিটার উদ্ভাবন করেন। ইজ্‌ভেস্তিয়া আকাদেমি নাউক-এ 'কীট পতঙ্গের পুনরুজ্জীবনের বিষয়ে আমার গবেষণার উপসংহার এবং উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহে তার পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা' শীর্ষক রচনায় বাখ্‌মেতিয়েভ এই সাহসী ও প্রতিশ্রুতিশীল ধারণা দেন যে, মৌমাছি পালনে যেমন পুনরুজ্জীবন ব্যবহার করা যেতে পারে (শীতাকালীন খাদ্য ছাড়া হাজার মৌমাছি বসতির অবস্থার কথা ভাবুন তো একবার!) তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও চিকিৎসাবিদ্যায় (যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধে) তা ব্যবহার করা যায়। তাঁর স্বপ্ন এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে কারণ, এখন ওষুধ ও শিল্প উপকরণ রক্ষণের কাজের জন্য শৈত্যের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। ১৯১০ সালে বাখমেতিয়েভকে নিখিল স্লাভ মৌমাছি পালকদের কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পাভেল আরলভ্‌ (১৮৬১-১৯২৮), বিভিন্ন শাখায় পরিবর্ধন সহ সম্প্রসারিত কাঠামো-মৌচাক উদ্ভাবন করেন। মৌচাক বিষয়ে তিনি একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ যিনি ইজমাইলোভের মৌমাছিশালায় ৪২ বছর ধরে মৌমাছিদের মাঝে কাজ করেছেন। তাঁকে মৌচাকের মডেল ১৯০০ সনের প্যারিস প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল এবং সেখানে তাকে গ্রাঁ প্রি (Grand Prix) পুরস্কার প্রদান করা হয়। আরল্‌ভ ছিলেন বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলোতে কাঙ্ক্ষিত, বিশেষ করে যখন আলোচনার বিষয় হলো মৌচাক। এটা সম্ভব হয়েছিল মৌচাক পালন বিষয়ে রুশ বই-পত্রের উপর তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং বিস্তৃত জ্ঞানের কারণে।

ভ্‌সেভোলাদ শিমানোভ্‌স্কি (১৮৬৪-১৯৩৪): কিয়েভ শহরের এক শল্য চিকিৎসকের ছেলে। তাঁর পিতার স্বপ্ন ছিল পুত্র তারই পেশা গ্রহণ করবে কিন্তু তার পুত্রের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। কিয়েভ সামরিক স্কুল এবং মস্কো আর্টিলারী স্কুলের পাঠ শেষে তিনি জেনারেল স্টাফ হেড কোয়ার্টার-এ নিযুক্ত হন। নিজের পছন্দসই চাকুরীতে খুবই সন্তুষ্ট থাকলেও এই তরুণ অফিসারের সাথে পরিচয় ঘটলো প. ই.

কোর্ঝেনেভেস্কির এবং সেই সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তন ঘটালো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কমিশন থেকে ইস্তফা দিলেন এবং কিয়েভ-এর নিকট ভোল্ হিনিয়াতে, গ্রামের এক স্কুল শিক্ষক হিসাবে কাজ করার ও মৌমাছি পালনের জন্য তিনি চাকুরী থেকে অবসর নেন। মৌমাছি খামার দেখাশোনা করা ও গ্রামের ছেলে মেয়েদের মৌমাছি পালন শিক্ষাদানে করাকে তিনি রোমান্টিক পেশা বলে ভাবতেন এবং তার এই ভাবনায় কোন ছেদ পড়ে নি। ১৮৯৯ সালে, মাত্র ৩৩ বছর বয়সে সিমানোভ্স্কি অন্ধ হয়ে গেলেন কিন্তু শিক্ষকতা বা মৌমাছি পালন কোনটাই তিনি ত্যাগ করলেন না বরং প্রয়োজনীয় কাজ করে যেতে লাগলেন। স্ত্রীর সহযোগিতায় ১৯১০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজ মৌমাছি খামারে কাজ করে গেছেন। শীত মৌসুমে বোয়ার্কা বিদ্যালয়ে মৌমাছি পালনের উপর ভাষণ দিতেন।

জন রেনি (১৮৬৫-১৯২৮): কীটতত্ত্ববীদ, পরজীবীবিদ ও অ্যাবেডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন মৌমাছি রোগ বিশেষজ্ঞ এবং বেশ কয়েকটি রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন।

গ্রেগরি কোঝেভ্নিকভ্ (১৮৬৬-১৯৩৮): মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান যাদুঘরের পরিচালক। প্রথম কাতারের মৌমাছি পালকও তিনি ছিলেন। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মৌমাছি পালন পাঠক্রমে মৌমাছির প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপর অনেকগুলো ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯১০ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি ইজামাইলোভা মৌমাছি খামারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের উসুরি এলাকায় তিনি ভারতীয় মৌমাছির সন্ধান লাভ করেন।

আউগুস্ত লুদভীগ (১৮৬৭-১৯৫৩): আকস্মিকভাবে তিনি মৌমাছি সম্বন্ধে জানতে পারেন। ১৮৯১ সালের শরতের এক দিনে তিনি সংবাদপত্রে পড়েন যে, রেভারেও ফার্ডিনান্দ হার্নসটাগ মৌমাছি পালনে উৎসাহী লোকদের জন্য কিছু বলবেন। লুদভীগ সেখানে যেতে মনস্থ করলেন। তিনি কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। শিক্ষকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হলো এবং তিনি তার নিজের ধারণা প্রচার করতে লাগলেন যে, মৌমাছি পরিবার একটি একক মৌমাছি-জীব (Bee organism) গঠন

করে। ১৯২৫ সালে হার্নস্টাগ-এর মৃত্যুর পর লুদভীগ 'তত্ত্বে ও প্রয়োগে জার্মান মৌচাষ' সাময়িকীটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি 'জেনা' বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিজের সংগঠিত গবেষণামূলক মৌমাছি খামারের গঠনে নিযুক্ত হন। তার ৮০ তম জন্মদিনে (১৯ শে জুলাই ১৯৪৭) তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির সম্মানীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর ছাত্র ও বন্ধু ডঃ হ্যানস অস্‌ম্যান বর্তমানে তার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন। ডঃ হ্যানস ১৯৫০ সালে মৌমাছি খামারের পরিচালক নিযুক্ত হন। এই খামারের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন কৃষি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এড্‌মুণ্ড আলফাঁদেরী (১৮৭০-১৯৪১): ফরাসী মৌচাষের অগ্রপথিক। 'মৌচাষ অভিধান' (২ খণ্ডে), 'মৌমাছি পালনের বাস্তব নির্দেশিকা' (৫ খণ্ডে) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি 'মৌমাছি পালনের বিশ্বকোষ' (৫ খণ্ডে) শেষ করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথমদিকেই মৌমাছি সংক্রান্ত প্রথম ছবিটি তার মৌমাছি খামার নিয়েই তৈরী হয়েছিল।

ইপোলিৎ কোরাভ্‌লেভ (১৮৭১-১৯৫১): ২০ বছর বয়সে যখন গ্রামের স্কুলে শিক্ষক তখন তিনি মৌমাছি নিয়ে কাজ শুরু করেন। মস্কোর পেত্রভ কৃষি একাডেমীর ছাত্র থাকাকালীন তিনি উৎসাহের সাথে অধ্যাপক ন. কুলাগিন-এর অধীনে ইজমাইলোভো মৌশালায় কাজ করেন। ১৯০২ সালে স্নাতকপর্ব শেষ করে পেশাদার মৌমাছি শিক্ষক হিসেবে পোলতাভা, খারকভ্‌ ও চেরনিগভ প্রদেশে কাজ করেন এবং উমান উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি স্কুলের (বর্তমানে উমান কৃষি ইনস্টিটিউট) মৌমাছি খামারটি ৪৪ বছর ধরে পরিচালনা করেন। ১৯৪৫ সালে ৭৫তম জন্মদিনে তাঁকে এই ইনস্টিটিউটের সম্মানীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। তিনি অনেকগুলো মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি হচ্ছে 'মৌমাছি পালনের গুরুত্ব ও উপকারিতা', 'মৌমাছির নির্বাচন প্রসঙ্গে', 'মৌমাছির রোগ এবং তার চিকিৎসা', 'সুধাময় উদ্ভিদ ও সেগুলির পরিপোষণ'। ১৯১৭ সালের পরে তার সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং তা কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। **লেওনিদ পোতোখিন** (১৮৭১-১৯১২): গ. প. কান্দ্রাতিয়েভ-এর তত্ত্বাবধানে যুবক বয়সে পিতামাতার এস্টেট-এর মৌমাছি খামারে কাজ করেন। ১৮৮৯ থেকে

একজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা হিসাবে কৃষি বিভাগে কাজ করেন। ১৯০৬ সালে 'বিদেশ ও রাশিয়ার মৌচাকের অগ্রদূত'র সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ইভান সেরবিনভ (১৮৭২-১৯২৫): মৌমাছির রোগের উপর কাজ করেন। জীবাণুবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার পরে রুশ মৌমাছি পালক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। মৌমাছিদের 'ফাউল ব্রুড' রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য অনাক্রম্যতা নিয়ে পরীক্ষা চালান। এজন্য তিনি ফাউল ব্রুড শূককীট দিয়ে তৈরী নির্যাস সহ বিপুল পরিমাণ সম্পূরক খাদ্য মৌচাকগুলিতে সরবরাহ করতেন (কেননা টীকা দান স্বাভাবিক ভাবেই ছিল প্রশ্নাতীত)। মস্কো ও পিটার্সবুর্গ মৌমাছি পালক কংগ্রেসে পঠিত তার নিবন্ধে রাশিয়ায় মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রদর্শনী মৌমাছি খামারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

ইনোক্ জান্দের (১৮৭৩-১৯৫২): ব্যাভারিয়ার ফার্লানিজেন-এ মৌচাষ ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কাঠামো-মৌচাকের নকশা তৈরী করেন; চত্বর-মৌচাকে মৌমাছি চাষের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন; মৌমাছিদের জন্য ইথার ফোঁটা প্রবর্তন করেন এবং নসেমাটসিস (nosematosis)-এর কারণ আবিষ্কার করেন। তার অনেক বই মৌমাছি পালনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে: 'মৌচাষের নির্দেশিকা', 'মৌমাছির জীবন', 'মৌমাছি এবং তার গঠন', 'পচন ও তা প্রতিকারের উপায় এবং মৌমাছি পালন'। অনেক দেশেই তার পাঁচ খণ্ডে রচিত 'ব্যবহারিক মৌমাছি পালন' বইটি প্রামাণ্য বই হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভিক্তোর লোগিনোভ (১৮৭৬-১৯৩১): কাজান পশুচিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি ও বনবিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক থাকাকালীন মৌচাষের উপর ভাষণ দেন। কাজান জেলা পরীক্ষামূলক স্টেশনের মৌমাছি পালন বিভাগ ও মৌমাছি খামারের দায়িত্বে ছিলেন। কাজান মৌমাছি পালন সমিতির অগ্রণী সদস্য হিসাবে লোগিনোভ ভ্রাম্যমান যাদুঘর গঠন করেন। এতে নানা সংগ্রহ-মডেল এবং মৌমাছি পালনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রদর্শন করা হোত। অনেক বছর পরে তিনি লিখেছিলেন, "আমি ঐ ভ্রাম্যমান যাদুঘরের দিনগুলোকে আমার জীবনের অন্যতম সুখের সময় বলে মনে করি।" তাঁর উদ্যোগে ১৯০৬ সালে সমিতির কার্যবিবরণী প্রকাশ করা শুরু হয়। পরবর্তীতে এই

সাময়িকীর নাম 'কাজান মৌমাছি পালন সমিতির পত্রিকা' রাখা হয়।

তাঁর পেশাগত সময়ের অনেকটাই লোগিনোভ মৌমাছির রোগের জন্য দায়ী রোগসঞ্চারী জীবাণুর উপর গবেষণা, মৌমাছির শুঁড়-এর দৈর্ঘ্য মাপার কাজ, মৌমাছির উপর বৃক্ষনির্যাস মধুর ক্ষতিকর প্রভাব নির্ণয় ইত্যাদিতে ব্যয় করেন। তিনি রাশিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদের জলবায়ু অভ্যস্থতা সমিতির অবৈতনিক সদস্য ছিলেন এবং তাঁতার স্বায়ত্বশাসিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সরকার কর্তৃক সম্মানিত হন। লোগিনোভ লিখেছেন, "জীবনযাত্রার অর্থ হচ্ছে মৌমাছির সঙ্গে কাজ করা আর মৌমাছি পালন বন্ধ করার অর্থ হচ্ছে জীবনযাত্রা থেমে যাওয়া। এজাতীয় দর্শন সম্বন্ধে অবগত হওয়া অর্থহীন নয়। এটা পরিপূর্ণ সত্য এবং এ সত্য ঐ সব মৌমাছি বিশেষজ্ঞরা উদঘাটন করেছেন যাদের জীবনের অনেকগুলো বছর এই কাজে ব্যয় হয়েছে।"

খ. ন. আব্রিকোসোভ (১৮৭৭-১৯৫৭): ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত লন্ডনে মৌমাছি পালন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। রাশিয়ায় ফিরে এসে লেভ্ তল্স্তোয়-এর সচিব হিসাবে কাজ করেন এবং লেখকের ভ্রাতুষ্পুত্রী ন. ল. ওবোলেন্স্কায়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর জ্যাতিশিয়ে নামে একটি জায়গায় তিনি ১০০টি ঝাঁকের একটা মৌমাছি খামার গঠন করেন। তল্স্তোয় এই খামারটি প্রায়ই পরিদর্শন করতেন। মৃত্যুর দু'মাসেরও কম সময়ের আগে তিনি এটি শেষবারের মত পরিদর্শন করেন। ল. ন. তলস্তোয় এর রচনায় 'মৌমাছি এবং মৌমাছি পালন' শীর্ষক প্রবন্ধে আবারিকোসভ লিখেছেন তলস্তোয় আমাকে মৌচাষে লেগে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলতেন, কৃষির সব শাখার তুলনায় সবচেয়ে স্বাধীন হল মৌমাছি পালন যা কোন শ্রমিক নিয়োগ না করেই একজন চালাতে পারে এবং যার উপর নির্ভর করে জীবনে টিকে থাকা যায়। একই প্রবন্ধে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'তলস্তোয় এর কাছে আগত এক পরিদর্শক তার কাছে দূর প্রাচ্যের উসুরী এলাকার কৃষকদের কথা বলেছিলেন যাদের মৌচাকের সংখ্যা প্রায় ৬০০টি এবং সেখানে বছরে সাতবার মৌমাছিরা ঝাঁক বাঁধে আর এক একটি চাকে ২০০ পাউন্ডের মত মধু পাওয়া যায়। এটা শুনে তলস্তোয় বলেছিলেন, "আবার যদি যুবক হতে পারতাম তবে ও রকম একটি দেশে চলে যেতাম যেখানে লোকের মুখে পত্রিকা আর রাজনীতির

কথা নাই, আছে মৌমাছি এবং কৃষির কথা'' (৩রা এভেম্বর ১৯০৬)।

ভিক্তোর লেবর্‌ন (১৮৮৩): রাশিয়াতে জন্ম। জাতে ফরাসী। ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি লেভ তলস্তোয়-এর সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ফ্রান্স চলে যান এবং মার্সেইলেসের কাছে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি মৌমাছি পালন করতেন এবং ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগ্‌লোতে মধ্‌ এবং মোম বিক্রি করতেন। তিনি আমাদের বলেছেন যে, ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি মান্‌ষের চাইতে মৌমাছির উপর বেশী নির্ভরশীল ছিলেন এবং সেগ্‌লো কখনোই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

এভগেনি পাভ্লোভস্কি (১৮৮৪-১৯৬৫): সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য, তিনি চেকোস্লোভাকিয়া এবং ইরানের একাডেমীরও সদস্য, সরবন ও দিল্লী বিশ্যবিদ্যালয়ের সম্মানস্‌চক ডক্টরেট প্রাপ্ত, সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর এবং আরো অনেকগ্‌লো সম্মানের অধিকারী। মৌমাছির পরিপাক নালীর গঠন ও কার্য্যাবলী, মৌ-বিষের কাজ এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি বিভিন্ন গবেষণাম্‌লক কাজ করেছেন।

কার্ল ফন্ ফ্রিশ (১৮৮৬): মৌমাছি বিষয়ক গবেষণা এবং মৌমাছির ভাষার অর্থ উদঘাটনের জন্য বিখ্যাত। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে জানা যাবে তাঁরই লেখা অসাধারণ বই 'এক জীববিজ্ঞানীর স্মরণকথা'য় (লণ্ডন ১৯৬৭)।

অধ্যাপক রেমি শ'ভে লিখেছেন, 'আমরা মান্‌ষের দৃ্ষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে যা জানি তার চাইতে বেশী না হলেও তার সমপরিমাণ আমরা মৌমাছির দৃ্ষ্টি ও ঘ্রাণ শক্তি সম্পর্কে জানি এবং আমাদের এই জ্ঞান অর্জন সহজ মৌমাছিদের প্রশংসনীয় উপায়গ্‌লো কাজে লাগিয়ে। এ কারণে ফ্রিশ ও তাঁর সহকর্মী-কে তাদের অমর কার্যাবলীর জন্য ধন্যবাদ দিতে হয়।' অধ্যাপক শভিন এর ধারণা — পাস্তর-এর পর যে সকল গবেষক জীববিদ্যার গৌরবজনক অগ্রগতির জন্য কাজ করেছেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গবেষক সম্ভবত কার্ল ফন্ ফ্রিশ। এই প্রশংসার সঙ্গে অন্য কিছ্‌ যোগ করা কঠিন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক ফন ফ্রিশকে প্যারিসে কালিঙ্গা প্‌রস্কার দেয়া হয়। এই প্‌রস্কার জীববিদ্যায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য প্রতিবছর দেয়া হয়ে থাকে। তাঁর 'মৌমাছি: তাঁদের

দৃষ্টি, ঘ্রান, স্বাদ ও ভাষা', 'মৌমাছিদের জীবন থেকে' বইদুটি সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

এ'লে কাইলাস (১৮৮৭): জন্ম পিটার্সবুর্গে। সেখানে তাদের পরিবার একটা ফ্যাশন হাউজ চালাতেন। দু'বছর বয়স থেকে ফ্রান্সে বসবাস শুরু করেন। পৃথিবী জুড়ে মৌমাছি পালকদের দ্বারা তিনি প্রশংসিত। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নামকরা মৌমাছি বিশারদ। ফরাসী মৌমাছি পালক সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান এবং কয়েকটি মৌমাছি পালন সম্মেলনের (১৮৯৭, ১৯০০ এবং ১৯০২) সম্পাদক ছিলেন। কাজেই ছোটবেলা থেকেই তিনি মৌমাছি এবং মৌমাছি বিষয়ক কথাবার্তার পরিবেশের মধ্যে ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি মধু বিশ্লেষণ বিষয়ক একটি নতুন কৌশলের উপর নিবন্ধ লেখেন যা কারো দৃষ্টি এড়ায়নি। ছাত্র হিসেবে তিনি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন এবং ১৯০৭ সালে 'লা গেজেট এপিকোল'র সম্পাদক এডমুণ্ড অ্যালফান্ডারী সেই শুরু থেকেই তাঁকে ঐ সাময়িকীটিতে কাজ করার অমান্ত্রণ জানান যখন থেকে তার পাতা লেখকদের জন্য খোলা ছিল।

আলেকজান্দার গুবিন (১৮৯৭-১৯৫৬) সোভিয়েত যুগের একজন উল্লেখযোগ্য রুশী মৌমাছি পালক। শৈশবে তিনি তাঁর বাবার মৌমাছি খামারে কাজ করেন। ১৯৪৩ সালে মস্কোর তিমিরিয়াজেভ কৃষি একাডেমীর কৃষি বিষয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মধু-মৌমাছি এবং লাল ক্লোভারের পরাগায়নের উপর ডি. এস. সি ডিগ্রীর জন্য তাঁর গবেষণা প্রবন্ধের পক্ষে সমর্থন করেন। রেড ক্লোভারের পরাগায়নে মৌমাছিদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য তিনি একটি প্রায়োজনীয় যন্ত্র আবিস্কার করেন।

রেমি শাভো (জন্ম ১৯১৩): ফরাসী জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োজিত। বেশ ক' বছর কৃষি ইনস্টিটিউটের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। পরীক্ষামূলক পশু-আচরণের উপর তার নিজস্ব গবেষণাগার আছে। সরবন ও স্ট্রাসবার্গ-এ ভাষণ দিয়ে থাকেন। তাঁর রচনা: 'কীট-পতঙ্গের শারীরবিদ্যা' (১৯৫১), 'কীট-পতঙ্গের জীবন ও আচরণ' (১৯৫৮) ও 'মৌমাছি থেকে গোরিলা' বহুল প্রচলিত।

মোজেস কুইনাবি (১৮৭০) ছিলেন ধূম প্রয়োগ যন্ত্রের উদ্ভাবক। এই

উদ্ভাবনা মধু নিষ্কাশক ও অপসারণযোগ্য কাঠামো সহ মৌচাক উদ্ভাবনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। কুইনবির এ যন্ত্র একটি শক্ত নল এবং হাপর দিয়ে তৈরী। দেখতে বেশ সাধারণ মনে হলেও মৌমাছিকে ধোঁয়া দিয়ে তাড়ানোর ব্যাপারটা বিজ্ঞান সম্মত করার ক্ষেত্রে এ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। রুট লেখক বৃন্দ তাকে সর্বকালের একজন অন্যতম অভিজ্ঞ মৌমাছি বিশারদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমেরিকার মৌমাছি পালকরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। তিনি কুইনবির মৌচাকের উদ্ভাবক। একটি মধু নিষ্কাশকও তিনি উদ্ভাবন করেছেন (নিষ্কাশকটি করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাংস্ট্রেথ-রুট পাঠাগারে রক্ষিত আছে)।

গ্রন্থপঞ্জী

1) Hugo Obermaier. *Fossil man in spain*. New Haven, 1925
2) Sigismund, Freiherr von Herberstein. *Rerum Moscoviticarum Commentarij*. Basel. আ. ই. মালেইন কর্তৃক রুশভাষায় অনূদিত। সেন্ট. পিটার্সবুর্গ, ১৯০৮ পৃ. ২৬৬।
3) J. Lubbock. *Ants, Bees and Wasps*. 8th Edition. London, 1886, p. 290. (১৮৮৪ সালে এই গ্রন্থটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। লেখক লেভ্ তলস্তোয় ও সুরকার চাইকোভস্কি — দুজনের কাছেই বইটির কপি ছিল। যে অংশটি উপরে উদ্ধৃত হয়েছে তা চাইকোভস্কির মনযোগ আকৃষ্ট করেছিল ব্যাপকভাবে এবং তাঁর বইটির ঐ অংশটি পেন্সিল দিয়ে দাগানো)।
4) B. Shvanvich (Schwanwich). *Nasekomye i tsvety* (কীট-পতঙ্গ ও পুষ্প)। মস্কো-লেনিনগ্রাদ। ১৯২৬, পৃ.৩।
5) Nikolay Gogol. *Evenings on a Farm Near Dikanka*. London, 1926, pp. 8-9. (রুশ ভাষা থেকে কনস্ট্যান্স গারনেট কর্তৃক অনূদিত)
6) Gündel and Blattner. *Archiv für Hyg. und Bacteriol.*, 1934, 112, 6.
7) W. V. Gonzenbach and S. Hoffmann. *Schweiz. med. Wochenschr.*, 1936, 18.
8) H. Dold, W. Lächele, Du. Dscheng Hsia. *Zeitschr. für Hyg. und Infectionskrankh.* 1936, 118, 4.
9) Milan Prica. *Zeitschr für Hyg. und Infectionskrankh.*, 1938, 120, 5.
10) N. P. Ioyrish. *Priroda*, 1948, 37, 12: 56-57.
11) Kaganova-Ioyrish, F. O., Ioyrish, N. P. Antimycological

Properties of Honey. *Uspekhi sovrem. biologii,* 1947, 15, 3.

12) *Xenophon's Anabis of Expedition of Cyrus.* Literally translated by the Rev. J. S. Watson, M. A. London and New York, p. 141.
13) *Ibid.,* p. 142.
14) Maxim Gorky. *A Book of Short Stories.* New York, 1939, p. 289.
15) K. Sh. Sharashidze. The Toxic Properties of Honey from Certain Areas of the Georgian SSR and Ways of Rendering it Harmless. In *Tezisy dokladov nauchnoĭ sesii Instituta pitaniya* AMN SSSR. Moscow, 1954.
16) V. A. Devyatin, N. P. Ioyrish, E. Ya. Melnikova. The preservation of Vitamin C in Vitaminized Honey. *Trudy Vsesoynzn. Nauchn. Issledov. Vitamin. Inst.,* VI, Moscow, 1959.
17) A. Davydov. Honey and Sugar Diabetes. *Russkii vrach,* 1915, No. 26.
18) N. P. Ioyrish. *Doklady* VASKhNIL, 1939, 20: 40-41. রুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কৃষি জন কমিসারিয়েটের মৌচাষ বোর্ডের বৈজ্ঞানিক পুনর্বিন্যাস ও উদ্ভাবন ব্যুরো কর্তৃক এই পদ্ধতি নিবন্ধিকৃত এবং নিখিল ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য পরিদর্শন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৌচাষ বিভাগ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষিশিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত।
19) I. Brechman. *Zhen'-shen'.* (Ginseng). Moscow, 1957, pp. 101-102, 148.
20) Y. Ginsburg. *The effect of Ginseng on the sex Glands.* Material on the study of ginseng and the seeds of the Chinese magnolia vine [*Schizandra chinensis* (Furcz) Baill.] Leningrad, 1958, 3rd edition, p. 47.
21) R. Chernigovskaya. *Pchelovodstvo,* 1959, 36, 1: 14-16.
22) Ya. M. Krinitsky. *Vestnik Khirurgii,* 1938, 55, 2.
23) S. A. Smirnov. *Trudy Tomskogo med. in-ta,* 1946, Vol. 13.

24) A. S. Budai. *Vrach. delo,* 1945, 11-12.
25) A. E. Gel'fman. In *Sbornik rabot Novosibirskogo instituta pitaniya,* vyp. 4, 1946.
26) S. Mladenov. In *Sbornik IV nauch. internistite v B'lgariya.* Sofia, 1967.
27) A. Charukovsky. *Narodnaya meditsina, primenennaya k russkomu bytu i raznaklimatnosti Rossii* (Folk Medicine Used in Russian Daily Life and in the Different Climatic Zones of Russia). 1845.
28) N. P. Ioyrish. *Radyans'ka meditsina.* 1939, 5-6: 26-34.
29) N. P. Ioyrish. *Lechebnye svoistva meda i pchelinogo yada* (curative Properties of Honey and Bee Venom), 3rd edition, Moscow, 1956
30) V. P. Grigoriev. *Vrach gazeta,* 1924, 6.
31) N. K. Müller, Z. A. Arkhipova. *Vrach. delo,* 1948, 1.
32) A. Kh. Mikhailov. Application of Medical Honey in Eye Practice. *Pchelovodstvo,* 1950, 2.
33) V. I. Maximenko. The Application of Bee Venom and Honey in Certain Eye Disease. In *Doklady 2-i Leningradskoi nauchnoi Konferentsi po ispol'zovaniyu productov pchelovodstva v meyditsine.* Leningrad, 1960, pp. 31-32.
34) V. V. Pokhlebkin. *Chai, ego tipy svoistva i upotreblenie* (Tea, its Types, Properties, and Uses). Moscow, 1968.
35) G. F. Gauze. *Lekarstvennye veshchestva mikrobov* (The Curative Substances of Microbes). Moscow, 1946, p. 67.
36) P. M. Komarov and A. S. Erstein in *Sbornik nauch. rabot in-ta pchelovodstva,* 1938.
37) A. D. Balandin. *Tezisy dokl. 1-oi Vsesoyuzn. Konf. nauchn.-stud. ob-v medits., farmatsevt. i institutov,* 1950
38) Karl Krepelin. V zelenom sady (হরিৎ উদ্যানে, উদ্যানের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন নিয়ে লেখা), জার্মান থেকে অনূদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মস্কো, ১৯১২, ২৬৭ পৃঃ
39) W. Neuman, E. Haberman. Beiträge zur Charakterizierung der Wirkstoffe des Bienengiftes. *Arch. exper. Path. u. Pharmakol.,* 1954, 222: 366-387

40) N. P. Ioyrish. On the curative properties of Bee Venom and Methods of Obtaining It. *Vrachebnoe delo,* 1947, 27, 9, p. 783.

41) E. N. Pavlovsky. *Yadovitye zhivotnye SSSR* (Poisonous Animals of the USSR). Moscow-Leningrad, 1931, p. 152.

42) F. Tertsch. Uber eine merkwürdige Bezeichung des Bienenstiches zum Rheumatismus. *Wien. med. Presse,* 1888, 35.

43) R. Tertsch. *Das Beinengift im Dienste der Medizin.* Wien, 1912.

44) Kh. I. Erusalimchik. Treatment of Sciatic Neuritis and Neuralgia with Bee Venom. *Nevropatologiya i psikhiatriya,* 1939, 8, 5: 36-44.

45) O. I. Shershevskaya. The Treatment of Rheumatic Iritis with Bee Venom. *Vestnik oftalmologii,* 1949, 3.

46) N. L. Malanova. Apitoxin and Honey in the treatment of Eye Diseases. *Sbornik rabot Kliniki glaznykh boleznei Gor'kovskogo Gos. med. in-ta im. S. M. Kirova,* Gorky, pp. 178-182.

47) G. Kovalev. *Opytnaya Paseka,* 1927, 2.

48) Joseph Broadman. *General practice,* 1958, No. 8, মৌবিষ বিষয়ক ইউরোপীয় লেখাসমূহের মূল্যায়ন করেছেন এবং ইউরোপীয় নিদানিক ও গবেষণামূলক কাজের ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরেছেন।

49) Leo Tolstoy. Nine Stories. শতবার্ষিক সংস্করণ, অনুবাদ: অয়েলমার এবং লুই মড।

পরিভাষা

অ

অক্ষিখণ্ড optic lobe

অক্ষিপটল cornea

অক্ষিপটল-অক্ষিবর্ত্ম প্রদাহ keratoconjunctivitis

অক্ষিপটল প্রদাহ keratitis

অক্ষিপল facet

অক্ষিবর্ত্ম conjunctiva

অগ্রস্থ prostate

অঙ্কীয় ventral

অণুডিম্বাশয় ovariol

অণুজীব microbe, micro-organism

অণুবীজ spore

অণুমৌল microelement

অতিশক্তি দ্রবণ hypertonic solution

অধিবিষ toxin

অনাক্রম্যতা immunity

অন্ননিলয় proventriculus

অন্ত্র intestine

অপচিত necrotic

অবদ্রবণ emulsion

অবেদনিক anaesthetic

অভীক্ষা test

অস্থিমজ্জা প্রদাহ osteomyelities

আ

আকর্ষ tendril

আক্ষেপ cramp

আর্দ্রবিশ্লেষ hydrolysis

আসঞ্জনশীল adhesive

আঁশ scale

ই

ইন্দ্রিয় organ

উ

উদ্ভিদনাশক phytoncide

উপক্রান্তীয় sub-tropic

উপঝিল্লী epithelium

উপবৃক্ক গ্রন্থি suprarenal gland

উপশ্বেতবলয় প্রদাহ episcleritis
উপাঙ্গ appendage

উরঃফলক sternum

উৎসেচক enzyme

ঊ

ঊর্ধ্বোষ্ঠ labrum

এ

এককশর্করা monosaccharide

একপুষ্পক monofloral

একযোজী monoatomic

ঔ

ঔষধি গুল্ম medicinal herb

ক

কনীনিকা প্রদাহ iritis

কনীনিকা-নেত্রলোম প্রদাহ iridocyclitis

কল্পস্বর্গ utopia

কষালো astringent

কাচীয় vitreous

কীলক clasp

ক্কাথ decoction

ক্লোমনালী প্রদাহ bronchitis

খ

খণ্ডক segment

খাদক কোষ phagocyte

খাদ্য-পথ্য বিদ্যা dietetics

খামি yeast

খিঁচুনী cramp

গ

গঠন-উপাদান composition

গলগণ্ড scrofula

গলবিল pharynx

গ্রন্থি-ওমা adenoma

গ্রামসাপেক্ষ gram positive

গ্রাসন ক্রিয়া phagocytosis

ঘ

ঘটনমাত্রা frequency

চ

চর্ম-রতিজ রোগতত্ত্ব dermatovenereology

চাষঘর green house

চেরাই কলম stylus

চোলাইকরণ distilling

চোলাই রস must

ছ

ছত্রাক বিনাশী antimycotic

ছত্রাক রোগ mildew

ছত্রাকবিজ্ঞান mycology

ছানি cataract

ছিট পোকা aphid

জ

জনন অঙ্গ copulatory organ

জলাকর্ষী hydrophillic

জাতিবর্ণনবিদ্যা ethnography

জীবজ biological

জোড় কলম graft

ড

ডিম্বক ovule

ডিম্বাশয় ovary

ত

তলায়তন surface area

ত্বক বিশেষজ্ঞ dermatologist

ত্বক-যক্ষ্মা lupus

দ

দাহকুড়ি সংক্রান্ত herpetic

দেহরসগত humoral

দ্রবণমাত্রা concentration

দ্রাক্ষা-শর্করা glucose

ন

নিদানিক পরীক্ষা clinical test

নির্বীজিত sterile

নীলায়ন cyanosis

নেত্রবর্ত্ম conjunctiva

প

পণ্যচিহ্ন trade mark

পর-পরাগায়ন cross-pollination

পরাগ pollen

পরাগধানী anther

পরিদন্তদাহ parodontitis

পরিপক্বতা infusion

পাথুরী gravel

পিত্তমেদ cholesterol

পেশীটান tonus

প্রতিবর্তী ক্রিয়া reflex

প্রতিবিষ antitoxin

প্রস্টেট প্রদাহ prostotitis

প্রাণদ vital

প্রাণীজ শ্বেতসার glycogen

ফ

ফলক tablet

ফুসফুস কন্দর alveolus

ব

বংশগতিবিদ্যা genetics

বহিঃত্বক epidermis

বহুগঠনবাদ polymorphism

বহুপুষ্পক polyfloral

বাতকল্প rheumatoid

বাল্যাস্থি ricket

বিকারক reagent

বিজারণ reduction

বিপাক metabolism

বিরেচক laxative

বীরুৎ herb

বৃক্ক kidney

বৃতি calyx

বোধশলাকা antenna

ভ

ভিত্তিমূল পদার্থ ground substance

ভেদ্যতা permeability

ভেষজতত্ত্ব pharmacology

ভেষজ চিকিৎসাবিজ্ঞান therapeutics

ভৌতচিকিৎসা physiotherapy

ম

মধুকোষ honey comb

মধুসুরা mead

মধ্যচ্ছদা diaphragm

মহাধমনী aorta

মামড়ী scab

মিথষ্ক্রিয়া interaction

মেদস্থূলতা opesity

মেরুরজ্জু spinal cord

মোমাধার wax bin

মৌ-আঠা propolis

মৌ-বিষ bee venom

মৌমাছিতত্ত্ববিদ apidologist

য

যকৃৎ শিরা portal vein

র

রক্তমস্তু serum

রক্তরক্ষী antibody

রক্ত-পিত্তমেদাধিক্য hypercholesterolaemia

রক্তরস plasma

রক্তলসিকা haemolymph

রেখাঙ্কিত পেশী striated muscle

রেচন excretion

রোদ্রত্বক রোগ pellagra

ল

লসিকা lymph

লিপিকর scriber

লোহিত কণানাশ haemolysis

লোহিত জ্বর scarlet fever

লোহিত রক্তকণিকা erythrocyte

শ

শর্করাজ saccharide

শল্যছুরি scalpel

শাবক brood

শারীরবিজ্ঞান physiology

শীতদ রোগ scurvy

শীষ cob

শুক্রনিষেক insemination

শ্বেত কণিকা leucocytes

শ্বেতসার starch

শ্বেতবলয় প্রদাহ বাত rheumatic scleritis

শ্বেতসার-শর্করা carbohydrate

শ্লেষ্মা mucus

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী mucous membrane

ষ

ষড়কৌণিক hexagonal

স

সত্রকাল session

সন্ধিপ্রদাহ arthritis

সমরূপ uniform

সর্পবিষঘ্ন antivenine

সরলাক্ষি ocelli

সহায়ক গ্রন্থি accessory gland

সঙ্করণবিদ hibridizer

সংগ্রথিত স্নায়ু inosculated nerve

সংবেদী স্নায়ু sensory nerve

সংস্থিতি composition

সান্দ্রতা viscosity

সীরা malt

সুধা nector

সুবাতান্বিত wellventilated

সুরাসার alcohol

সুস্থিতিকারক stabilizer

স্নায়ু-আকর্ষী neurotropic

স্নায়ুশূল neuralgia

স্বাদশলাকা taste rod

স্পর্শ রোম tactile hair

স্পার্ম মোম spermaceti

হ

হিমায়ন freezing

হুড়কা clasp

হুল sting

হৃদপ্রদাহ carditis

হৃদরক্তসংবহন তন্ত্র cardiovascular system

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

USSR, 129820, Moscow, I-110
GSP, Pervy Rizhsky Pereulok, 2
MIR PUBLISHERS

